সমাজ ও সাহিত্য

আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রাপ্তিস্থান
দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া রাজবাটী
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৫০

তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

জগতের ইতিহাসে দেখা যায় কোনো কোনো সময় এমন একটা গভীর সংকট উপস্থিত হয়েছে যার ফলে একটা সর্বাঙ্গীন এবং মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তন শুধু রাজনীতিতে বা অর্থনীতিতে নয়, সাহিত্যে, শিল্পে,—সর্বত্র। প্রাথমিক মূল্যবোধ এবং মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিকেই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেবে সেটা আশ্চর্য নয়। এরকম সংকটে সাহিত্যেও বিপ্লব অনিবার্য, বরং কবিরা নবযুগের হাওয়া আগেই অনুভব করবেন ক্রান্তদর্শী কথাটার ইঙ্গিত সেইরকমই। আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং তার ঐতিহাসিক কারণগুলি আলোচনা করলে মনে হয়, আমরা শুধু যে একটা গভীর সংকটে উপস্থিত হয়েছি তাই নয়, এই সংকটের ফলে অনেক মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে। এইরকম সংকটের সময় সবচেয়ে গোড়ার কথাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে, এখনও জেগেছে। সেই কারণে সম্প্রতি সমাজে ও সাহিত্যে আমাদের স্থাপিত আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক জিনিষ নয়। বিপ্লবের মধ্যে ভাঙার সঙ্গে গড়ার কথাও থাকে, কিন্তু বিদ্রোহে গড়বার দিক্‌টা অনুপস্থিত। সেহিসেবে আমাদের এই যুগান্তরের প্রকৃত স্বরূপ কি, এটা বিদ্রোহ না বিপ্লব, আমাদের বিবর্তন ধারা কোন্ দিকে, আমরা ভাঙনের পথে কতদূর অগ্রসর হলাম, কোনও নতুন আদর্শে আমরা আবার সঞ্জীবিত হতে পেরেছি কিনা অথবা শুধুই ধ্বংসের কাজে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি—এই মৌলিক প্রশ্নগুলি মনে জাগা স্বাভাবিক। আমাদের মানসিক সংস্থা ও সামাজিক সংস্থানে পরিবর্তন ঘটলে সাহিত্যে কি পরিবর্তন ঘটবে, বর্তমানে সাহিত্যের গতি কোনদিকে, তার ভবিষ্যৎ কি—এই প্রশ্নগুলিও সাহিত্যের দিক্ হতে মনে জাগা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এরকম সংকটে সাহিত্যেও সমাজবোধ অনেকসময় স্পষ্টতর, প্রত্যক্ষতর ও বৃহত্তর হয়ে ওঠে। এই মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবার প্রয়োজন ঘটেছে, কারণ তা না হলে আমরা সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে দিশেহারা হতে পারি কিন্তু পথের সন্ধান মিলবে না। এ বইতে সেই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং সেগুলির

আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কোনো সদুত্তর সম্ভব হয়েছে কিনা, তা রসিক ও বিদগ্ধজনের বিচার্য।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যের বিচার বেশী হয় নি। সামাজিক পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের পুনর্বিচারের জন্য আমাদের বহু লেখকের কাছেই মুষ্টিভিক্ষা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কখনও ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে বাড়াবাড়ির সমর্থন করেন নি, কিন্তু তার জন্য যদি কেউ মনে করেন যে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অচেতন থাকতে চাইতেন এবং চারপাশের হাওয়া তাঁর অতিসংবেদনশীল মনে ও তাঁর রচনায় তরঙ্গ তুলত না তাহলে সে কথা অবিমিশ্র বাতুলতা হয়ে দাঁড়াবে। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার মধ্যে এরকম আলোচনা প্রসঙ্গতঃ ছড়ানো আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে সাজালে বাংলা সাহিত্যের একটী নতুন ইতিহাস গড়ে তোলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণমুষ্টির কথা ছেড়ে দিলে এরকম আলোচনা এখন পর্যন্ত বহুক্ষেত্রেই সাময়িক পত্রিকার পাতাতেই আছে, পুঁথিবদ্ধ হয় নি। শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, হুমায়ুন কবির এবং আর কয়েকজন লেখক ছাড়া বেশী লেখক ও সাহিত্যিক প্রয়োজনে সমাজ বিশ্লেষণে উৎসাহিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য এঁদের ছাড়া আরো কয়েকজন লেখকের বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বটাই প্রধান, সেই তত্ত্ব কিভাবে সাহিত্যে ফুটলো তার উপযুক্ত বা যথেষ্ট আলোচনা সম্ভবতঃ নেই। শ্রীযুত বিনয় ঘোষের 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ' ও শ্রীযুত গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' অন্যদিক্ দিয়ে মূল্যবান্, কিন্তু ওগুলির মধ্যে যেন ঐ অভাব রয়েছে, মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটী কথার উল্লেখ দরকার। সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের নানা আলোচনায় দেখেছি অনেকসময় সমাজবিবর্তনের একটী বাঁধা থিওরির সাহায্যে এদেশের সমাজবিবর্তনের ধারা এবং সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধের ব্যখ্যা করবার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্নদেশের সমাজবিবর্তনের ভঙ্গী-সামান্যই যদি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের ভিত্তি হয় তা হলে বিভিন্নদেশের সমাজবিবর্তনের ভঙ্গী-বৈশিষ্ট্যও নিশ্চয়ই তার অন্তর্গত। তা না হলে সাম্যবাদ কোনও আদর্শ নয় কিন্তু সমাজবিবর্তনের অনিবার্য ফল একথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের দেশের সমাজবিবর্তনেরও

নানা বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং যে সমালোচকদের মানসতীর্থ এদেশ এবং এদেশী সাহিত্যের সম্পূর্ণ বাইরে তাঁদের আলোচনায় একটা কৃত্রিম তত্ত্বের চাপে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বিকৃত হবার ভয় আছে। এই ধরণের বিকৃতি সামাজিক ব্যাখ্যার মূলে আঘাত করে বলে আমার ধারণা। আর যেহেতু ঔচিত্যবিচার অপেক্ষা ঘটনাবর্ণনাই আমার উদ্দেশ্য, সেজন্য কি ঘটলে সুখী হতাম সে কথার পরিবর্তে কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে এই কথাই আমার বেশী আলোচ্য—যদিচ ঘটনার স্বরূপ বুঝলেই ঔচিত্যস্থাপনার কর্মকৌশলের সন্ধান মেলে বলে আমার বিশ্বাস। যাঁরা তত্ত্বের খাতিরে তথ্যকে অস্বীকার করেন তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া রইলো।

স্বীকৃতি

এই বই-এর মধ্যে যে যে বই হতে অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলির ঋণ যথাস্থানে স্বীকৃত হয়েছে। এ ছাড়া নানা বই লেখকের মনে ছায়াপাত করে, সেগুলি একটা গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত হতে পারতো, কিন্তু পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের পীড়াদায়ক চেষ্টা ছাড়া দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জীর অন্য কোনও সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। এ বই-এর কিছু কিছু অংশ স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বিশ্বভারতী পত্রিকা, পরিচয়, চতুরঙ্গ, বিচিত্রা, অলকা, দেশ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো, ও পত্রিকাগুলির কাছেও আমার ঋণ স্বীকার্য।

ছাপার কাজে শ্রীযুত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সুচী

পরিশিষ্ট

At all events, we may safely expect to see, at a more or less remote period, the regeneration of that great and interesting country, whose gentle natives are, to use the expression of Prince Saltykov, even in the most inferior classes, "*plus fins et plus adroits que les Italiens*", whose submission even is counterbalanced by a certain calm nobility, who, notwithstanding their natural langour, have astonished the British officers by their bravery, whose courtry has been the source of our languages, our religions, and who represent the type of the ancient German in the *Jat* and the type of the ancient Greek in the Brahmin.

—Karl Marx in *New York Daily Tribune*,
August 8, 1853.

মন উড়ু-উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু, ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক,
আলুথালু ভাষা ভাব এলোমেলো ছন্দটা নির্বাধুনিক।
পাঠকেরা বলে এতো নয় সোজা
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা ;
কবি বলে, তার কারণ আমার কবিতার ছাঁদ আধুনিক।

—রবীন্দ্রনাথ : খাপছাড়া

Things fall apart ; the centre cannot hold ;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

--W. B. Yeats: *The Second Coming.*

মুখবন্ধ

এ যুগের একটা লক্ষণ হচ্ছে মতবাদের প্রাধান্য। পর পর দুটো লড়ায়ের ফলে নানারকম মতবাদ আমাদের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। গত লড়ায়ের মধ্যে বিশ্বরাষ্ট্র স্থায়ী শান্তির কথা আসলে কিছুই ছিল না, ওগুলো হচ্ছে বাইরের বুলি। আসল ব্যাপারটা ছিল কৌলীন্য নিয়ে ইংরেজ আর জার্মানীতে ঝগড়া। অনেক কালের কুলীন হচ্ছে ইংরেজ, তার সেই কৌলীন্য জার্মানী কাড়তে চেয়েছিল। এই রকম লড়ায়ে বনেদি কুলীনরা একদিকে ছিলেন, টাকার জোরে আমেরিকাও কৌলীন্য মর্য্যাদা পেয়েছিল বই কি। সে সময় এই কৌলীন্যের ঢাক বাজাবার জন্যে আমাদের দেশের ডাকও পড়েছিল, নগদ বিদেয়ও কিছু কিছু মিলেছিল। কেউ কেউ রাইট্ অনারেবল, কে, সি, লর্ড হয়েছিলেন। কিন্তু আসল চেহারা বদলায় নি। বদলায় নি তারই প্রমাণ নানা রকম মতবাদের তর্ক। মতের তর্ক নয়, মতবাদের তর্ক। মোলায়েম কথার দরকার তখনই হয় যখন আসলে অপ্রিয় কথা বলতে হয়। মিষ্টি বুলি আসল কথার মুখবন্ধ মাত্র। এটা হচ্ছে শোষক ও শাসকদের দরকার। সেই জন্যে বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি নানারকম বৈঠকী কথা চলছিল। এরকম কথা আরও দরকার হয়ে পড়ল, কারণ যুদ্ধের মধ্য থেকে হঠাৎ একটা অকুলীনের জন্ম হল যারা কোনো বনেদিয়ানাই মানতে চায় না। একেবারেই নতুন ভঙ্গী,—চড়া মেজাজে শিং উঁচিয়ে বাধা উপড়ে ফেলতে চায়। তাদের দেশের কর্তারা বলেছিলেন, চলবে কেন তুমি, চলবে নিয়ম। কিন্তু মুষ্কিলের কথা হোল এই, যে এরা নিয়মের বদলে নিজেই চলতে চায়, নিয়মটা আসে তাদের চলার পথ ধরে। এরকম কথা আগে কখনও শোনা যায় নি।

সেইজন্যেই বনেদি কুলীনেরা একটু আধুনিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, ভেবেছিলেন আবার একটা নতুন চেহারার নিয়ম খাড়া করতে পারলেই এখন নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। একটা ফরমুলা যদি অচল হয়েই থাকে, আর একটা নতুন রঙ্চঙে ফরমুলা গড়ে দাও—সেই ফরমুলার আড়ালে অসভ্য কথাগুলো চাপা পড়বে। কিন্তু ফাটা বাঁশি রঙ্ করলেই সুরে বাজে না, বেসুরো শিঙের আওয়াজও ঢাকে না। সেইজন্যে, কুলীনদের, অন্ততঃ আসন্ন সংক্রান্তির ভয় এড়াবার জন্যও, কতকগুলো মন্ত্র দরকার। তাতে বিচারবুদ্ধির দরকার হয় না, সুতরাং অনেক ভয়ের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। আর এক দিক থেকেও এই রকম মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বাড়লো। বিসর্জনের পরই যে সমস্ত ঢাকীদের জয়ঢাক কেড়ে নিয়ে নগদ বিদেয় দেওয়া হলো তারাও ভাবলে এ হল কি। সেইজন্য তারাও গলা চড়িয়ে মন্ত্রসাধনা সুরু করলে, তবে কুলীনদের মন্ত্র নয়— বেজাত শূদ্রের মন্ত্র। কিন্তু গলা দুদলেরই সমান চড়া। অর্থাৎ দুদলেরই বিকারগ্রস্ত অবস্থা। ডাক্তার বলেন, রয়ে সয়ে অসুখ সারাই ভালো, তাতে স্থায়ী উপকার হয়। হয়তো হয়, কিন্তু ফাঁও বাড়ে। রুগী বলেন, তোমার চালাকি ধরেছি, সুতরাং ও কথা একটুও মানিনে। ও রকম ডাক্তারের কথা না মানাই উচিত, কিন্তু ডাক্তার ছাড়া ডাক্তারি বলে একটা শাস্ত্র আছে যা ব্যক্তিগত মানুষের সমষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য উপমাটা ঠিক হলো না, কেননা সম্বন্ধটা কোনো সময়েই ডাক্তার-রুগীর সম্বন্ধ নয়, এখানে দু দলই রুগী, বরং প্রথম দল বেশী রুগ্ন। রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, ছাগশিশু ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিল ব্রহ্মার তৈরী জগতে সবাই তাকে খেতে চায় কেন। ব্রহ্মা উত্তর দিয়েছিলেন, "বাপু অন্যের কি দোষ দিব, তোমাকে দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।" সম্বন্ধটা বরং সেই রকম; খাদ্য যদি বেশী চীৎকার করে তার দোষ নিশ্চয়ই ততো নয়, কিন্তু খাদকের মুখে সান্ত্বনার বুলি অসহ্য। কিন্তু সুস্থ কেউ-ই নেই, দু দলেরই সমান অবস্থা।

সেই জন্যে এবারের লড়াইটাও যখন মতবাদের লড়াই বলা হয় তখনও তার মধ্যে একটা ফাঁকি থাকে। মতবাদের লড়াই এ নিশ্চয়ই, কিন্তু মতবাদের লড়াই-ই নয়। অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মতবাদটা সকলের পক্ষে সমান নয়। মতবাদের ফাঁকিই ঐখানে। একটা ধরতা বুলির আড়ালে আসল ব্যাপারটা চাপা দেওয়া। রুশিয়া যুদ্ধে নামায় যুদ্ধের চেহারা নিশ্চয়ই বদলেছে, ভারতবর্ষের পক্ষেও বদলেছে, কিন্তু রুশিয়ার পক্ষে যা বদলেছে ভারতবর্ষের পক্ষে তা বদলায় নি। রুশিয়ার উদ্দেশ্য কম্যুনিজমকে বাঁচানো, কিন্তু ইংরেজের উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানীকে হারানো। সুতরাং ভারতবর্ষকে যদি যুদ্ধে উৎসাহী হতেই হয় সে রুশিয়ার কম্যুনিজমকে বাঁচাবার জন্যে ততো নয়, যতো নিজের জন্যে। কম্যুনিস্টরা রাগ করবেন, উপায় নেই। জানি, রুশিয়া বাঁচলে বিপ্লব বাঁচে, তাতে ভারতবর্ষেরও সাহায্য হয়। কিন্তু সাহায্য হয়, ঐ পর্যন্তই। যদি এ জন্যে রুশিয়াকে সাহায্য করতে হয় ভাল কথা, কিন্তু সেটা নিজেরই দরকার, রুশিয়ার নয়। বিপ্লবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই যদি রুশিয়ার গোড়ার কথা হয়, তা হলে প্রত্যেক জায়গার বিবর্তন ও বিপ্লব ঐতিহাসিক ঘটনায় নিয়ন্ত্রিত। বিপ্লব ভিতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে নয়। হাওয়ায় আগুন উড়ে এলেও ভিজে খড়ে আগুন ধরে না।

যখন লবণ-আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন বয়স অল্প। মনে পড়ে, একদিন সন্ধ্যাবেলা হাতে লেখা কাগজে খবর ছড়িয়ে গেলো গান্ধিজী গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেদিন কেউ বলেছিলেন, সম্ভবতঃ কোনও বর্ষীয়সী, সেদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশে খানিকক্ষণ একটা বড়ো তারা দেখা গিয়েছিল। কথাটা কেমন যেন অসঙ্গত ঠেকে নি, মনের মধ্যে বিশ্বাস করতে চেষ্টা হয়েছিল। তারপর থেকে নানা রকম উত্তাপ এদেশের যুবক-মনে এসেছে। সে উত্তাপে বিশ্বাসটুকু গেল উবে, সেই সঙ্গে আত্ম-বিশ্বাসও। যা-ই করি, একটা 'ইজমে' টেনে দাঁড় না করালে স্বস্তি নেই। আজকের দিনে গাল দিতে হলে বলতে

হয় না 'তুমি অমুক', বলতে হয় 'তুমি অমুক দলের'। অথচ এই মন্ত্রশক্তির মানেটা কি একটুও ভাবি না। রক্ষাকবচের দরকার হয় নাড়ীছাড়া অবস্থায়, যখন ডাক্তারে জবাব দিয়ে যায়। তাতে কাজ হোক্ আর নাই হোক্, গোড়ার কথাটা হচ্ছে নাড়ীছাড়া অবস্থা। এই কিছুদিন আগেও যে শরীরটা নানা দেশের রসে পুষ্ট ছিল তাতে ভাঙন ধরতে পারে এমন কথা বিশ্বাসই করা যেতো না। কিন্তু তাই হলো। একবার ভাঙন ধরতেই নানা জায়গায় গোলমাল বেধে উঠলো, এক জায়গায় চাপা দিতে আর এক জায়গায় বেরিয়ে পড়ে।

আসল কথাটা হচ্ছে তাই। আগের যুগের কুলীনরা এবং অন্ত্যজরা একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলো, কুলীনরা বেশ গোটাসোটা হচ্ছিল, অবসরমত অন্ত্যজদেরও একটু আধটু বকশিশ্ দিয়েছে। অন্ত্যজদেরও খাটুনির শেষ নেই, তবে ঐ ছিটেফোঁটা উপরি-ই সান্ত্বনা। বেশ শান্তির পরিবার। হঠাৎ মনিবদের লড়াই লাগতেই চাকরদের আস্পর্দ্ধা গেল বেড়ে, বলে জোর করে পাওনা আদায় করবো উপরির ভরসায় থাকবো না। মনিবরাও কাহিল হয়ে পড়েছে। শান্তির সংসারে ভাঙন লাগলো, কেমন যেন সব গোলমাল। একদিকে ভাঙন ঢাকবার জন্যে রক্ষাকবচ, অন্যদিকে ভাঙন যাতে বজায় থাকে তার জন্যে রক্ষাকবচ। নাড়ীছাড়া অবস্থার পর নব-জন্ম হলে রক্ষেকবচ দরকার হয় না, কিন্তু সে নবজন্মের বিশেষ কোনো লক্ষণ এখনও নেই।

এসিয়া সম্ভবতঃ চৌদ্দ কি পনেরো শতক থেকে নেতৃত্ব হারিয়েছে। জগতে হাওয়াবদল এখন ইউরোপের মারফৎ হয়। এবার হয়তো আমেরিকার মারফৎ হবে, অবশ্য রুশিয়ার কথা বাদ দিলে। চেহারায় যদি বা কোথায়-ও মিল থাকে, উনিশ শতকের মেজাজটা পুরো বদলালো রুশিয়ার কথার মধ্যে। দুদিকের চাপে অবস্থা জরজর। বাইরে মহাজনের তাগাদা, ঘরেও শত্রু বাড়ছে। প্রাণই থাকে না, মান তো গেলই। দেশ হিসেবে এবং সমাজ হিসেবে এই কথাটা খাটে। সেই জন্যে দেশে দেশে ঝগড়া, দেশের মধ্যেও ঝগড়া। ফলে ভাঙন বাড়ছে।

এ যুগে মতবাদের প্রাধান্য এই ভাঙনের ইঙ্গিত দেয়। আমাদের সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে, বস্তুতঃ না হলেও মনে। সাহিত্যের মূল ভঙ্গীটাই বদ্‌লাচ্ছে। কিন্তু বদ্‌লাচ্ছেই। কেউ কেউ বলেন এ সব শ্রমিক বিপ্লবের কাব্য। এ বিপ্লবের কাব্য হতে পারে, শ্রমিকদের নয়। বিপ্লব এখনও শেষ হয় নি (আসে নি বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সাহস হচ্ছে না), নেতৃত্বও (বুদ্ধিগত এবং সামাজিক) শ্রমিকদের হাতে নয়। আমার মনে হয়, এই পরিবর্তনই আমাদের মূল কথা। ভবিষ্যৎ এখনও ভাবগ্রাহ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং সে হিসেবে বাস্তব, কিন্তু অন্য হিসেবে নয়। তবে পরিবর্তনের গতিবেগ অসাধারণ, সেইজন্যে বিপ্লবী। আমাদের সামাজিক প্রতিবেশটা হচ্ছে ভাঙনের। ভাঙনের ফলে নতুন মেজাজ, নতুন ভঙ্গী, নতুন টেক্‌নিক্ এবং নতুন নেতা অবশ্যম্ভাবী। এর প্রভাব প্রত্যেক দিকে, ভাবের রূপায়ন, বুদ্ধির রূপায়ন, কর্মের রূপায়ন—সব দিকেই। নেতাদের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ দেশভেদে ও সমাজভেদে এক এক চেহারায় দেখা দিচ্ছে। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তা হতেই হবে কেননা এক না হলেও একধরণের সামাজিক প্রতিবেশে একই ধরণের বিবর্তন হবেই। এরই নাম বিবর্তনের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। হয়তো অদ্বৈতবাদীদের কথাটা সত্যি, কিন্তু কথাটা সত্যি হলেও সম্পূর্ণ নয়, বিশেষতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কেননা অদ্বৈতবাদও ফরমুলা, যার সত্যটা গ্রহণ করার আগে বিচার করতে হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝখানে একজন শিল্পী থাকেন। সামাজিক বিবর্তনেই সাহিত্য বদলায়, মানুষের মনও বদলায় কিন্তু সাহিত্যে যেটা প্রকাশিত হয় সেটা প্রত্যক্ষতঃ সাম্যবাদীর ইস্তাহার নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র সাহিত্যকারের মনে। 'এ ঠিক ত্রিশির কাঁচের মতো, তীব্র আলো তার উপর পড়ে, কিন্তু সে আবার যখন সে আলো ছড়িয়ে দেয়, তখন তার তীব্র শুভ্রতার পরিবর্তে দেখা দেয় নানা রঙের মনোজ্ঞ সমাবেশ, আমাদের প্রাত্যহিক একরঙা জীবনের মধ্যেকার নানা রঙের

নানা বিচিত্র অনুভূতি। এ রং যে কেবল রোমের তুলিতেই ক্যানভাসের উপর আঁকা হবে তা নাও হতে পারে, কাঠের উপর শূয়োর-কুঁচি বা ছুরির খোঁচায় গড়ে উঠতে পারে। এইখানেই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র। বর্ণচ্ছদ তৈয়ারীর কাজ সাহিত্যের হলেও—এবং এইখানেই কবিমনের বিশিষ্টতা—তার মূল রং সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেইজন্য সাহিত্য কোনোকালেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়; কবিরা যেকালে গজমোতিমিনারে বাস করার আগ্রহে উন্মত্ত, সে যুগেও সাহিত্য অসামাজিক নয়, তবে তার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নেতিবাচক এই পর্যন্ত।

এ কথাগুলো উল্লেখ করার কারণ আমরা নতুন রকম ফরমূলার মধ্যে বাঁধা পড়ছি। এই নতুন ফরমূলাটার মূল কথা যা, তাতে এরকম বাঁধা পড়ার বিশেষ বিপদ আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে সামাজিক ও সাহিত্যিক চেহারা-বদল। এ মতবাদকে সম্মান করলে উচিত হচ্ছে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক কালের প্রতিবেশে সামাজিক ও সাহিত্যিক বিবর্তন বিচার করা, ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি (এটা প্রধানতঃ সমাজের বেলায়) নির্দ্ধারণ করা। তার জন্যে বিচারের প্রয়োজন, ফরমূলার নয়। কিন্তু এদেশেও 'ইজম্' দ্রুতবেগে বেড়ে চলছে, সুতরাং নতুন ফরমূলা না আমদানি হলে আর নতুন পথে এগোবার ভরসা থাকে না। আমি নেতৃত্বের প্রয়োজন মোটেই অস্বীকার করছি না। কিন্তু হুকুমটা রাজাদেরই সাজে, নেতাদের নয়। নেতার অর্থই হচ্ছে সচেতন জনমনের নেতা, অন্ততঃ সচেতন না হলেও চেতনামুখীন। সে সময় ব্যক্তিক চিন্তা-স্বাধীনতা নৈরাজ্যের সূচক হলে বিপদ নিশ্চয়ই, কিন্তু চিন্তার জড়তাও শুভলক্ষণ নয়। তাতে বোঝায়, বাইরে যতই কথা কাটাকাটি হোক্ ভেতরে মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে, তর্কের চোটে আসল কথাটাই চাপা পড়লো। এ যুগে এবং বিশেষ করে এ দেশে এরকম বুদ্ধিবিভ্রম বিপজ্জনক। শুধু সাহিত্যে নয়, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি—এক কথায়,

সমাজে, ঘটনা ও মানুষের ঘাতপ্রতিঘাতের বিশেষ বিচার দরকার। কাজের সময় কাজই করতে হয়, গল্প চলে না। কিন্তু কাজ করার আগেও ভাববো না, এ সুস্থ মনের কথা নয়। কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন, "দেশের মনের উপর একটা বিষম চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ঙ্কর তাগিদ দিয়েছে।" সে চাপ আরও বেড়েছে। কিন্তু সমাজ হচ্ছে ব্যষ্টির যোগফল নয়, গুণফল। আর কাজ জিনিষটাও সামাজিক। সম্বন্ধটা উভয়তঃ, যদিও উভয় দিকের চেহারা আর ওজন এক নয়। সেইজন্যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যুগের পরিবেশে (সুতরাং অতীত যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও) একালের মনটাকে বিচার করা। বলা বাহুল্য, একটা ফরমূলার সাহায্যে মানবমনের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন অবস্থার কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে না. কিন্তু তাদের মেজাজটা বোধ হয় বোঝা যায়, এমন কি তফাৎটাও। সুতরাং সেই সঙ্গে বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতিরও বিচার দরকার। তা না হলে ফরমূলার কথার ধাঁধায় ফরমূলার সত্যকেই অস্বীকার করা হয়।

২

যদি ধ্রুপদ থেকে খেয়াল ও ঠুংরির উৎপত্তি হয়ে থাকে বা চৌতালের পর আড়াঠেকার জন্ম হয়, তা হলেও বলতে পারা যায় না দুটো সমগোত্রের। এ যেন সনাতন পরিবারের জাতখোয়ানো ছেলে। পরিবারের সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধটা অস্বীকার করা চলে না, অন্ততঃ জন্মটা স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু তবুও পরিবারের যে একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে সেটাকে মানা চলে না। আমাদের অবস্থাও খানিকটা তাই। পূর্ব্বে বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ পরিস্থিতির বিচারের কথা উল্লেখ করেছি তার একটা দিক্ দেখতে পাওয়া যায় অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে। এতদিন সমাজের যে গঠন ছিল তাতে পুরোণোকে পিছনে ফেলে আসা অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। মানুষে মানুষে স্নেহপ্রীতির

বন্ধন শিথিল হয় নি। তাই বুদ্ধিজগতে বিপ্লবের কল্পনা বিরল না হলেও বস্তুজগতে তার পৌনঃপুনিকতা দেখা যায় নি। প্লেটো এক অলস মধ্যাহ্নে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার কিছু পরিমাণ সফলতার জন্য এতো হাজার বছর লাগার অন্যতম কারণ এই। কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসই হচ্ছে ক্রমশঃ স্নেহপ্রীতির বন্ধন ছেদনের ইতিহাস। আদিম যুগের সমষ্টি-সচেতনতা ও যৌথ জীবন হতে স্বরু করে এই ভাঙন তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছয় যে সময় এক দেশের একটা শ্রেণী টাকার জোরে স্বদেশ এবং বিদেশ, নিজের সমাজ এবং অপরের সমাজের উপর রাজত্ব করে। দাস-যুগে প্রভুদের সঙ্গে সম্বন্ধটা দৈহিক, অর্থাৎ দাসেরা দেহ দিয়ে খাটবে। সেইজন্যে অধীনতা মানুষের কাছে মানুষের। সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটলো, তার ফলে গোষ্ঠীর প্রাধান্য হলেও জীবন-মৃত্যুর অধিকার সামন্তদের সে ভাবে আর রইলো না। কিন্তু তার পরে যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার উদয় হলো তাতে মানুষের কাছে মানুষের অধীনতার পরিবর্তে বস্তুর কাছে মানুষকে অধীন হতে হলো। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থই এই। যাঁরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অত্যাচারিত শ্রেণীকে সামন্তদের হাত হতে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার আড়ালে বস্তুর অধীনতা বাড়ানো, কেননা বস্তুর অধিকার তাঁদের হাতে। এরই চরম অবস্থায় দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদ এবং ফিনান্স-ক্যাপিটালের প্রসার—যে সময় ধনিক গোষ্ঠীর আধিপত্য স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে বিস্তৃত হতে থাকে। এর ফল সুদূর-প্রসারী। শুধু অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তনেই এর ফল সীমাবদ্ধ নয়, এর ফলে একেবারে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আদিম যুগে মানুষের মধ্যে আত্ম-সচেতনা কম, তাই সে যুগে একটা অবচেতন সমাজ-সংহতি থাকে। অবশ্য এরকম সংহতির মূল্য খুব বেশী নয়, অল্পেই সে ভেঙে পড়ে। তবু এই সময়েই সাহিত্যের জন্ম। অবশ্য এ সাহিত্য বর্তমানের প্রচলিত অর্থে সাহিত্য নয়, অর্থাৎ তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত

নির্যাস নয়, তার মধ্যে সাহিত্যকার ও উপভোক্তার মধ্যে সাক্ষাৎ নৈকট্য। আলঙ্কারিকদের মতে সহিত শব্দ হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। ক্রমশঃ ক্রমশঃ মানুষ আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে, কিন্তু যতদিন সমাজ-শরীর ছাড়া আর্থিক ঋদ্ধির সম্ভাবনা নেই ততোদিন পর্যন্ত সমাজেরই প্রাধান্য। এ যুগে সেইটা ধ্বংস হতে বসেছে, তাই আবার নতুন করে নতুন সমষ্টিবোধ স্থাপনের চেষ্টা। যে ঐতিহ্যের উপর জগৎ এতকাল সমাজ গড়ে এসেছে সে ঐতিহ্য আমাদের অনেকের কাছে শূন্য, কারণ তার বিশেষ কোনো কল্যাণ আমরা লাভ করি নি। তাই সে ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সর্ব্বাঙ্গীন বিদ্রোহ। জীবনের প্রত্যেক দিকেই তাই এই কথাটাই বড়ো হয়ে উঠছে। সেইজন্যে রাষ্ট্রনীতিতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোহাই এতকাল চলে এসেছিল সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মিথ্যা আবরণকে ধ্বংস করাই বর্ত্তমান রাষ্ট্রধর্ম। মানুষের মনের দিক্ দিয়ে কথাটা বিচার করে দেখা যাক্। সেকালে ধারণা ছিলো, সাহিত্যের বিষয় কতকগুলি 'মহৎ' ও 'চিরন্তন' বিষয়, যার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের কোনো ছোঁওয়া থাকবে না। সে হিসেবে চাঁদ ওঠাটা কাব্যের বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারতো, কিন্তু ক্লাইভ ষ্ট্রীটের চাঁদ নয়, সাগরের উপল-উপকূল নিয়ে কবিতা লেখা চলতো কিন্তু বড়বাজারের উপল-উপকূল নয়। যেন কবিতার স্ফুরণের জন্য প্রয়োজন একটা জ্যোতির্ম্ময় পরিমণ্ডলের, ধারণা ছিলো কবিপ্রতিভা একটা দৈব দান, এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা নজরে পড়ে নি। বিশ্বাস হয় নি, কবির মন চারপাশেরও অবদান এবং কবিতার জন্য শিক্ষারও প্রয়োজন আছে কারণ ব্যাপারটা তাঁদের মতে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই আকস্মিক। তাই কবিরা ছিলেন স্বতন্ত্র। শুধু যে পারিপার্শ্বিক হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টায় স্বতন্ত্র তাই নয়, বহুপরিমাণে 'স্ব'-তন্ত্র অর্থাৎ আত্ম-মুখীন। সেজন্যে সেকালে মানুষ শুধু এই 'মহৎ' গুণগুলির মধ্য দিয়ে সমষ্টির সঙ্গে ও অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল, কালক্রমে তার ফাঁকি স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে পারিপার্শ্বিকের

আঘাতে মানুষের মন গড়ে উঠেছে তাকে বাদ দিয়ে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা ঠিক যেন শিলালিপির লিপি মুছে শিলা সাজিয়ে রাখা। তাই যদি ঐতিহ্যের সম্মান করতে হয় তা হলে ইতিহাসের ধাতুগত অর্থ স্বীকার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়,—মানতে হবে ইতি-হ-আস, ঠিক এমনি ছিল, ভাবলে চলবে না তার কিছু অংশ সাম্প্রতিক বলে বাদ দিয়ে বাকীটুকু নির্বিচারে চিরন্তন হিসেবে গ্রহণ করা চলতে পারে।

এই কারণে এ যুগে সমাজ তার পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখতে চায় শুধু তথাকথিত 'মহৎ' গুণগুলির মধ্য দিয়ে নয়। কারণ দ্বিবিধ। দেখা গেল মানুষকে তার সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। তাতে বক্রদৃষ্টি অনিবার্য। সেই সঙ্গে আরও দেখা গেল গত শতকের সমাজেও "মহৎ" গুণগুলি সমষ্টির পক্ষে অবিমিশ্র সত্য নয়। তাই যোগসূত্র শিথিল। অপর দিকে পারিপার্শ্বিককে স্বীকার করার ফলে সমাজের মূল্য শুধু বহিরাবরণ হিসেবে রইল না—তার মূল্য বৃহত্তর। আমরা অনুভব করছি বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগ শুধু 'মহৎ' গুণগুলির মধ্য দিয়ে নয়—এরকম 'মহৎ' গুণ আছে কিনা সন্দেহ—যোগটা হচ্ছে বর্তমান সমাজের সঙ্গে অতীত সমাজেরই—তার দোষ গুণ মিলিয়ে সমগ্রতার সঙ্গে। সেইজন্য অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ জটিলতর হয়ে উঠেছে। সে সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের পদ্ধতির মধ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য এবং বিশেষতঃ আধুনিক সাহিত্য বিচার করতে হলে তিনটী জিনিষের বিচার দরকার। প্রথমে আলোচ্য, সাহিত্যের মূল প্রকৃতি কি,—সাহিত্য সৃষ্টির কৌশল কি এবং সে হিসেবে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য এ যুগে সমাজে কি কি বিশেষ ভঙ্গী দেখা দিচ্ছে যার ফলে সাহিত্যের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীও অনিবার্য। তৃতীয়তঃ আলোচ্য, সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সে কতোটা সার্থক এবং কতোটা মেকি, এদেশে এবং বিদেশে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এর প্রথম দিকটার আলোচনা আছে।

সমাজ ও সাহিত্য

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কি ? এ সম্বন্ধে বহু তর্ক আছে। কেউ বলেন কাব্য অন্যফলনিরপেক্ষ, কাব্যেই কাব্যের সার্থকতা। সমাজের কি গেলো এলো দেখার প্রয়োজন কবির নেই। এ হলো সেই যুগের কথা যে যুগে ব্যষ্টি সমষ্টিকে অস্বীকার করতে চায়। আবার বর্ত্তমানে ঠিক বিপরীত কথাও শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া যাঁরা মধ্যপন্থী তাঁরা বলেন সাহিত্য সমাজের কাজে লাগে বৈকি, কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ নয়। তাঁরা বলেন "মোট কথা, সাহিত্য বা কাব্যের লক্ষ্য সমাজ-হিত, তবে খুব মনোরম ছলে"।

বিভিন্ন যুগে এই রকম বিভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়েছে তার পিছনেও সমাজবিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। মম্মটভট্ট লিখিত 'কাব্যপ্রকাশে' কাব্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই শ্লোকটি আছে—

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥

কাব্য যশ আনে, ধন আনে, লোকযাত্রার পথে সহায় হয়, অমঙ্গল ক্ষয় করে। আর কাব্য যে উপদেশ দেয় সে কান্তার মতো মধুর ভাবে। অর্থাৎ যেমন কাব্য হতে বোঝা যায় রামের আদর্শ অনুকরণ করা উচিত, রাবণের মতো হলে বিপদ অনিবার্য।

বলা বাহুল্য, এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কাব্যের সামাজিক সার্থকতা স্বীকার করতে লেখকের ইচ্ছা নেই, কিন্তু অসামাজিক হবার সাহসও নেই। সংস্কৃত সাহিত্য এই রকম অন্যফলনিরপেক্ষত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। কিন্তু কাব্য সামাজিক কি অসামাজিক এ তর্ক সংস্কৃত সাহিত্যের একচেটে নয়। যেখানেই সাহিত্য ও তার সার্থকতা সম্বন্ধে তর্ক উঠবে সেখানেই এই প্রশ্নও উঠবে।

কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নেই, এ কথাটা একেবারেই অচল। মানুষের ভাষাটাই সামাজিক, তার একটা অর্থ আছে যা অপরে বোঝে। যদি ভাষা ছাড়া সাহিত্য না হয় তা হলে সাহিত্যেরও সামাজিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাস্তবিকপক্ষে মানুষ যদি অর্থযুক্ত ভাষায় কোনও সাহিত্য রচনা করে তার মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব যতই পরিস্ফুট হোক্, সে রচনা লেখকের ইচ্ছা না থাকলেও অপরে বুঝবে। সে হিসেবে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সব সময়েই আছে, হয় বিরোধমুখে না হয় অন্বয়মুখে। সুতরাং প্রশ্নটা হচ্ছে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আছে কিনা তা নয়, প্রশ্নটা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি রকম সেই সম্বন্ধে। অর্থাৎ কোনও যুগে সাহিত্যে পাঠকসমাজকে অস্বীকার করার চেষ্টা দেখা যেতে পারে, কিন্তু তখনও তা অন্যপ্রভাবনিরপেক্ষ নয়। অলৌকিক সাহিত্যের কথা জানিনে, কিন্তু যে সাহিত্য লৌকিক উপভোগের জন্য রচিত তার অন্য-প্রভাব-সাপেক্ষত্ব স্বীকার করতেই হবে। এখানেই তর্ক ওঠে, সাহিত্য তা হলে কি সমাজের প্রচারপত্র ? না, সাহিত্যের কারণ হচ্ছে 'কেবল প্রতিভা', সমাজ সেখানে নিতান্তই পরোক্ষ ? দুয়ের সম্বন্ধ কতোটা ঘনিষ্ঠ ? দুয়ের ঠোকাঠুকি কোনখানে ?

পূর্বে সমালোচকদের অনেক সময় ধারণা ছিলো সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই, সাহিত্য কেবল ব্যক্তিমনেরই সৃষ্টি। সে হিসেবে সাহিত্যিকেরা কার্যতঃ লোকালয়ে থাকলেও এবং সমাজ-জীবন হতে বিচ্ছিন্ন না হলেও তাঁদের সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু এ যুগের অতি উৎসাহী সমালোচকেরা সাহিত্যকে সমাজ-মনের অভিব্যক্তি বলেই ভাবতে উৎসুক, ব্যক্তিমনের অস্তিত্বও তাঁদের কাছে অনেক সময় লুপ্তপ্রায়। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক জটিল, তাকে এরকম কোনো সহজ নিয়মে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বৃথা। বিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে

পথ-চলতি মনের কোন ক্ষণের মিলনে কি সাহিত্য রচিত হলো তা বুঝতে হলে দুয়েরই গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করা দরকার। কিন্তু নানা জটিলতা থাকলেও এর গোড়ার কথাটা কঠিন নয়। কেন না, সাহিত্যের মধ্যে মানবমনের যে নানা বিচিত্র গভীর অনুভূতি কাজ করে তার স্বরূপ চিনলে এ সমস্যারই কোনও কারণ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত এ কথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নেই—কেবলমাত্র কবি—বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নেই।...স্কুল থেকে এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ীর ঊর্দ্ধে ঘন নীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি এবং পুলকিত হয়ে যায়নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে বৃটিশ সবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানী নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনও রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন।"[১] এই হলো সাহিত্য রচনার ক্রিয়া, যাতে কবিমনের অনুভূতি রূপ গ্রহণ করে।

কিন্তু এর পিছনে আরও একটী ইতিহাস আছে। কাব্য যেমন কবিমনের সৃষ্টি, কবিমন তেমনই চারপাশের আঘাতে স্পন্দিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্ত্তা

১ কবিতা—আশ্বিন, ১৩৪৮

যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস যোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে···হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহের প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখ দুঃখকে যে আত্মসাৎ করে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে।" সাহিত্যে সমাজের ছায়া ঠিক প্রত্যক্ষভাবে পড়ে না, মধ্যে আছেন সেই আত্মা যিনি সুখ দুঃখকে আত্মসাৎ করে রচনার মধ্যে আনন্দ বিতরণ করেন। লক্ষ্য করতে হবে, শুধু সুখ নয়, দুঃখও এই আত্মসাৎ হওয়ার ফলে আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে। এইখানেই কাব্যতত্ত্বের মূল কথা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা বলেন, এই রকম দুঃখেরও সুখহেতুতা সম্ভব হয় পাঠক ও কবির একীকরণের মধ্য দিয়ে যে একটা মায়ার অলৌকিক জগৎ সৃষ্ট হয় সেই সৃষ্টির ফলে। মায়ার অলৌকিক জগৎ গড়ে উঠুক বা না উঠুক, একীকরণ কথাটার দাম আছে। দুঃখ যখন ব্যক্তিবিশেষকে আঘাত করে তখনই সে দুঃখ। কিন্তু ব্যক্তিরূপ ছেড়ে সে দুঃখ যখন সামাজিক ও সার্ব্বজনীন হয়ে ওঠে তখন তার দুঃখহেতুতা ঘুচে যায়। এই সামাজিকীকরণেই কাব্য সার্থক হয়ে ওঠে, তা না হলে করুণ রস বীভৎস রস ভয়ানক রসের কাব্য লেখাই চলতো না, সেগুলিতে রসোদ্রেকের বদলে শোক, ভয় প্রভৃতিই দেখা দিতো। বহুর ব্যষ্টিগত দুঃখ, সুখ, অনুভূতি একের মধ্য দিয়ে আবার বহুর কাছে পৌঁছয়, এই হলো সাহিত্য রচনার সম্পূর্ণ তত্ত্ব। তাই সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে ভিতর বাহির দুয়ের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে—তার সৃষ্টির প্রেরণায় সে অদ্বৈত হলেও তার সৃষ্টির প্রকৃতি সমাজের গণ্ডীতে বাঁধা। কারণ, একদিকে যেমন তার সমাজের সঙ্গে বিরোধ বা অন্বয়মুখীন সম্বন্ধ থাকবেই, তেমনি অন্যদিকে তার সৃষ্টির মূলে থাকবে কবিমনের স্ফুরণ। সেইজন্যে অন্যফল-নিরপেক্ষত্ব জাহির করলেও যেমন প্রকৃত কাব্যতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, অপরদিকে

তেমনি সমাজবোধের সাড়ম্বর ঘোষণা থাকলেও কাব্য কাব্য হয় না। মনে রাখা ভালো, কাব্যের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে যে ধর্ম হতে বিচ্যুত হলে তার কাব্যরূপ বজায় থাকবে না। এই স্বধর্মের জোরে সে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে যদিও সে বৈশিষ্ট্য সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। আধুনিক সমালোচকদের বহু তর্কের মূল এইখানে। যাঁরা প্রচার করেন কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য ফল কবিদের গজমোতিমিনারে বাস, এবং যাঁরা তার বিরুদ্ধে বলেন, যেহেতু নিছক স্বাশ্রয়ী কাব্য একেবারেই অসম্ভব এবং কবিরাও সমাজের দাস ও সে হিসেবে কাব্যও প্রোপাগাণ্ডার বাহন মাত্র, তাঁরা উভয়েই ভুলে যান সম্বন্ধটা ওরকম নয়, সম্বন্ধটা কবির অন্তরের মধ্য দিয়ে। প্রকৃত কাব্য যে আনন্দের সন্ধান দেয় এবং যে সমাজের পাঠকদের আনন্দ দেয় সে আনন্দ বা সে পাঠকবর্গের সঙ্গে কবিও সামাজিক সত্তায় মিলিত। কাব্য সে হিসেবে সেই আনন্দকেই নতুন করে সৃষ্টি করে যে আনন্দ নিছক ব্যক্তিক নয়, যে আনন্দ সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে অথবা প্রকাশ পাবার পথে প্রতিহত হচ্ছে। কাব্যের ব্যক্তিগত রূপ সেইজন্যে ক্ষয়িষ্ণুতার সূচক। কাব্য কোন্ আবহাওয়ায় তার স্বধর্মপালনের সুযোগ পায়, কি হাওয়ায় তার বৃদ্ধি, সামাজিকতার তাপমানে তা ধরা পড়ে। সেইজন্য কবিদের সেই সমাজেরই দাবী করা উচিত যে সমাজে কাব্যের পূর্ণতম বিকাশ সহজতর। কাব্যে যদি শ্রেণীহীন সমাজের রূপ ফুটবার দরকার হয় তবে সে দরকারটা কাব্যেরই, রাজনীতির নয়। আমাদের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময় এখানে বিকৃত। আমরা ভুলে যাই, কাব্যে যদি নিঃশ্রেণীক সমাজের কথা বলতেই হয় তবে সে কথা কেবল এই কারণেই বলবো যে শ্রেণীবদ্ধ সমাজে কাব্যের বিকাশ সম্ভব নয়, কাব্যে মানুষের যে সহজ মহিমার জয়গান আছে শ্রেণীর চাপে সে সহজ মহিমা নষ্ট হতে বসেছে। কিন্তু যদি দৈববলে এরকম একটা অবস্থা সম্ভব হতো যে সময় নিঃশ্রেণীক সমাজের প্রয়োজনটা রাষ্ট্রের, কাব্যের নয়, সে সময় কাব্যকে নিঃশ্রেণীক সমাজের প্রোপাগাণ্ডার বাহন করলে

রাষ্ট্রীয় সুবিধার সম্ভাবনা থাকলেও কাব্যের মরণ ঘটতো। এর অর্থ নয় যে কাব্যে অত্যাচারিতদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলা চলবে না। বরং ঠিক বিপরীত। কিন্তু সেই দুঃখদুর্দ্দশা বর্ণনার কারণ রাষ্ট্রিক প্রয়োজন নয়, কাব্যের প্রয়োজন ও কবিমনের প্রয়োজনও কেননা মনুষ্যত্বের অপমানে যদি কবিচিত্ত স্পন্দিত না হয় তা হলে সে চিত্ত কবিচিত্তই নয়। প্রকাশ যাই হোক্, তফাৎটা মূলে। Prolecult আন্দোলন স্বয়ং লেনিনের মতে bunk, কারণ কবি যদি স্বধর্মে অবিচল থাকেন তা হলে যে যুগে শ্রমিক বিপ্লব ছাড়া কাব্যের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় সে যুগে কবির মন স্বভাবতঃই বিপ্লবের কাব্য রচনা করবে, তার জন্যে আন্দোলনের দরকার নেই। বরং কবিচিত্ত তো সাধারণ মানুষের চেয়ে আগিয়ে চলে, কারণ সে চিত্ত আরও বেশী সংবেদনশীল, আগত ও অনাগতকালের সুখ দুঃখের তরঙ্গ তাতে আরও শীঘ্র ঢেউ তোলে, ক্রান্তদর্শিতা তাঁদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এ দুটা দিক্ অনেকটা সমসাময়িক। যে ঘটনাস্রোত মানুষের মনে নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্যে আন্দোলন জাগায় সে ঘটনাস্রোত কবির চিত্তে বরং বেশী চাঞ্চল্য জাগায়। যে স্পন্দন সমাজে লাগলো সে স্পন্দনকে কবি নিজের আত্মা দিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করলেন, তাকে নতুন করে সৃষ্টি করে আবার ছড়িয়ে দিলেন সমাজের মধ্যে। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এইখানে। সে সম্বন্ধ যেমন দৃঢ় তেমনি জটিল,—ও দুয়ের মাঝখানে আছে সাহিত্যকারের মন। যতোই আধুনিক বুলি থাক্ না কেন কোন কাব্য কাব্যই নয় যদি না তার মধ্যে এই মানস-প্রক্রিয়ার নিগূঢ় ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। একদল সমালোচকের সন্ধান সম্প্রতি মিলছে যাঁরা সাহিত্য বিচার করেন কতকগুলো মোটা মোটা চিহ্ন দিয়ে। যেমন বিষয়বস্তু, ছন্দ, টেকনিক্। আসলে তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর ও মেজাজের—তার থেকেই ওগুলি আসে এ বোধ তাঁদের নেই। সুতরাং বস্তি সাহিত্য, গদ্য কাব্য ও অশ্লীলতাই তাঁদের বিচারে কাব্যের সার্থকতার মাপকাঠি। এইরকম ফরমায়েসী

কাব্যের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের সেই পক্ষপাতের পিছনে একটা অস্পষ্ট ধারণার সন্ধান মেলে যে ধারণার মোট বক্তব্য হচ্ছে কবিদের পথ চলার জন্যে কতকগুলো বাঁধা রাস্তা ঠিক করে দেবার দরকার আছে —যেন, সাধারণ লোকের চোখে যা পড়ে, সাধারণ লোকের মনে যা ধরা পড়ে কবির অতিসংবেদনশীল মনে তা ধরা পড়ে না! আবার আর এক দল সমালোচক আছেন, যাঁরা এঁদের চেয়ে চতুর হলেও সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। এঁরা বলেন সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু দুয়ের কার্যক্ষেত্র এক নয়, সে হিসেবে দুটী আলাদা। অর্থাৎ, কাব্য ব্যক্তিমনের অসুস্থ প্রলাপ হোক্, মধ্যে মধ্যে ছিটেফোঁটা সামাজিক বুকনি থাকলেই হলো। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় মিশ্রণটা গুণের রীতিতে, যোগের রীতিতে নয়। আসল কথা, এরকম অগভীর ভাবে সাহিত্য ও সমাজের সমন্বয় সম্ভব নয়, তার জন্যে গোড়ার কথায় পৌঁছান দরকার। এ দুই দলের কোনো দলই সে দিকে যাবার চেষ্টা করেন না। ফলে সাহিত্য সম্বন্ধে মূলে ভুল। এর একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে কারণ এই সব সমালোচকদের দলে এমন এমন লোকেরও নাম পাওয়া যায় যাঁদের প্রবীণ খ্যাতি অর্বাচীন সমালোচকের মুখ বন্ধের পক্ষে প্রায় যথেষ্ট। কেন এই রকম দৃষ্টিবিভ্রম হয় তার সামাজিক কারণ খুঁজে পেলে সুস্থ কাব্যদৃষ্টির সহায়তা হতে পারে।

২

কিছুদিন আগে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য জিজ্ঞাসার' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তার নবযোজিত পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন, আমাদের মনের কর্মক্ষেত্র দুটী। তার প্রথম কাজ প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টি, যা সম্ভব হয়ে ওঠে সামাজিক মঙ্গলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু "প্রাণের কাজে ব্যয় হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর আনন্দ

সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়।" শ্রীযুত গুপ্তের মতে এই নিছক স্বকীয় তৃপ্তি ও আনন্দ সৃষ্টিই প্রকৃত সাহিত্যের গোড়ার কথা। এই ব্যাখ্যাটীর বিশেষ বিচার দরকার। সাহিত্যের যদি ঐ তত্ত্ব মানতে হয় তা হলে তার আগে স্বীকার করতে হয়, আমাদের মনের দুটী কর্মক্ষেত্র। শুধু তাই নয়, এ দুটী কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই—মধ্যে যেন একটা চীন প্রাচীর আছে। সেই প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছবার আগে আমাদের মননধারা প্রাণের কাজে লাগে, আর সেই প্রাচীর উপছে অবশিষ্ট যে মননধারাটুকু ঝরে পড়লো তাতে আর প্রাণের কাজ হয় না কিন্তু কাব্যের ভূমি সিঞ্চিত হয়। অর্থাৎ আমাদের মন একটি অখণ্ড জিনিষ নয়, তার মধ্যে এরকম মহল ভাগ করা চলতে পারে। কাব্যের এই তত্ত্বে বিশ্বাস করলে আরও মানতে হয়, যে যুগে আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য বেশি চেষ্টা করতে হয়, যে যুগে সংঘাত তীব্রতর, সে যুগে আমাদের মননধারাটুকু কাজের প্রাচীরের এধারেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে—উপছে পড়ে কাব্যের ভূমি সিঞ্চিত করার অবকাশ আর থাকবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুটী সিদ্ধান্তই অশুদ্ধ। মানুষের মনে এরকম সদর অন্দর মহল-ভাগ চলতে পারেনা, মনের এক কোণে যে আঘাত এসে পড়ে তার অনুরণন সমগ্র মনে বিস্তৃত হবেই। আর ঐ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটীও গ্রহণ করা চলে না, কারণ যে যুগে জীবন সংগ্রাম তীব্রতর সেই যুগে কাব্যের মন্দা হয় না বরং জোয়ার আসে,—কবিচিত্তের স্ফুরণের সম্ভাবনা বেশী। সমাজে যে সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার যুগে ইংরেজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক কাব্যের অভ্যুদয়, সে সময়ও রোমাণ্টিক কাব্য সার্থক হতে পেরেছিলো এই লৌকিক সমৃদ্ধির জোরে নয়, সংঘাতের তীব্রতাতেই। কবিরা আভাস পেয়েছিলেন চলতি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কোথায় যেন বিরোধ বেধেছে। সেইজন্যে শেলি বিপ্লবী ও এস্কেপিষ্ট, কীটস্ সুমরণ-প্রার্থী। কিন্তু তাঁদের বলার কথাটা যাই হোক্, সেই কথাটা কাব্যের পদবীতে যে উন্নীত হলো তার মূলে ঐ অনুভূতি

তীব্রতা। তা না হলে ওরকম তীব্রতা, স্ফুলিঙ্গ ও দম-আটকানো বক্তৃতা মিলতো না। গত শতকের শেষের দিকে ইংরেজী কাব্যে যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা গিয়াছিল তার প্রধান কারণই সম্ভবতঃ এই, যে কবিরা লৌকিক বিলাসে ও ঋদ্ধিতে এতই মগ্ন ছিলেন যে তাঁদের মধ্যে কবিজনোচিত দীপ্তি ও চেতনার বদলে একটা বাহ্যিক মোহময় আবরণে সমস্ত সমস্যা চাপা দেওয়ার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছিলো। রেঁনাশাঁসের সময় মধ্যযুগের অবসান ও বাণিজ্যিক প্রসার সমাজ-জীবনে যে সাড়া তুলেছিলো সেই সাড়াই কি সে যুগে সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম কারণ নয়? সে যুগে সংঘর্ষ ও প্রাণ-পুষ্টির চেষ্টা তো অত্যন্ত বাড়লো, ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হলো, কিন্তু তবুও তো শ্রীযুত গুপ্তের মতানুসারে সামাজিক মঙ্গলসাধনেই মননশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো না, বরং ঠিক বিপরীত ঘটলো। ব্যাপারটা বাস্তবিকই বিপরীত। এমন কি একথাও হয়তো বলা চলে যে সে যুগে সাম্রাজ্যিক ও বানিজ্যিক (অতএব সামাজিক) বিস্তার না ঘটলে সাহিত্যের নবজীবন সম্ভবই হতো না, Donne তাঁর প্রিয়া সম্বন্ধে লিখতে পারতেন না Oh, my America, my New-found Land, আর ইংরেজরা সে সময় were just in a financial position to afford Shakespeare at the moment when he presented himself![২] তা আর হতো না।

সাহিত্যের মুল প্রকৃতি সম্বন্ধে এরকম অস্পষ্ট ধারণা থাকলে ক্রমে কোন চোরাবালিতে পৌঁছতে হয় তার নিদর্শনও শ্রীযুত গুপ্তের প্রবন্ধে আছে। তাঁর মতের আর একটা স্বতঃসিদ্ধ এই যে সাহিত্য অন্যফল-নিরপেক্ষ এবং অন্যপ্রভাবনিরপেক্ষ। সাহিত্য বস্তুতঃ তা নয় সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এর বিস্তৃত আলোচনাও করেছি। কিন্তু এ কথা এখনই স্বীকার করা যেতে পারে

[২] *Drama and Society in the age of Jonson*—
L. C. Knights p. 3

সাহিত্য ওরকম পরগাছা নয়ই, ঠিক বিপরীত—তার মূল মাটির মধ্যে, সেখান থেকেই সে প্রাণরস সংগ্রহ করে, তার মাথা যতোই ঊর্দ্ধমুখ হোক্ না কেন। এই কথাটিই অস্বীকৃত হয়েছে শ্রীযুত গুপ্তের প্রবন্ধে। "মানুষের মন যে কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দের জন্যই সৃষ্টি করে, এও ত স্বাভাবিক; কারণ এ রকম সৃষ্টি মানুষ করেছে ও করছে।" এ হচ্ছে সাহিত্যরচনার সমস্ত মানস-প্রক্রিয়া থেকে যেটুকু কবিমনের দায়িত্ব সেটুকুকেই বড়ো করে দেখানো—অর্থাৎ কবিকে অস্বীকার করে কবির কাজটাকেই অতিরঞ্জিত করার বৃথা চেষ্টা। কবির কাজটা সাহিত্যে বড়ো নিশ্চয়ই—এমন কি সেইটেই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব; কিন্তু সেটা কবিরই কাজ—সে কাজটা কি কারণে হয়, কি ভাবে হয় এ কথা আলোচনা করতে অস্বীকার করলে আমরা সাহিত্যের বাহ্য (তাও আসল নয়) টেকনিক পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কিন্তু তাতে সাহিত্যের প্রাণতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রাণতত্ত্ব একটা অখণ্ড ব্যাপার, তার মধ্যে কার্য-কারণ আছে, কখনও বা সে প্রাগ্‌হেতু, কখনও বা কার্যানন্তর হেতু কখনও বা সহজ হেতু। আর তা ছাড়াও তার মধ্যেও একটা সমগ্রতা আছে যা ঐগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। সুতরাং প্রাণতত্ত্বের আলোচনায় কেউ শুধু নিঃশ্বাসতত্ত্ব আলোচনা করুন আপত্তি নেই, কিন্তু তাকে প্রাণতত্ত্ব বলা চলে না।

এই অসম্পূর্ণ ধারণার ফলে কতকগুলি গোলমাল দেখা দেয় যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় না। এইখানেই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি সে সম্বন্ধে বড়ো প্রশ্ন ওঠে। এই মতবাদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে সমাজকে অস্বীকার করা। কিন্তু সমাজে বসে এতো বড় অসামাজিক কথা বলা চলে না। সুতরাং সমাজকে একটু খাতির দিতেই হয়। এ হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত দুইদল সমালোচকের দ্বিতীয় দলের কথা। শ্রীযুত গুপ্তের মতে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এই রকমঃ—(ক) লৌকিক ও সামাজিক জীবনই সাহিত্যের সৃষ্টির উপকরণ। (খ) সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য পরিণামে (অবশ্য পরোক্ষ-

ভাবে) সমাজহিতই, কারণ সাহিত্যেরও তো প্রাণের উপর মায়া আছে—এই স্বাভাবিক মায়াই পরিণামে তাকে সমাজ-হিতের পথে রাখে। (গ) কিন্তু এই জিনিষটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়ই, বরং সাহিত্যের মূল প্রকৃতির বিরোধী, দায়ে পড়েই করতে হয়। "যেমন সভ্যসমাজের মঙ্গলের জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই রকম মঙ্গলের জন্যই আত্ম-তুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।" মুখ ঘুরিয়ে নিয়োগ করতে হবে! (ঘ) এতো রকম কারিকরীর পরও যদি সাহিত্যে সমাজের ছোঁওয়া লাগেই, কাব্যকে যদি শরীর ও প্রাণের হিতে 'মুখ ঘুরিয়ে' লাগতেই হয়, তা হলেও প্রত্যক্ষ উপদেশ অচল, পরোক্ষ উপদেশই ভাল। "হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু মনোহরণের কৌশলটা খুব সার্থক হলে তার জোরেই রচনা কাব্য ও সাহিত্য বলে চলে যায়। মধুর আধিক্যে ভিতরে যে ঔষধ নেই, সে দিকে লক্ষ্য থাকে না।" বলা বাহুল্য, এরকম সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা বৃথা। অহিতসাধন কাব্যের পক্ষে সম্ভবই নয়, যদি না সমাজ সমষ্টিগতভাবে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু সে তর্ক ছেড়ে দিলেও যদি সমাজ-হিতই কাব্যের উদ্দেশ্য হয় তা হলে তা প্রাণের স্বাভাবিক মায়ায় নয় কেন না কাব্য স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত নয়। সমাজহিত যদি সে করে-ই তার কারণ সাহিত্যের মধ্যে সামাজিক পটভূমিকায় প্রাণের বিকাশের পরিচয় থাকে। মনোহরণের কৌশলেই সমাজহিতকারী রচনা সাহিত্যের আসন দাবী করতে পারে এমন কথা সাহিত্যের চরম অপমান। সামাজিক অস্ত্র বর্ণনার জোরে কখনই সাহিত্যের আসন দাবী করতে পারে না, সাম্যবাদীর ইস্তাহার ছন্দোবদ্ধ হলেও সে কবিতা হয় না। কিন্তু সেটী কবিতা হয় না ঠিক সেই কারণেই যে কারণে চাঁদ চকোর মলয় থাকলেও রচনা কবিতা হয় না। শ্রীযুত গুপ্ত আরও লিখেছেন "হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের

নাম সৎ-সাহিত্য, আর তিনি যদি হন পরিবর্ত্তন বা গতির পক্ষে, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি সাহিত্য।” কবিরা কিন্তু আসলে স্থিতি বা গতি কোনটারই পক্ষপাতী বা অপক্ষপাতী ন'ন, তাঁরা শুধু সাহিত্যের পক্ষপাতী। যদি স্থিতিতেই সাহিত্য সম্ভব হতো, তা হলে স্থিতিই কাম্য। আর যদি গতি ছাড়া সাহিত্য সম্ভব না হয় তা হলে গতির দাবীই জানাতে হয়। দুয়ের মিশ্রণে বা ঘাতপ্রতিঘাতে সাহিত্য সম্ভব হলে সেটাই চাই। সাহিত্যের এই বিস্ময়কর শ্রেণীবিভাগ এবং প্রগতিসাহিত্যের এই ততোধিক বিস্ময়কর সংজ্ঞা আপাততঃ আশ্চর্য ঠেকে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ হতে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমাদের সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন কারণ ঘটে থাকে যাতে কোন কবির মন নতুন ভাঙন ধারার উজানে চলতে চায় তা হলে সে কবির কাব্য ও ভাঙনের কবির কাব্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু দুজনেই সমান সার্থক কবি হ'লে (মুস্কিলের কথা হচ্ছে উজান চলা সার্থকতার সহায়ক প্রায় হয় না) তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও যে গুণে কাব্য কাব্য হয় তার কোনই পার্থক্য ঘটার কারণ নেই।

৩

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে এইরকম অসঙ্গতি অন্যান্য লেখকের রচনাতেও আছে। এরকম উদাহরণ আরও পাওয়া যায় শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসুর বই “সব-পেয়েছির-দেশে।” তিনি লিখেছেন “জাগতিক দুঃসময়ের চিন্তা যদি কোনো কবির মনে এমন তীব্র ভাবে আঘাত করে যে তিনি কবিতা লেখাই বন্ধ করে দিলেন তা'হলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যদি তিনি কিছু লেখেন, আজ দুর্দ্দিন ব'লে সে রচনাকে খাতির করলে চলবে না, দেখতে হবে সেটা শিল্পের আদর্শে উত্তীর্ণ হ'লো কি না। আমি যদি আমার রচনায় ধনতন্ত্রের কালান্তক মূর্ত্তির বর্ণনা করি তাহ'লেই যেমন লাফিয়ে ওঠবার কিছু নেই, তেমনি যদি প্রিয়ার আঁখির বন্দনা করি তাতেও হতাশ হবার কারণ

দেখি না। যে কোন অবস্থায়, যে কোনো দুরবস্থায় উভয় বস্তুই কাব্যের বিষয় হ'তে পারে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই সুদ্ধু এটুকু বিচার ক'রতে হবে যে রচনাটা যথার্থ সাহিত্য হয়েছে কিনা। শিল্পকলার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, অন্য কোনো উপলক্ষ্য কি উদ্দেশ্য থেকে ধার করা নয়, একথা ভুলে যাওয়া আর মূলগত মূল্যবোধ হারানো একই কথা।" এটা অবশ্য সাহিত্য-রচনার নিখুঁত ইতিহাস। কিন্তু এই নিখুঁত বর্ণনা দেবার পরও তিনি লিখছেন, "সকলের অধিকার-ক্ষেত্র এক নয়, যে যার সীমানা মেনে চলবে, এবং নিজের সীমানার মধ্যে অনলস উৎসাহে কাজ করে যাবে—এই সহজ কথাটা মেনে নিলেই অত তর্ক ওঠে না। যে যা পারে না তাতে হাত না দেওয়াই ভালো, যাতে আন্তরিক উৎসাহের কিংবা স্বাভাবিক ধারণা শক্তির অভাব তা নিয়ে একটু সৌখীন নাড়াচাড়া করতে যাওয়া মূঢ়তা। কবি হ'তে হ'লে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে কবিত্ব-বিকাশেই, কর্মী যিনি কর্মই হবে তাঁর জীবনের অবিরাম সাধনা। এ দুয়ের সংযোগ অসম্ভব বলি না, কিন্তু তাদের মহল আলাদা, কেননা কর্মক্ষেত্রে কবিত্বের উন্মাদনা অসঙ্গত, আবার কর্মের ঘোর কুটিল পন্থার নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দর্শন বিজ্ঞানের উপাদান হ'তে পারে, সাহিত্যের নয়।" এই খানেই কাব্যের সঙ্গে সমাজের প্রকৃত যোগাযোগ ধরা পড়লো না। এ কথা খুবই সত্য যে সাহিত্য বা অন্য শিল্পকলার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে এবং সেখানে কেবলমাত্র বিচার করতে হবে, যে অবস্থাতেই সাহিত্য রচিত হোক তা প্রকৃত সাহিত্য হয়েছে কি না। কিন্তু এ কথা হ'তে কিছুতেই বলা চলে না, সকলের অধিকারক্ষেত্র কোনক্রমেই এক নয় এবং সে হিসেবে কবি ও কর্মীর সংযোগ অসম্ভব না হলেও সহজ নয়, বা স্বাভাবিক নয়। প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য অনুসারে কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য ঘটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যিনি কবি তিনি অপর সমস্ত কাজের ছোঁওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন, অন্ততঃ যে সময় কবিতা লিখবেন সে সময় তাঁর মন কবিজনোচিত

'বিশুদ্ধি'তে পরিপূর্ণ থাকা চাই—এ রকম ধারণা নিতান্তই অর্থহীন। এই কৃত্রিম দাঁড়িটানা তর্কে সম্ভব হলেও জীবনে সম্ভব নয়, বা তার চেষ্টা করাও উচিত নয়। এই গণ্ডী বিভাগ করতে হলে মেনে নিতে হয় আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবন হতে উপাদান সংগ্রহের উপায় সাহিত্যের নেই কেন না কর্মের ছোঁয়াচ লাগলে কাব্যের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। এই রকম কথাই তিনি লিখেছেন। "আজকের দিনে পৃথিবীর সমস্ত দেশে এমনি একটা দারুণ দুঃসময় উপস্থিত, সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব আজ বীভৎসরূপে প্রকট। এ অবস্থায় শিল্পকলা একটা বিলাস মাত্র, এরকম কথা উঠতে পারে।" উঠতে অবশ্যই পারে, কিন্তু তার ইঙ্গিত হচ্ছে কবির সামাজিক জীবন ও সাহিত্যিক জীবন একেবারেই তফাৎ এবং খেয়ালমতো মানসিক খোলস-ছাড়া তাঁর পক্ষে এমনই সহজ। "কোনো কোনো তরুণ ইংরেজ কবি কলম ফেলে বন্দুক তুলে নিয়ে স্পেনের যুদ্ধে গেলেন, গিয়ে প্রাণও হারালেন। মনে রাখতে হবে তাঁরা রণক্ষেত্রে নেমেছিলেন কবি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে, তখনকার মতো কাব্যের প্রেরণার চাইতে কর্মের প্রেরণা তাঁদের মনে প্রবল হয়েছিলেন।" এই যুক্তি অনুসারে যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক তাঁদের জগতের কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। আর একালে যে সংঘর্ষে আমরা শশব্যস্ত সেটা মতবাদের সংঘর্ষ এ কথাও বলা চলে না কারণ তা হলে দাঁড়ায় এই যে রুশিয়ার সৈন্যেরাও লড়ছে সাম্যবাদী হিসেবে নয়, বিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে। মানুষ তারা নিশ্চয়ই, কিন্তু মানুষে মানুষে তারতম্য ঘটে কিসে? স্বাধীনতা পেলে আমরা ভালো লড়বো এ কথার তা হলে কোনও মূল্যই থাকে না; এর আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর পিছনে রয়েছে এমন একটা ধারণা যার বক্তব্য হচ্ছে সাহিত্যের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে এবং সেই "বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বিষয়বস্তু" ছাড়া কাব্যের অন্য কোনও সার্থকতা নেই। কাব্যের সার্থকতা স্রষ্টিকারের বৈশিষ্ট্যে নয়, বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে! সুতরাং

তিনি যে বলেছেন "যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো দুরবস্থায় উভয় বস্তুই কাব্যের বিষয় হতে পারে, এবং উভয় ক্ষেত্রেরই সুদ্ধু এটুকু বিচার করতে হবে যে রচনাটা যথার্থ সাহিত্য হয়েছে কি না"—এ কথাটা এমনিতে খাঁটি হলেও এই প্রসঙ্গে মূল্যহীন, কেননা দেখা যাচ্ছে তাঁর যুক্তি আর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিরোধী।

৪

এই খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের চিন্তা-বিভ্রাটের কথা উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। এগুলিকে শুধু ব্যক্তি-বিশেষের দুর্ব্বলতা বলে নিশ্চয়ই মনে করা চলে না,—অন্ততঃ এরকম খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বেলায়। সুতরাং এর পিছনে আরও গভীর কোনও কারণ খুঁজতে হয়। বিশেষতঃ যখন এইরকম চিন্তাবিভ্রাটের ছাপ প্রবন্ধ বা সমালোচনা ছাড়া সাম্প্রতিক কবিতাতেও পাওয়া যাচ্ছে তখন ব্যাপারটার পিছনে কোনও গভীর কারণ আছে এ ধারণা অসঙ্গত নয়।

এই চিন্তাবিভ্রাটের প্রাথমিক কারণ সাহিত্য ও সমাজের যোগাযোগ সম্বন্ধে অযথাযথ ধারণা। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগ থাকবে অথচ সাহিত্যিক 'বিশুদ্ধি' নষ্ট হবে না—এই দোটানার ফলেই এই সমস্যার সৃষ্টি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এরকম দায়ে-পড়ে-স্বীকার-করা গোছের সম্বন্ধ নয়, তার মিশ্রণ গভীর, সে সম্বন্ধ ধূর্জ্জটীপ্রসাদের ভাষায় "আকার ও দেহের, রূপ ও সত্ত্বার" সম্বন্ধ, যা অনুভব করা যায় কিন্তু স্পষ্ট সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা চলে না। অবশ্য সেখানেও প্রশ্ন ওঠে, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ সাহিত্যকারের মনের মধ্য দিয়ে হলেও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাহিত্যের চেহারা-বদলের একটা স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না। সাহিত্যের বিবর্ত্তন সাহিত্যিক প্রয়োজনেই হয়। কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, সাহিত্যিক প্রয়োজনের পিছনেও সামাজিক প্রয়োজন থাকে কি না, অন্ততঃ সামাজিক চেহারা-

বদলও থাকে কিনা। সাহিত্যিকের রূপ পরিবর্তনের পিছনে থাকে সাহিত্যিকেরই মানসিক গঠনের পরিবর্তন। কিন্তু সাহিত্যিকের মানসিক গঠনের এই পরিবর্তন ঘটে কিসে? যদি দেখা যায় সামাজিক বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাহিত্যিকের মানস-গঠনেরও একটা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী দেখা যাচ্ছে তা হলে দুয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন অন্যায় নয়। যদি কেউ বলেন, ঐ চিন্তা-বিভ্রাটের প্রাথমিক কারণ সাহিত্য ও সমাজের যোগাযোগ সম্বন্ধে অযথাযথ ধারণা, কিন্তু এই অযথাযথ ধারণার পিছনে আবার আছে বর্তমান সামাজিক অবস্থা তা হলে সে কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যে সময় কবিদের মন সত্যি-ই বদলায় নি, যাঁদের পারিপার্শ্বিক সমাজ সে বদলানোর সহায়ক নয়, দেখা গেছে সে কবিরাও অনেক সময় চলতি ফ্যাশানের খাতিরে 'আধুনিক' হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার ফলে সাহিত্যিক গোলমাল এবং দুর্ব্বল কাব্যই পাওয়া যাবে, তার বেশী কিছুর আশা করে চলে না।

সাহিত্য ও সমাজের যোগাযোগ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তার থেকে সুতরাং পরবর্তী প্রশ্ন ওঠে, সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যিকের মানস-গঠনের কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ আছে কিনা এবং যদি তা থাকে তা হলে তার প্রকৃতি কি? আমরা বিবর্তনের ধারায় এমন কোনও অবস্থায় পৌঁছেছি কি যে অবস্থায় এরকম চিন্তাবিভ্রাট স্বাভাবিক?

সমাজতন্ত্র, ভাবতন্ত্র, রূপতন্ত্র—সংযোগ

রোজার ফ্রাই-এর মতে মহৎ আর্ট সামাজিক[১]। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে what the history of art definitely elucidates is that the greatest art has always been communal, the expression—in highly individual ways, no doubt—of common aspirations and ideals. কিন্তু তবুও দেখা যায় বহু সময়ে আর্টে যে আন্দোলন এসেছে সমাজে সে আন্দোলন আসে নি। ফ্রাই-এর উদাহরণ হচ্ছে, প্রথম খৃস্টধর্ম্ম প্রচারের সময় রোম সাম্রাজ্যের আর্টে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। অরফিউসের জায়গায় যিশুখৃষ্ট দেখা গেল এই পর্যন্ত। কিন্তু রেণাঁশাঁসের সময় সমাজের পরিবর্তন ও আর্টের পরিবর্তন পাশাপাশি। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ফরাসী বিপ্লব এলো তখন আর্টে অনুরূপ বিপ্লব আসে নি—আর্ট তখন রাজসভার আশ্রয়ে সৌখিন মুষ্টিমেয়ের বিলাসের সামগ্রী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন প্রথম ইম্‌প্রেসনিজম চিত্রকলা দেখা দেয় তখন সেটা আর্টের রাজত্বে বিপ্লব আনলেও সে সময় অনুরূপ কোনও সামাজিক বিপ্লব দেখা যায় নি। সামাজিক বিপ্লব এসেছে তার অনেক পরে। মহৎ আর্ট যদি সবসময়ে সামাজিক হয় তা হলে এইরকম তালভঙ্গের কারণ কি? অবশ্য এক হিসেবে জীবনের বিভিন্নমুখীন বিকাশের অদ্বৈত ব্যাখ্যার বিপদই এইখানে। কিন্তু সে তর্ক না তুললেও এই তালভঙ্গের একটা সহজ কারণ আছে। সেটা হচ্ছে আর্টের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের মধ্যে। পূর্ব্বে বোঝাবার চেষ্টা করেছি আর্ট বা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ সোজাসুজি প্রত্যক্ষ নয়—মাঝখানে একটু বৈচিত্র্য আছে। সেই কারণে

১ Roger Fry: *Vision and Design.*

ফ্রাই-এর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে the correspondence between art and life which we so habitually assume is not at all constant and requires much correction before it can be trusted. কখনও দেখা গেছে সমাজে হাওয়াবদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্টের চেহারা বদল হয়ে চলেছে, কিন্তু আবার কখনও দেখা যায় সে হাওয়াবদল হওয়ার আগেই আর্টে যুগ-পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ আর্টিষ্টের মনে। চারপাশের আবহাওয়ায় বিপ্লবের বীজ নিহিত থাকে, সে বীজ ফুটবার আগেই কবির চিত্তে তরঙ্গ তোলে, এমন কি কোনো কোনো সময় সজ্ঞানেও নয়, অনেকটা স্বাভাবিক সংস্কারের মতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়।"[২] কিন্তু তার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নেই এমন কথা কোনক্রমেই বলা চলে না।

গত শতকে আর্টে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিলো সমাজের পরিবর্তন তার সমসাময়িক না হলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। এই আর্টের মধ্যে চিত্রকলায় পরিবর্তন প্রথম। চিত্রকলার পরিবর্তন কেন প্রথম দেখা দিয়েছিলো তার কয়েকটা কারণ আছে। সেগুলি পরে আলোচ্য। ঐতিহাসিক ভাবে দেখলে দেখা যায় আদিম মানুষেরা যে ছবি আঁকে তার সঙ্গে ছবির বিষয়-বস্তুর অদ্ভুত সাদৃশ্য। প্রাচীন-প্রস্তর যুগের যে সমস্ত ছবি আজও বর্তমান-সেগুলি যেন জীবন্ত। স্পেনের আল্টামিরা গুহায় বাইসনের ছবি জীবন্ত বাইসনের অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সেই ছবিগুলি আলোচনা করলে তার মধ্যে দুটো স্পষ্ট লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, জীবন্ত বস্তুর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য। ফ্রাই-এর ভাষায়, Palaeolithic man has left paintings in which, as far as mere naturalism of representation of animals goes, he has surpassed anything that not only our

২ নবজাতক, সূচনা।

own primitive peoples, but even most accomplished animal draughtsmen have ever achieved. দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় সে যুগে চারপাশে যে সমস্ত জিনিষ নজরে পড়ে সেইগুলিই ছবির বিষয়, বাস্তব-সম্পর্কহীন নিছক কল্পনাগত কোনও বিষয় ছবিতে আমদানি করা সম্ভব হয় নি। মানুষের মনের বিবর্তনের যে ধারা আছে তাতে সে যুগে এই দুটী লক্ষণ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। অতি আদিম যুগে মানুষের মন তেমন দানা বাঁধে না, এমন কি তখন সমাজও দৃঢ়-সম্বদ্ধ না থাকায় পারস্পরিক অভিঘাতও বেশি নয়। সেইজন্যে জগৎ যেমনটী চোখে পড়ে তাকে তেমনই রূপ দেবার চেষ্টা। এ শুধু চিত্রে নয়, নৃত্যেও। আদিম যুগের নৃত্যে দেখা যায় কোনও পশুর অভিনয় করতে হলে সেই পশুর নির্ভুল অনুকরণই প্রচলিত রীতি, এমন কি সাজে পোষাকেও। এখনও এর নিদর্শন কোথায়ও কোথায়ও মেলে। সেন্‌সাস রিপোর্ট হতে উদ্ধৃত করছি— (Census, Vol, I, Part I, p. 413)—In the Nicobars where descent is claimed from a dog and a woman, the dress of men is said to be intended to simulate a doggy appearance, consisting of a fillet round the head with two ends sticking up from knot on the forehead to resemble dog's ears, while * * * * the waist-band is arranged to fall down behind in a tail. কিন্তু এই যুগ কাটবার পর যখন নব-প্রস্তর যুগের উদয় হয় তখন সংঘবদ্ধ সমাজ প্রথম দেখা দিয়েছে, একক ভাবে শিকার করা ছাড়া চাষবাসের প্রথম সূত্রপাত হয়েছে। এই সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে শুধু গ্রহণ করে না, বশে আনবার চেষ্টা করে। সুতরাং প্রথম যুগে মানুষ প্রকৃতিকে শুধু গ্রহণই করে, তার যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তোলাতেই সে যুগের শিল্পের সার্থকতা। এই কারণেই এই গুহাঙ্কন গুলিতে প্রাকৃতিক

বিষয়ের প্রাধান্য, কল্পনার অবসর কম, এবং যথাযথ রূপ দেবার চেষ্টা। নৃত্যেও তাই। কিন্তু পরবর্তী যুগে দেখা যায় এইরকম বস্তু-তন্ত্রতা ছেড়ে রূপ-সজ্জার (decoration) দিকে চিত্রকলার ঝোঁক পড়ে, ফলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ চিত্রমালা হতে লেখমালার উদ্ভব।

কিন্তু তার পরের যুগে দেখা যায়, মানুষ আবার প্রাকৃতিক চিত্র আঁকতে সুরু করেছে, কিন্তু নতুন ভাবে। এবার আর শুধু বস্তুগত রূপ দেবার চেষ্টা নেই, তার সঙ্গে কল্পনা মিশেছে। অর্থাৎ সমাজ আরও শ্রেণিবদ্ধ,—অন্ততঃ শ্রেণিবদ্ধ না হলেও ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার সমষ্টি-চেতনা চরমে পৌঁছল। মেঘের ছবি, বৃষ্টির ছবি এবং সেইসঙ্গে এই সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের এক একটা দেবতার পরিকল্পনা— এগুলি সেই যুগেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে যে সময় প্রকৃতির নির্বাক্ দর্শক হয়েই মানুষ তৃপ্ত নয়, শুধু প্রকৃতিকে বশে এনেও তার শান্তি নেই, প্রকৃতিকে বশে এনে তাকে কল্পনার রংএ পুনরুজ্জীবিত করে প্রকাশ করার চেষ্টা দেখা দেয়। বর্তমান অর্থে কবিকর্মের প্রথম সুরু এইখানে। কোনো বস্তুকে কল্পনার রংএ রাঙানোর ফলে তার আসল চেহারা, আসল পরিমাপের বদল হতে পারে সে তত্ত্বটা প্রথম ধরা পড়লো। শেষের যুগে এই কল্পনা বহু বিচিত্র পথে চলেছে, কিন্তু প্রথমে এই কল্পনা প্রকৃতিকেই রাঙাবার চেষ্টা করেছে, বস্তুগত রূপকে তার জীবন্ত পরিমাপ হতে বাড়িয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছে। গ্রীক দেবতাদের বিরাট্ প্রতিমূর্তি রচনার মানস-ইতিহাস এইখানে। ফিডিয়াসের যে সমাজে জন্ম সে সমাজ এক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ, এক হিসেবে নয়। সে যুগে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু উচ্চশ্রেণীরা অত্যাচারিত শ্রেণীদের সমাজে বা রাষ্ট্রে কোন স্থান দিতে রাজী নয়। অথচ সাম্রাজ্যিক প্রসারের ফলে এই উচ্চশ্রেণীরা দৃঢ়সম্বদ্ধ, রাষ্ট্র তাদের কাছে একটা বড়ো জিনিষ, তার মধ্যেই তাদের সার্থকতা। এই সাম্রাজ্যিক প্রসারের সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন দেখা গেছে, তারা নিজেদের মনের কল্পনাকে রূপ দিতে চায় পরিচিত বস্তুর

অনুকৃতির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ নিছক অনুকরণ নয়, তার সঙ্গে নিজের বক্তব্যও আছে। এই কারণেই ফিডিয়াসের মূর্তিগুলি বৃহদাকার, মানুষের মতো হলেও তারা মানুষের আকারের চেয়ে বহুগুণে বড়ো। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে মানুষের মন এমন এক অবস্থায় পৌঁছল যে সময় এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাভাবিক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। বহুযুগ পরে আমরা মধ্যযুগে ইটালী এবং অন্যান্য দেশে যে আর্টের সন্ধান পাই, তার মূল কথাটা সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। একদিকে বস্তুগত রূপ দেবার চেষ্টা আছে—এমন কি সে চেষ্টা এত বেশী আছে যে প্রায় আলোকচিত্রের মতো নিখুঁত প্রতিলিপি রচনার চেষ্টাও বিরল নয়—কিন্তু সেইসঙ্গে নানা কল্পনাগত জিনিষ অদ্ভুত ভাবে মেলাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সে যুগের চিত্রকলা সহজবুদ্ধিতে বিচার করলে কতকগুলি জিনিষ সহজেই চোখে পড়ে। হয়তো সে কথা বিদগ্ধদের মতানুযায়ী নয়, কিন্তু সহজ বুদ্ধিকেও উপেক্ষা করা চলে না। সে যুগের চিত্রকলায় দেখা যায়, ছবির নিম্নাংশে নানা বাস্তব কাহিনী, যদিও ঠিক বাস্তব ভঙ্গীতে নয়,—তার মধ্যেও একটা নতুন করে গড়ার চেষ্টা আছে। পণ্ডিতেরা বলেন জটোর বাহাদুরিই সেখানে—বিভিন্ন মূর্তি পাশাপাশি সাজালে কি ভাবে নতুন সংগতি গড়ে ওঠে তার রহস্য সে সময় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর এ সম্বন্ধে নতুন পথ দেখান দা ভিঞ্চি, তারপর অন্যান্য চিত্রকরেরা। কিন্তু লক্ষ্য করার কথা, আমাদের জীবনের স্বাভাবিকতা মোটের উপর বজায় রেখেও কি ভাবে জীবনবহির্ভূত সংহতি ও নতুন রূপ দেবার চেষ্টা। আর সেইসঙ্গে দেখা যায় ছবির ঊর্দ্ধাংশে দেবদূত, মেঘ ইত্যাদি আঁকা আছে। এই বস্তুর সঙ্গে বস্তু-অতীত রহস্যকে মেলাবার চেষ্টা, এ-ও সে যুগের মনের পরিচায়ক। মধ্যযুগের অবসানের পর যে যে কারণে রেণাঁশাঁস সম্ভব হয়েছিলো, অর্থনৈতিক প্রসার তার মধ্যে একটা। সমাজে সে সময় একটা সংহতি ছিল, কিন্তু সেই সংহতির মধ্যে আবার ব্যক্তির জয়গান। সেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের সংহতির মধ্যে নায়কদের

বলিষ্ঠ বিদ্রোহ এবং ফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। কিন্তু এ মৃত্যুই তাঁর ট্র্যাজিডির কারণ হলেও এ মৃত্যু যেন স্বাভাবিক, ট্র্যাজিডি ঘটলো যেন মৃত্যুর জন্য নয়, ট্র্যাজিডি ঘটছে এই কারণে যে একজন বলিষ্ঠ নায়ক তার শক্তি প্রয়োগ করছে সমাজ-সংহতি নষ্ট করার জন্যে, যে সমাজ-সংহতির অপর নাম fate বা nature. এই ব্যক্তি-প্রাধান্যকেও নতুন করে সৃষ্টি করাকে রোজার ফ্রাই বলেন intellect তাঁর নামকরণ সম্বন্ধে যতোই আপত্তি থাক্, তাঁর বক্তব্য বিচার-যোগ্য।

In speaking of intellect it is necessary to discriminate between two distinct modes of operation. The intellect may seek to satisfy curiosity by observation of the distinctions between one object and another by means of analysis; but it may concern itself with the discovery of fundamental relations between these objects, by the construction of a synthetic system which satisfies the mind, both for its truth to facts and its logical coherence. The artist may employ both these modes. His curiosity about the phenomena of nature may lead him to accurate observation and recognition of the variety and distinctness of characters, but he also seeks to construe these distinct forms into such a coherent whole as will satisfy the aesthetic desire for unity. . . . It is a curious fact that at the beginning of the fifteenth century in Italy, art was deeply affected by both kinds of intellectual activity. Curiosity about natural forms in

all their variety and complexity—naturalism in the modern sense (এই modern কথাটি লক্ষ্য করার মতো। naturalism কিন্তু nature নয়!)—first manifested itself in European Art in Flanders, France, and North Italy about the second decade of the fifteenth century.

কিন্তু ক্রমশঃ এই unityতে মানুষ তুষ্ট থাকলো না। তার অন্যতম কারণ, এই aesthetic unityর নামে এমন প্রাণহীন চিত্রকলার প্রচলন হলো যাতে শিল্পীমন সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই ক্রমশঃ 'বিশুদ্ধ' আর্টের উদ্ভব। এই 'বিশুদ্ধ' আর্টের ইতিহাস কৌতূহল-জনক। যে সময় ঐ প্রাণহীন শিল্পের প্রচলন হলো সেইসময় জনকয়েক শিল্পী অনুভব করলেন জগতে বাস্তবিক যে সংহতি আছে তার মধ্যেও নানা স্তরের সম্মিলন আছে যেগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না। আর বাস্তবিকপক্ষে যদি চিত্রকলার মূলতত্ত্বে পৌঁছতে হয় তাহলে এই বিভিন্ন স্তরগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তব জগতে যে সংহতি দেখা যায়, চিত্তবৃত্তিতে বা ভাববৃত্তিতে সে সংহতি ঠিক সাড়া তোলে না। সে কারণে চিত্রে শুধু আমরা বাস্তব জগৎ দেখি না, যেটা দেখি সেটা বাস্তব জগতই, কিন্তু শিল্পীর বাস্তব জগৎ। এই সত্যটা স্বীকার করলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, যদি প্রকৃত aesthetic unity গড়তে হয় তাহলে তাকে বস্তুতন্ত্র হতে হবেই এমন কোনও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই, কারণ যেটা দ্রষ্টব্য সেটা aesthetic unity, ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি নয়। এইখানেই রসতত্ত্বের মূল সমস্যা। সুতরাং সমাজ যখন শ্রেণিবদ্ধ ও বিবর্তনের পথে বহুদূর অগ্রসর, তখন aesthetic unityর মূলতত্ত্ব হচ্ছে বাস্তব জগতের কল্পনা মিশ্রিত ছবি। ভাব-রূপায়নের যে কোনও ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে। সে সময় শিল্পীরা অনুভব করেন বাস্তব জগতেও যেগুলি চিত্রার্পণের উপযুক্ত তার মধ্যে আলো

ছায়া বর্ণ গন্ধের লীলা আছে, শুধু সংহতির নামে এগুলির লঘুগুরু ভেদ অস্বীকার করলে চিত্রের মূল প্রকৃতি ও প্রয়োজনকেই অস্বীকার করা হয়। গত শতকের শেষার্দ্ধে ইম্‌প্রেসনিজমের উদ্ভবের পিছনে এই কথাই ছিলো। শিল্পীর দৃষ্টি যে 'বিশুদ্ধ' শিল্পের দৃষ্টি, জীবনের নানা স্তরের স্বাভাবিক সম্বন্ধের বিপর্যয় করার অধিকার শিল্পীর আছে, শিল্পের খাতিরে কোথায়ও আলো কোথায়ও বা ছায়া ফেলা চলতে পারে, কোনও অংশ স্পষ্ট কোনোটাকে বা অস্পষ্ট করতে হবে, এই ছিলো তার প্রথম কথা। বর্তমান কাব্যে আঙ্গিকের বিপর্যয় সংস্থাপনের মূলেও ঐ কথাই আছে। বাহ্য সংহতি ভেঙে স্তরগুলিকে 'বিশুদ্ধ' কাব্যরসের খাতিরে এলোমেলো সাজানো। কিন্তু দেখা গেল যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই স্তর বিপর্যয় আরম্ভ হয়েছিলো, ক্রমশঃ সেই উদ্দেশ্য গেল দূরে, টেক্‌নিকই বড়ো হয়ে উঠলো। ইস্থেটিক সংহতির বদলে কি কি উপাদানে সেই সংহতি গঠিত সেই উপাদানেই বৃহত্তর কৌতূহল জাগলো,—সংহতির বদলে উপাদান নিয়ে নাড়াচাড়াই আর্টের প্রধানতম কথা হয়ে দাঁড়ালো। যেন ব্রাউনিং-এর কাব্য। প্রকৃতিকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আসলে ভয় করতেন, তাঁর কাব্যের প্রকৃতি তাঁরই কাব্যের প্রকৃতি, সে প্রকৃতি মৃদু শান্ত লেক-অঞ্চলেরই প্রকৃতি, খরতাপদগ্ধ মরুভূমি নয়। হক্‌সলীর কথায়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ দেখলে তাঁর প্রকৃতির নেশার অবসান ঘটতো। কিন্তু বস্তুতঃ তা ঘটে নি, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর স্বরচিত প্রকৃতির মধ্যেই কাব্যজগৎ গড়েছিলেন, জীবনের নানা সমস্যার কল্পিত সমাধান গড়ে নিশ্চিন্তে রাজকবির সম্মান উপভোগ করেছিলেন। ব্রাউনিং-এর কৃতিত্ব এইটুকুই যে তিনি এই সমস্যাগুলির ভয়ে আত্মগোপন করেন নি, তাদের অস্তিত্ব সাহসের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐটুকুই। তার কোনো সমাধান তাঁর কাব্যে নেই, তা থাকা সম্ভবও ছিলো না। ফলে তাঁর কাব্যে মানবহৃদয়ের স্তরগুলিকে

ঘড়ির কলের মতো বিচ্ছিন্নভাবে দেখাবার চেষ্টা আছে, কিন্তু সে চেষ্টায় আসল হৃৎস্পন্দন তিরোহিত হলো। ব্রাউনিং-এর কাব্যে শুধু এটুকু থাকলেও সহ্য করা চলতো, কিন্তু যখন তিনি এই যান্ত্রিক উদ্‌ঘাটনকেই শিল্পের শেষ কথা বলে মনে করেন, অন্ততঃ নাটকীয় ভাবে তার উপর যবনিকা টানেন, তখনই বলতে হয় তাঁর কাব্য চিত্রকাব্য অর্থাৎ অধম কাব্য। সেযুগের নতুন আর্টও শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া কিছু নয়। প্রথম যুগে ইম্‌প্রেসনিষ্টদের প্রাধান্য—তাঁরা এই কথাটিকে বলবার জন্যে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ যখন বাস্তব জগতে কিছু দেখে—এমন কি অন্য একজন মানুষকে দেখে—তখন বাস্তবিকপক্ষে আমাদের নজরে পড়ে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। সেই সহজে-চোখে-পড়া বৈশিষ্ট্য হয়তো একটা পরিপূর্ণ ছবি গড়তে পারে না, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই চিত্রের প্রাণ, তার প্রকৃত বক্তব্য। এর কাব্যিক প্রতিরূপ পাওয়া যায় কতকগুলি রোমান্টিক মুহূর্তের কাব্যে—instant made eternity. প্রথম যুগে স্তরভাঙা ঐ পর্যন্ত পৌঁছয়। কিন্তু পরে যখন ঐ স্তর-ভাঙার মধ্য দিয়ে আর একটা জিনিষ বেশ নিয়মমাফিক উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা হয়—যেটা পোষ্ট-ইম্‌প্রেসনিষ্ট যুগের কথা—সে সময় শুধু আকস্মিক অনুভূতির বদলে একটা সংহতি গড়বার চেষ্টা হয়—যদিও সে সংহতিও কাল্পনিক ব্যক্তিক এবং অলীক। এর গোড়ার কথাটাই ব্রাউনিং-এর মতো কবির কাব্যে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ পাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, এরকম শিল্পধারার শেষ এখানে নয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে এমন স্থানে পৌঁছলো যেখানে বক্তব্যের চেয়ে টেকনিকই উঠলো প্রধান হয়ে। যেন গদ্যছন্দে যাই লেখা হবে তাই সার্থক আধুনিক কাব্য। এরই নাম কিউবিজম। জীবনে নানা খোঁচ আছে, বাহ্যিক শ্রান্তির ভেতরে আছে তীব্র সংঘাত। উদারনৈতিক পন্থা চলবে না, তার ভণ্ড উদারতা আজ ধরা পড়েছে, শ্রেণিসংগ্রাম বাস্তব সত্য।

রাজনীতি, সাহিত্য, চিত্রকলা, প্রত্যেকের মধ্যে তাই একই কথা, কেননা সেইটেই এ যুগের মানুষের জীবনের কথা।

সম্প্রতি কড্‌ওয়েল বলেছেন কাব্য, চিত্রকলা, গান এবং অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে পার্থক্য যাই থাক্ একটী বিষয়ে অন্ততঃ এ যুগে তাদের সাদৃশ্য আছে। এ যুগে অর্থাৎ শ্রেণিবদ্ধ সমাজের যুগে। শিল্পীমনের দিক্ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ যুগের শিল্পের মধ্যে দুটী উপাদান আছে। একদিকে শিল্পীর মন, অন্যদিকে বাস্তব জগৎ। এই দুই-এর ঘাতপ্রতিঘাতে যে শিল্পজগৎ সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে বাস্তব জগতের আপাততঃ সাদৃশ্য থাকলেও বাস্তবিক কোনও সাদৃশ্য নেই। বাস্তব জগতের আপাত-অনুকৃতি কিন্তু পরিণাম-বিকৃতিতেই শিল্পের উৎপত্তি। সঙ্গীতের উপকরণ সুর, কিন্তু সুরই একটী সংহতির মধ্য দিয়ে ঐ শিল্প সৃষ্টি করে। কাব্যে ঐ আপাত অনুকৃতি কিন্তু পরিণাম-বিকৃতি সম্ভব হয় ভাষার নিয়ম ও শব্দের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। চিত্রে অনুকরণের মধ্য দিয়ে এই শিল্প-কার্য সম্ভব। সুতরাং এই বিভিন্ন ভাবতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও (এইজন্য একই ঘটনাবলীর ফলে তাদের প্রকাশভঙ্গী এক সময়ে নয়) একটী ব্যাপারে তারা এক। সেটী হচ্ছে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে শিল্পীমনের সম্বন্ধ। এই সত্যটী স্বীকার করলে আরও একটী কথা মানতেই হয়। যদি শিল্পীমনের ভঙ্গী মূলতঃ একই হয়, তাহলে এদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে আপাততঃ যতোই পার্থক্য থাক্, অন্ততঃ দীর্ঘকালে এদের মধ্যে কতকগুলি সমধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির উদ্ভব সামাজিক অবস্থার মধ্যে। এই সমধর্মিতা ঠিক একটী মুহূর্তে বিভিন্ন ভাবতন্ত্রে একই চেহারায় দেখা যাবে এ কথা বলা চলে না, কিন্তু দীর্ঘকালে সে সমধর্মিতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এদের পার্থক্য বিচার আপাততঃ বন্ধ রেখে সেই সাদৃশ্য বিচারই প্রথমে করা চলতে পারে।

২

আর্টের বেলায় যে ঐতিহাসিক বিচার খাটে, সাহিত্যেও তা বলা চলে। ব্যাপারটা মূলতঃ একই, অবশ্য আর্ট ও সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে তাদের কতকগুলি পার্থক্য আছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগে যেমন দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতির যথাযথ রূপ দেওয়ার চেষ্টাই সে যুগের আর্টে ফুটে উঠেছে, তেমনই সাহিত্যের গোড়াপত্তনও ঐ ভাবে। প্রকৃতি-বন্দনা তো আদিম সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে যেমন সমাজের গোড়াপত্তন হয় তেমনই সাহিত্যের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। যে যুগে মানুষ একক শিকার সন্ধান করে তার বক্তব্য, আর যে যুগে চাষবাস সুরু হয়েছে অর্থাৎ জীবনযাত্রার জন্য প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করে সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ প্রকৃতিকে বশে আনবার চেষ্টা করছে তার বক্তব্য এক নয়। একটাতে থাকে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, কিন্তু অপরটার একটা সামাজিক মূল্য আছে—সংহতিবদ্ধতার প্রথম সুরু সেইখানে, art as communication এবং art as collective emotion সেই-ই প্রথম সুরু। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কেন না এ আলোচনা বর্তমান সমালোচক-মহল বহু স্থানেই করেছেন, এবং দ্বিতীয়তঃ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সমাজ ও সাহিত্যের প্রকৃত সম্বন্ধের উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটা বড়ো যুগ-বিভাগ সুস্পষ্ট। প্রথম যুগে মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান বড়ো, ধর্ম সে সময় প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। সেইজন্য সেকালে কাব্য ও ধর্ম ঘনিষ্টভাবে জড়িত, আদিকালের ধর্মশাস্ত্র বহু সময়েই ছন্দোবদ্ধ। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধর্ম একটি বিশেষ তত্ত্ব হয়ে দাঁড়ালো, তার ঔদার্য ও প্রসার লোপ পেয়ে দেখা দিলো সংকীর্ণ ছুৎমার্গ। ফলে যাঁরা পুরোহিত এবং যাঁরা অগ্রগতির বিরোধী, যাঁরা অপরকে তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীর গণ্ডীর বাইরে

রাখতে চান ধর্ম তাঁদের জন্য—জনসাধারণের পক্ষে তা আর সত্য রইলো না। এ অবস্থায় কাব্যও ধর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না—জড়িত থাকলে উর্দ্ধমূল অবাঙ্‌শাখ বৃক্ষের মতো তার মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে কাব্যের নজর পড়লো। ইউরোপে এই সময় ধনিকতন্ত্রের সূত্রপাত। প্রসার সবদিকে। সে সময় অবশ্য ড্রেকের ড্রাম ঘাড়ে সেক্‌স্‌পীয়রকে দেখতে পাওয়া যায় নি, যেমন রাজপুতানার চারণ কবিদের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যেতো, কিন্তু সে সময়ে সমাজে ও জীবনে নবজীবনের যে একটী আনন্দ দেখা যাচ্ছিলো সেটী যদি কাব্যে সাড়া না তোলে তা হলে কাব্যের প্রাণবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যে এরই নিদর্শন। কিন্তু দীর্ঘকাল সমৃদ্ধি মানুষের ধাতে সয় না, তাতে নৈতিক অবনতি আসা অনিবার্য। ইংলণ্ডের সমাজজীবনে যে অবনতি সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিলো তার পরিচয়ও সেকালের কাব্যে আছে। কাব্যে অলংকারবাহুল্য ও তির্যক্ ভঙ্গী এর অন্যতম চিহ্ন। এই অবনতির পথে প্রথম বিদ্রোহ তুলেছিলেন মিল্‌টন; তাঁর পিউরিটান মনোবৃত্তি শুধু নিছক ব্যক্তিমনের ব্যাপার নয়, তার পিছনে একরকম একটী সামাজিক ঘটনাপরম্পরার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সেই বিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। রাষ্ট্রে যেমন সমাজেও তেমন, ক্রমওয়েলী ব্যবস্থা ঘুচে আবার পুরোণো আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো। বরং এই পুনরাগমনের সময় অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে; ফলে কাব্যেও এই অবিশ্বাস এবং নিরানন্দতার ছায়া পড়েছে, ছন্দ বদলেছে,—এমন কি বিষয়-বস্তুও বিভিন্ন।

এই অবস্থা হতে উদ্ধারের চেষ্টা দেখা যায় রোমান্টিক যুগে। সামাজিক ভাবে তখন দুটী জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-বিপ্লব তখন ক্রম-পরিণতির দিকে। ফলে সমস্ত সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক আবহাওয়া পরিবর্তিত। অর্থনৈতিক প্রসারের সম্ভাবনা

পরিস্ফুট। এ পর্যন্ত যে শ্রেণীর অধিকার ভূগোলের হিসাবে স্বদেশে সীমাবদ্ধ ছিল, বা সীমাবদ্ধ না থাকলেও প্রধান ছিল, এখন সে সীমা আর রইলো না। এর ফলে কবিদের মানস-বিপর্যয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক প্রসারের পর যখন সাম্রাজ্যবাদের বনেদ দৃঢ় হলো সেই সময়ে ইংলণ্ডের সামাজিক হাওয়াও আবার পরিবর্তিত হলো। তারপর টেনিসন ও ব্রাউনিং যে সময় জন্মেছিলেন এবং ঐ ধরণের কবিতা লিখেছেন সে কথা আলোচনা করতে হলে টেনিসন বা ব্রাউনিংএর মানসিক গঠন আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়, তার সামাজিক পটভূমিকাও আলোচ্য।

এই যে সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের চেহারা-বদলের যোগ এ শুধু ইংরেজী সাহিত্যে তা নয়, অন্যান্য সাহিত্যেও অনায়াসলক্ষ্য। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব ও অপ্রাসঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রমাণ আছে। কিন্তু সমাজ ও সাহিত্যের যে সংযোগ স্বীকার করলে সাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা সম্ভব এবং প্রকৃত রস গ্রহণ সম্ভব সে সংযোগের গোড়ার কথাটাই এই যে কবি সমাজের দাস না হলেও সামাজিক জীব। সে হিসেবে এটী একটী তত্ত্ব, তার ছাপ সর্বসময়েই থাকবে, অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে তার রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু এই রকম সংযোগ বর্ণনার একটী বিপদ্ এই যে, সাহিত্য ও সমাজের সংযোগের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে যে গভীর স্তরে ঘাতপ্রতিঘাত চলে সেই গভীর স্তর পর্যন্ত পৌঁছনো প্রয়োজন। তা না হলে সমাজতত্ত্ব আর সাহিত্যে পার্থক্য থাকে না। আর, আরো একটী বিপদ্ এই যে প্রাচীন যুগে যাই হোক্, একালে বিভিন্ন দেশে সমাজ বিবর্তন এক ভঙ্গীর এবং একস্তরের নয়। আমরা এ যুগে যে ভাবমণ্ডলে বাস করি তার পিছনে নানা প্রকাণ্ড সামাজিক পরিবর্তন আছে। একালের ইংরেজী সাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যে বা অন্যান্য সাহিত্যে, এ যুগের ভাস্কর্য্যে, চিত্রে বা গানে যে পরিবর্তন দেখা

যায় সেটীর সামাজিক ইতিহাসও বিচিত্র। এ যুগের প্রধান কথাটা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। কি ভাবে তার ছায়া ওদেশে পড়লো তার আলোচনা হতে কথাটা পরিষ্কার হবে।

৩

গত মহাযুদ্ধের আগে জগতের মহাজন ছিলো প্রধানতঃ তিনটী দেশ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং কিছু পরিমাণে জার্মানি। গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানি দেন্‌দারে পর্যবসিত হলো; কিন্তু অন্যদিকে আমেরিকা এক নূতন মহাজন হয়ে দাঁড়ালো। এ যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি যে পরিমাণে ইংলণ্ডের নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলো তা আর থাকবে না। এ কথা নিশ্চিত যে ক্যানাডা অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পাওনাদার হয়ে উঠবে এবং অন্যান্য দেশগুলির ঋণভারও বহুপরিমাণে কমবে। এতে এদের আর্থিক উন্নতি বা অবনতি কি হতে পারে সে কথা মোটেই তুলছি না। এ প্রসঙ্গে আমার মোট বক্তব্য এই যে পুরোণো মহাজনদের কোনো কোনোটীর আর্থিক স্বচ্ছলতার দিন ঘনিয়ে এলো।

অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিচারে দেখা যায়, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক বিস্তার ঘটেছে। আমি স্বদেশে সমৃদ্ধি এবং শ্রেণীবৃদ্ধির কথা তুলছি না, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শেষ পর্যায়ে মূলধনের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য কি ভাবে স্বকীয় দেশের সীমা ছাড়িয়ে যায় তারই পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো—

বিদেশে নিযুক্ত ইংলণ্ডের মূলধন[৪]

	নিয়োজিত মূলধন (দশলক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে)
১৮২৫-৩০	১০০
১৮৪৩	১৫০

৪ *The Problem of International Investment* (Oxford University Press)

	নিয়োজিত মূলধন (দশলক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে)
১৮৫৪	২১০
১৮৮০	১৩০০
১৮৮৫	১৩০২
১৮৯৫	১৬০০
১৯০৫	২০২৫
১৯০৯	২৩৩২
১৯১৩	৩৭৬৩
১৯৩০	৩১৮৬

ঐ মূলধন হতে ইংলণ্ডের নীট্ আয়ের হিসাব এইরকম—

	গড়পড়তা বার্ষিক নিট আয় (দশ লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে)
১৮৭০-৪	৬১'০
১৮৭৫-৯	১'৭
১৮৮০-৪	২৩'৯
১৮৮৫-৯	৬১'১
১৮৯০-৪	৪৫'৬
১৮৯৫-৯	২৬'৮
১৯০০-৪	২১'৩
১৯০৫-৯	১০৯'৫
১৯১০-১৩	১৮৫'০

এর ভৌগলিক অবস্থান এই রকম—

	১৯১৩ শতকরা হিসাব	১৯৩০ শতকরা হিসাব
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	৪৭	৫৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২০	৫
লাটিন আমেরিকা	২০	২১
ইউরোপ	৬	৮
অন্যান্য	৭	৭
	১০০	১০০

ফরাসী দেশেও অনুরূপ অবস্থা, যদিও বিদেশে নিযুক্ত মূলধন ফরাসী দেশের হয়তো এতো বিস্তৃত নয়। তবুও ১৮৭০ সালে তার পরিমাণ ছিলো বারো হতে চৌদ্দ মিলিয়ার্ড (এক মিলিয়ার্ড একশো কোটী) ফ্রাঁ, ১৯১৪ সালে তার পরিমাণ ৪৫ মিলিয়ার্ড ফ্রাঁ। তা হতে ফ্রান্সের আয় হতো ১৮৭৬-৮০ সালে প্রতি বছরে গড়পড়তা ৫০ হতে ৬০ কোটী ফ্রাঁ; আর ১৯০৯-১৩ সালের বার্ষিক গড়পড়তা আয় দাঁড়ালো ১৭০·৫ কোটী হতে ১৮০·৫ কোটী ফ্রাঁ। ইউরোপ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতেই এই মূলধন খাটতো। তার মধ্যে রুশিয়া সর্বপ্রধান। প্রাক্-যুদ্ধ জার্মানির মহাজনীও কম ছিলো না, ১৯১৪ সালে তার পরিমাণ ছিলো ২২ হতে ২৫ মিলিয়ার্ড রাইখ্‌স্ মার্ক। সেই সঙ্গে আরও দেখা যায় এই যুগে এই দেশগুলির মোট জাতীয় আয়ও অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। কলিন ক্লার্ক সম্প্রতি যে হিসেব করেছেন[৫] তা হতে দেখা যায় ১৮৬০ সালে ইংলণ্ডের যে আয় ছিলো ৫২১, ১৯৩০ সালে সে আয় দাঁড়িয়েছে ১১০৭ এবং ১৯৩৭ সালে ১২৭৫। অর্থাৎ ১৮৬০ সালের তুলনায় শতকরা ১৪৫ ভাগ বৃদ্ধি। জার্মানিতে দেখা যায় ১৮৫৪ সাল হতে ১৯১৩ সালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১৪৫ ভাগ বেড়েছে। ফরাসীদেশে ১৮৫০-৫৯ সাল হতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত অনুরূপ বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১৪৪ ভাগ। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত হিসাবগুলি যদি বিশ্বাস হয় তাহলেও ১৮৬৭।৮ সাল হতে ১৯২৫।৯ সাল পর্যন্ত তার জাতীয় আয় শতকরা ৭৭ ভাগের বেশি বাড়ে নি। অবশ্য এ হিসেব ভারতবর্ষের পক্ষে নিঃসঙ্কোচে প্রজোয্য নয়।

এই তথ্যগুলি হতে কয়েকটী সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, গত শতকের শেষ ভাগে এ দেশগুলির অর্থনৈতিক

৫ Colin Clark : *Conditions of Economic Progress* (Macmillan) Ch IV.

প্রসার খুব বেশি। সমগ্র জাতীয় আয়ের দিক্ দিয়েও কথাটা সত্য, কিন্তু তা আরও বেশি প্রযোক্তব্য বিদেশে টাকা খাটানো সম্বন্ধে। ইংলণ্ডের জাতীয় আয় ঐ সময় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তার বিদেশে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ আরও বেড়েছে এবং ঐ মূলধন হতে নীট্ আয়ের পরিমাণও বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ওদেশের ধনিকেরা ও দেশের শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারে সন্তুষ্ট না হয়ে বিদেশের শোষণে মন দিলেন। মজার কথা, এই রকম শোষণে ও দেশে শ্রমিকেরাও আংশিক ভাবে লিপ্ত, অন্ততঃ এই বৈদেশিক শোষণ-ব্যাপারে ওদেশি ধনিকদের সঙ্গে ওদেশি শ্রমিকদের বিশেষ বিরোধ নেই। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দাম দিতে হয় নৈতিক অবনতির মধ্য দিয়ে। ফিনান্স-ক্যাপিটাল কথাটার অর্থই হচ্ছে মূলধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানবহিত, মানুষের সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা ছেড়ে শুধু টাকা খাটানোই (এবং সুদ পাওয়া) বড়ো কথা হয়ে ওঠে। যেন, উদ্দেশ্য ভুলে টেকনিকের মাহাত্ম্যেই আত্ম-বিস্মৃত হওয়া। মূলধনও একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছাড়া অন্য কিছু নয়, অন্ততঃ তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু পরিণামে দেখা যায় যন্ত্রীর চেয়ে যন্ত্রের মাহাত্ম্য বড়ো হয়ে ওঠে। এ রকম অবস্থা সুস্থ অবস্থা নয়। সেই কারণেই একবার যন্ত্রমাহাত্ম্য স্থাপিত হলে তার শেষ নেই—বিপ্লবেই তার পরিসমাপ্তি। পূর্বের হিসেব হতে দেখা যায়, যুদ্ধের পর যখন আমেরিকার মহাজনী কারবার বড়ো হয়ে উঠলো তার ফলে ইংলণ্ড বাধ্য হলো বহুদেশ হতে তার জাল গুটোতে। কিন্তু সে সঙ্কোচন সে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির উপর দিয়ে। ১৯১৩ সালে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে ইংলণ্ডের যে টাকা খাটতো সে টাকা তার মোট লগ্নী কারবারের শতকরা ৪৭ অংশ। ১৯৩০ সালে তা হয়ে দাঁড়ালো শতকরা ৫৯ অংশ। সুতরাং

আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গত শতকের আর্থিক প্রসার যে সময়ে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিলো, সেই সংঘর্ষের অবসানেও এই মহাজনেরা যন্ত্র-ধর্ম ত্যাগ দিতে পারেন নি। কেবলমাত্র যেখানে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব হলো না সেখান হতে পশ্চাদপসরণ করে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের দিকেই তাঁরা নজর দিলেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাস করলে বলতে হয় এ হচ্ছে সেই অবস্থা যে সময় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রায় অন্তিম প্রসার। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম লক্ষণই এই যে সে স্থিতিবান নয়, তার ভিত্তিকে সে অবিরত কার্যোপযোগী রাখবার চেষ্টায় তৎপর। মার্কসের কথায় the bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production and thereby the relation of production and with them the whole relations of society. এই ধরণের নিরন্তর বিপ্লবের ফলে যখন স্বার্থবোধ প্রখরতর হয়ে ওঠে, শেষ সম্বল আঁকড়ে থাকার প্রবৃত্তি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং শোষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুরোণো কাঠামো বজায় রেখে আর অন্তর্বিপ্লব সম্ভব নয়—এবার কাঠামোটাই বদলানো দরকার। ইংলণ্ডের শ্রমিক সম্প্রদায় এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে আর্থিক উন্নতি লাভ করেছিলো তার একটা কারণ অবশ্য জাতীয় ধনের পুনর্বণ্টন। নানা কারণে এই রকম পুনর্বণ্টন কিছু কিছু হয়েছে। তার মধ্যে গত মহাযুদ্ধের সময় ধনীদের উপর করভার চাপিয়ে অর্থসংগ্রহ এবং সেই অর্থ হতে সৈন্য ও শ্রমিক পোষণ একটা কারণ। কিন্তু এইটাই সবটা নয়। বৈদেশিক সমৃদ্ধি লুণ্ঠনে ইংরেজ শ্রমিক ওদেশী ধনিকের কতটা অংশীদার তা নিশ্চিত জানা যায় না, তবে সে অংশীদারিতা না থাকলে ইংলণ্ডে শ্রমিক বিপ্লবের সুগম হতো।

যুদ্ধের পর ইউরোপে ঠিক এই অবস্থাই দেখা দিয়েছিলো।

যে দেশে পুরোণো কাঠামো বজায় রেখে অন্তর্বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হলো না সে দেশ শ্রমিকবিপ্লবের পথে এগিয়ে গেলো, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনাও তার সহায়তা করেছিলো। এইজন্যই রুশবিপ্লবের ভঙ্গীটাই স্বতন্ত্র, তার গোড়ার কথাটাও স্বতন্ত্র। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে মুমূর্ষু চকিত হয়ে উঠলো, আসন্ন বিপদের শঙ্কায় যে কোনও উপায়ে সেই অন্তিম দিন ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা প্রাণপণ হয়ে উঠলো। কোনও কোনও ধনতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার আদর্শকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র তার কয়েকটী টেক্‌নিক্ গ্রহণ করতে চেয়েছিলো। এরই নামান্তর সমবায়ী ধনতন্ত্র বা Collective Economy। অর্থাৎ ব্যক্তিক শোষণ থাক্, তবে একটু ধীরে সুস্থে। শোষিতদেরও কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট দিয়ে শান্ত রাখতে পারলে অন্তিম দিন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও বন্ধ থাকতে পারে। এর প্রথম উৎসাহী ছিলো ইংলণ্ড। মজার কথা, যে সময় ইংলণ্ড এই সমবায়ের কথা প্রচার করেছে সে সময় তার ধনতন্ত্রের বিবর্তন ঠিকই হয়ে চলেছে, সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির উপর স্বার্থমুষ্টি কঠিনতরো করার চেষ্টা হয়েছে, দেশেও ধনতন্ত্র ঠিক বজায় আছে। ইংলণ্ডের পক্ষে এইরকম শান্তিবাণী আওড়ানো সম্ভব হয়েছিলা, কেননা শান্তির বাণী আওড়ালেও তার বিশাল সাম্রাজ্য ছিলো—আয়ের পথ যুদ্ধের ফলেও বিশেষ কমে নি, কোথায়ও কমলেও অপর জায়গায় বেড়েছিলো। কিন্তু যে সব দেশের এইরকম বিশাল সাম্রাজ্য নেই সে দেশকে খোলাখুলি ভাবেই আয় বাড়ানোর পথ দেখতে হলো, কোনোরকম লুকোচুরির অবকাশ রইলো না। ফ্যাসিবাদের মূল এইখানে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ঘটিয়া গেছে। এক সময় জিনিষই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে।…এতো বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এসিয়া ও আফ্রিকা। এখন মুস্কিল হইয়াছে

জার্মানির। তার ঘুম ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তাহার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।...য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মণ পণ্ডিত আজ যে তত্ত্ব প্রচার করিতেছে সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্ম্মণ পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।" ৬ ফ্যাসিবাদ বর্তমান সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্বেরই একটা প্রকাশ, তার রচিত সমন্বয় বুদ্ধিবৃত্তিতে নয়, বাহুবলে—মৌখিক শান্তিবাণীতে নয়, স্পষ্ট অত্যাচারে। এর পিছনে আছে গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট; তাই একবার প্রাণপণে শেষ চেষ্টা। এই কারণেই রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভাঙনের সুরু, বাহ্য শান্তির মিথ্যা আবরণ ভেঙে আসল কথাটা তীব্র তীক্ষ্ণ ভাবে, স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে, কেননা সংকটকালে আর কপটতার অবসর নেই। তাই এই বাহ্যসংহতি ভেঙে কেবল স্তরগুলিকে খুঁজে খুঁজে দেখার চেষ্টা। সেইজন্যে, নতুন যুগের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জার ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট্‌ বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।" এই চেষ্টার দ্বিবিধ রূপ। যাঁরা

৬ কালান্তর, ৪৫ পৃষ্ঠা

শুধু ভাঙার কাজ করেন তাঁরা শুধু তাতেই মশ্‌গুল। কিন্তু যাঁদের বোঝার ক্ষমতা বেশী কিন্তু এগোবার ক্ষমতা কম তাঁরা ক্রমশঃ অন্তর্মুখীন হন, সমাজের সঙ্গে কোনো যোগ রাখাই আর তাঁদের অভিপ্রেত নয়। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিহিত আছে সেটা সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গত মহাযুদ্ধেই প্রথম প্রবল হলেও শিল্পে তা ধরা পড়েছিলো বহু পূর্বে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ যতো তীব্র হয়ে ওঠে, কবিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ ততো আত্মমুখীন হয়ে ওঠেন। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামে নতুন পরীক্ষা স্থরু হয়, কিন্তু সে পরীক্ষার পরিণতি সুস্থ সমাজবোধে নয়, আরও আত্ম-কেন্দ্রিকতায়, 'Pure' আর্টে। পূর্বে ইম্‌প্রেসনিষ্ট চিত্রকলার মূলে কি ভাবে এই কারণগুলি ছিলো তার উল্লেখ করছি। তার মধ্যে প্রথম কথা ছিলো স্তর-ভাঙা, বহিরাবরণ ভেঙে ভেতরটাকে বিশ্লেষণ করে দেখা। অবশ্য কালে তার নানা আঙ্গিক দেখা গিয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার Pure আর্ট অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক আর্টে পর্যবসিত হবার কারণ কি ? সে কারণ ঐ সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেই নিহিত।

While a naturalistic art is the result of a happy pantheistic relation between man and the outside world, the tendency to abstraction, on the contrary, occurs in races whose attitude to the outside world is the exact contrary of this. This feeling of separation naturally takes different forms at different levels of culture. (T. E. Hulme : *Speculations*)

এর চরম অভিব্যক্তি স্যুর্‌রিয়ালিষ্ট চিত্রকলায় এবং ব্যক্তিক উপকরণে ভারাক্রান্ত কবিতায়। যে সময় কবি বাইরের সকল সংযোগ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান সেসময় বুঝতে হবে সমাজের সংঘর্ষ চরমে উঠেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা কবিধর্মের পরিপন্থী।

সেই সময়েই কবির ভাব-রূপ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উপকরণে ভারাক্রান্ত। বর্তমান আর্ট বা কবিতা কেবলমাত্র দীক্ষিতের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য নয়, আর্ট ও কবিতার সাম্প্রতিক দুরূহতার পিছনে এইরকম একটী মনোবৃত্তি উঁকি মারে। বর্তমান আর্টের অন্যতম অবদান য়্যাবস্‌ট্রাক্ট পোর্ট্রেট। চিত্রিতব্য বিষয় চিত্রকরের মনে যে ভাবতরঙ্গ জাগায় য়্যাবস্ট্রাক্ট পোর্ট্রেট সেই ভাবতরঙ্গের প্রতীকী প্রতিচ্ছবি। কোনও সঙ্গীতজ্ঞের পোর্ট্রেট হয়ে দাঁড়ালো কয়েকটী রঙের তরঙ্গের মধ্যে কয়েকটী রেখা ও বৃত্ত। আর্টের সাধারণতঃ দুটী ধর্ম। একটী, বর্ণনা অপরটী, ব্যঞ্জনা। এই ধরণের আর্টে প্রথম ধর্মটী সম্পুর্ণ বিলুপ্ত। দ্বিতীয় ধর্মেরও সামাজিক দিকটী বিলুপ্ত, শুধু ব্যক্তিগত দিকটারই প্রাধান্য। এর গোড়ার কথাটা হচ্ছে, কবি বলেন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমনের ঠোকাঠুকিতে যে কাব্যদীপ্তি চমকে ওঠে সে কাব্যদীপ্তিই আমার কাব্যজীবিত নয়, আমি যা দেখি বা অনুভব করি সেইটেই কাব্যের বিষয়, সেইটীই পাঠকদের গ্রহণ করতে হবে। ফলে দেখা যায় Skill-fetishism, বা commodity-fetishism, যাকে কডওয়েল বলেছেন art for my sake. এযুগের কাব্যেরও তাই দুটী বড়ো লক্ষণ। প্রথমতঃ দেখা যায় এলোমেলো ভাবে মানসিক স্তর সাজানো আছে, মনস্তাত্বিকের কৃপায় সে কাজ এখন সহজতর। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় শুধু ব্যক্তিগত উপকরণ। যেন ক্রমে ক্রমে কবির পাঠকসমাজ সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে আসে, কিছুকাল পরে কাব্যে পাঠকসমাজের আর কোনও অধিকার থাকে না। এর প্রথমটার উদাহরণ পাওয়া যায় সেই সব কবিতাগুলিতে যার মধ্যে 'সিনেমা-পদ্ধতি' 'নাটকীয় ভাব,' ও এলোমেলো ছন্দের প্রাধান্য। দ্বিতীয়টার উদাহরণ স্বরূপ এলিয়টের Waste Landএর শেষের কটী পংক্তি উল্লেখ করা চলতে পারে। সে কটী পংক্তির রসাস্বাদ করতে হলে কাব্য, সমাজতত্ব, মানববিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং নানা বই-এর সঙ্গে পরিচয় থাকাও

দরকার। হয়তো অন্য কবির পক্ষে এযুগের মনের কথা অন্যভাবে প্রকাশ করা চলতো। কিন্তু যে কবির মন এই দুরূহতার সংকীর্ণ পথ ছাড়া অন্য পথে অগ্রসর হতে পারে না স্পষ্টতঃই তাঁরা সাধারণ পাঠকসমাজের জন্য কাব্যরচনা করছেন না; যদি তাঁদের মতো সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ পাঠক জুটলো তবেই কাব্যপাঠ সম্ভব হলো, তা না হলে ঐ কবিতা কেবল কবিরই অভিজ্ঞতার লিখিত প্রমাণ হয়ে রইলো—সে শিলালিপির পাঠোদ্ধার সহজে সম্ভব নয়। এই কবিদের নতুন যুগের কবি বলে ভুল করার সম্ভাবনা আছে, কেননা আমরা এপর্যন্ত শিল্পের যে রীতিতে অভ্যস্ত ছিলাম এঁদের রীতি তার বিপরীত। পূর্বের যুগের তুলনায় এঁদের কয়েকটা বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ গদ্য ছন্দ, অন্ততঃ পূর্ব-পরিচিত ছন্দের বর্জন। দ্বিতীয়তঃ, উচ্ছ্বাস-বর্জন এবং রোমান্টিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা। তৃতীয়তঃ নানা নতুন বিষয় আমদানি, যাকে ব্যঙ্গ করে বলা চলে বস্তি-সাহিত্য। চতুর্থতঃ, কাব্যের মধ্যে সমাজ-বোধের সাড়ম্বর ঘোষণা। আরও দেখা যায় কাব্য প্রায়ই কবির ব্যক্তিত্ব-প্রধান, 'আমি' বড়ো হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে ব্যঙ্গ এবং অবিশ্বাস, চটুলতা এবং তির্যক্ ভঙ্গী। সংক্ষিপ্তি বেশী। বহুসময়ে অর্থ বোঝাই দুরূহ। আর সেইসঙ্গে থাকে ভিক্‌টোরীয় যুগের শালীনতা-বোধকে উপহাস। এগুলির পিছনে আছে মানসিক পরিবর্তন এবং ঐ মানসিক পরিবর্তনের পিছনে আছে ঐ সামাজিক হাওয়া-বদল। এগুলি নতুন নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকৃত নতুন নয়। গোড়ার কথাটা এখনও বদলায় নি। সেইজন্য সুস্থ কাব্যও দেখা দেয় নি। এই কারণেই এত ছট্‌ফটানি, এত বক্রতা, এতো স্তর-ভাঙার চেষ্টা, এতো মনোবিকলন। এ সমস্ত উক্তিই বিরোধমুখে। রোগীর অসুস্থতা চরমে পৌঁছলেই সে গুরুপাক খাবার দাবী জানায়, তাতে মশলা-প্রাচুর্যও চাই। কিন্তু রোগ সারার মুখে তার লঘুপাক খাদ্যই যথেষ্ট, পুষ্টিকরও, নাই বা থাকলো মশলা। এক হিসেবে এই নানা ধরণের পরীক্ষা ঐ অস্বাস্থ্যকর খাবারকে মশলার জোরে

সুস্বাদু করার চেষ্টার মতো। কাব্য তাই দুষ্পাচ্য হয়ে উঠছে, এর পর সুস্থ এবং সাধারণ (প্রাকৃত এবং সংস্কৃত অর্থে) কাব্য চাই। সেই কারণে এঁরা নতুন কবি, কিন্তু প্রকৃত নতুনত্বের, অর্থাৎ নতুন আঙ্গিক ছাড়া নতুন কথার অন্বয়মুখে প্রকাশ, এঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। যে হাওয়ায় ধনতন্ত্রের অবক্ষয় হতে বাঁচবার জন্য শ্রমিকবিপ্লবের বদলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়, সেই হাওয়াতেই এরা জন্মায়, যদিও ঝোঁকটা আলাদা। এঁদের বক্তব্য এই যে মূল কথাটা বদলাবো না, শুধু টেকনিকের কৌশলে তাকে দাঁড় করাবো। অবশ্য এই আঙ্গিকের আবিষ্কারে নতুন কাব্য গড়বার পথ সুগম হতে পারে, সে হিসেবে তাদের মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু সেইগুলিতেই নতুন কাব্য গড়ে উঠেছে মনে করা ভুল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে অর্থনৈতিক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় সে অস্ত্রগুলি মধ্যযুগ হতে আহরিত নয়, বুর্জোয়া সমাজেই উদ্ভূত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেই অস্ত্রগুলিই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। ধনিক সভ্যতার ট্রাজিডিই এই যে তার নিজের মৃত্যুবাণ নিজের রচনা। কিন্তু এই কারণে ধনিক সভ্যতার শেষ অবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক যুগের উদয় বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই। তেমনি এ যুগে কাব্যে যে নতুন অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি নতুন কাব্যের কাজে লাগবে, কিন্তু তারাই নতুন কাব্য গড়তে পারে না, তার জন্যে আলাদা সামাজিক পরিবেশ ও আলাদা মেজাজ দরকার। বাংলা সাম্প্রতিক কাব্য হতে একটী ছোটো উদাহরণ দিচ্ছি। কোথায় যেন পড়েছিলুম,

লাল মেঘ আকাশেতে ঘোরাফেরা করে।

লাইনটী মনে পড়লেই হাসি পায়। সমাজবোধের উদাহরণ দিতে হলে মেঘও লাল হয়ে ওঠে. কালো মেঘ বলার উপায় নেই! এমন কি,

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হাস্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পা'ক।

হ্যাঙ্কাও, রাইফেল ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও একে ভালো কাব্য বলবো কারণ এর মধ্যে কবিপ্রতিভার ছাপ আছে। আরও একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে—

ও ফিরি করে কাপড়
আমি দুপুরে উপন্যাস হাতে
পাখার তলায় শুয়ে থাকি
আর ওর বুক-ফাটা ক্লান্ত ডাক শুনি।

যদি শ্রেণিসংগ্রামই কাব্যের বিষয়বস্তু হয় বা কাব্যের বৈশিষ্ট্যের কারণ হয়, তা হলে সে শ্রেণিসংগ্রাম কি শেষের কবিতাটীতে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে নি, যদিও তাতে লাল মেঘ বা কাস্তে হাতুড়ির কোনও সন্ধানই নেই? লাল মেঘের কাব্য হচ্ছে skill fetishismএর কাব্য, আঙ্গিকের জোরেই কাব্যকে দাঁড় করানোর চেষ্টা। আর শেষের কবিতাটী হচ্ছে সত্যিকারের নবযুগের কাব্য, যে কাব্যের নির্ভর সমাজের সঙ্গে কবিমনের ঘাত প্রতিঘাতে। এ কাব্যের পক্ষে কবিমনই যথেষ্ট, আঙ্গিক তার অনুযায়ী, কিন্তু আঙ্গিকই সর্বপ্রধান কথা নয়। কিন্তু কবিমন মানে art for my sake নয়, সমাজ-সচেতন কবিমন। কোন্‌টী প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ আছে কি?

8

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে সময় আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি, বা যে কারণে আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি, সে সময় ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রেরও যে একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী দেখা দেয় সেটী কেবল আকস্মিক নয়, দুয়ের কারণগত সাম্যও আছে। উদগ্র সমাজবাদীরা বলবেন, এই হতে প্রমাণ হয় কাব্য নিছক সামাজিক, সামাজিক বিবর্তনেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক বিবর্তনে তার গতি

অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু পূর্বে দেখবার চেষ্টা করেছি সে নিয়ন্ত্রণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নয়, তার মধ্যেও একটু রহস্য আছে। যেমন এইখানে প্রশ্ন ওঠে, সমাজে যে বিপ্লব গত মহাযুদ্ধের পর দেখা গেলো, তার মূলীভূত কারণগুলি সাহিত্যে কি কারণে তার পূর্বেই যুগান্তর এনেছিলো এবং চিত্রকলায় আরও পূর্বে পরিবর্তন এনেছিলো এবং এই কালবৈষম্য কি করে সম্ভব হলো। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রে সংযোগ থাকলেও সে সংযোগের মধ্যেও বিপ্রয়োগ আছে, শুধু সংযোগ থাকলে কাব্যের প্রয়োজন হয় না প্রচারপত্রিকাই যথেষ্ট, শুধু বিপ্রয়োগ থাকলেও কাব্য অদৃশ্য হবে, কিন্তু সংযোগের মধ্যে বিপ্রয়োগের লীলাতেই সুস্থ ও সার্থক কাব্য জন্মগ্রহণ করে।

উপরে আধুনিক যুগের মনের যে আলোচনা করেছি তা হতে ঐ বিপ্রয়োগের বিচারসাপেক্ষে সম্ভবতঃ এইটুকু স্বীকার করা চল্‌তে পারে যে দুয়ে সংযোগ গভীর এবং দৃঢ়। "সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একা কাজ করেন," কিন্তু তাঁর একটা রচনাশালা থাকা চাই। এই রচনাশালা সমাজ,—কবি তাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন আবার তাকে নতুন চেহারা দেবার চেষ্টাও করেন। প্রাচীন যুগের ভাবরূপের মধ্যে এই সম্বন্ধ স্পষ্ট ও দৃঢ়, তার মধ্যে তির্যক ভঙ্গীর অবকাশ কম। কিন্তু এ যুগে সে সহজতা সম্ভব নয়। তাই তার নানা সম্বন্ধবৈচিত্র্য। তবুও এই সম্বন্ধবৈচিত্র্যের মধ্যেও এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে যে বর্তমান পরিবেশ কাব্যের বা শিল্পের অনুকূল নয়। কবির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ অন্বয়মুখীন নয়, বিরোধমুখীন। ফলে তাঁর ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটেছে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও তাঁর যোগ নেই, কারণ একদিকে যেমন মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে তিনি পাঠকসমাজের সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগই রাখেন না তেমনই তাঁর কাব্যও ব্যক্তিগত উপকরণে ভারাক্রান্ত, তার মধ্যে সাধারণ পাঠকসমাজকে অস্বীকার করার চেষ্টা স্পষ্ট। সমাজের গণ্ডী সংকীর্ণ হওয়ার ফলেই এই দুরবস্থা। এ অবস্থা শুধু যে সামাজিক অমঙ্গলের কারণ তাই নয়, শিল্পেরও অবনতির

কারণ। সাহিত্যের বুৎপত্তিগত অর্থ যদি পাঠক ও কবির নৈকট্য, তা হলে সাহিত্যকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজন গণ্ডী ভাঙার। যে সমাজে পাঠক-সাধারণের সংস্কৃতির সঞ্চয় যথেষ্ট, তা কেবল মুষ্টিমেয়ের বিশেষ অধিকার নয়, সে যুগে শুধু যে কবির পাঠকসমাজই বৃহত্তর তাই নয়, কবিধর্মপালনেরও সুযোগ বেশী। প্রাণধারা অবরোধে খিন্ন নয়, উদার আলো হাওয়ার সংস্পর্শে পুষ্ট। যাঁরা মনে করেন বস্তি সাহিত্যই প্রলেটারিয়ান্ সাহিত্য তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধ। বস্তি সাহিত্য হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শেষের যুগের চিহ্ন, যে যুগে জনকয়েক চিন্তাশীল ব্যক্তি শুধু তাঁদের চিত্তবৃত্তিতে প্রলেটারিয়াট্ সমাজের পটভূমিকা বুঝেছেন এবং তাকে শিল্পের ক্ষেত্রে আনবার চেষ্টা করেছেন। এই বুদ্ধিজীবীরা, মার্কসের ভাষায়, have raised themselves to the level of comprehending theoretically the historical movements as a whole, কিন্তু তবুও theoretically, কেননা এঁরা a portion of bourgeois ideologists মাত্র। এঁদের সাধুবাদ দেওয়া চলতে পারে কেননা ধনিকসমাজ যে অপ্রিয় সত্যগুলি স্বীকার করতে রাজি নয় এবং ফলে হয় কাব্যের বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট করে সেগুলিকে চাপা দেবার চেষ্টা করে, নয় স্পষ্টতঃই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায় এঁরা সাহিত্যে সেই অপ্রিয় সত্যগুলির প্রচার করেন। এঁরা সে হিসেবে ভবিষ্যৎ যুগের কবি ন'ন। এঁদের বক্তৃতার আসনটা মাত্র একটু পৃথক্। সে হিসেবে তাঁরা নিঃশ্রেণীক সমাজের প্রতিভূ ন'ন, চরম শ্রেণিবদ্ধ সমাজের ফল। বর্তমান জগতের মোটামুটি এই অবস্থা। কিন্তু এ অবস্থা স্বাস্থ্যকর নয়। যদি এ অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে হয় তা হলে এমন একটী সামাজিক অবস্থার প্রয়োজন যেখানে কাব্যরচনার পিছনে কোনও শ্রেণীরই স্বপক্ষে কি বিপক্ষে অদৃশ্য বাহ্বাস্ফোট থাকবে না, যেখানে কাব্য কোনও কারণেই স্বধর্মচ্যুত হবে না, যেখানে কাব্যের স্বাধর্ম্যপালন অব্যাহত। বলা বাহুল্য,

নিঃশ্রেণীক সমাজ ছাড়া এই স্বাস্থ্য সম্ভব নয়। এতে বস্তিসাহিত্যের কাব্যিক ও সামাজিক প্রয়োজন ঘুচে গিয়ে সহজ সাহিত্য দেখা দেবে, কারণ একালের নিঃশ্রেণীক সমাজ মানে আদিম অবিজ্ঞান নয়। এক হিসেবে এ একটী পরিপূর্ণ চক্র। আদিম মানুষ তার সহজাত বৃত্তি নিয়ে যে দীর্ঘ যাত্রা সুরু করেছিলো নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কম্বুরেখায় সে তার যাত্রারম্ভের ঠিক উপর ধাপে পৌঁছলো। তাই আপাত সাদৃশ্যের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য —কিন্তু তার স্বাধর্ম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো এই নবযুগের নব বৈজ্ঞানিক মানবতার মধ্য দিয়ে। সেইজন্যে সাহিত্য সার্থক হতে হলে নিঃশ্রেণীক সমাজের প্রয়োজন, কিন্তু সাহিত্যের জন্যই সেটা প্রয়োজন। তা না হলে নানা নতুন আঙ্গিকের সন্ধান মিলতে পারে, কিন্তু নতুন কাব্যের সন্ধান মিলবে না।

সাম্যবাদের গোড়ার কথাটা এই যে সেটী কোনো আদর্শ নয়, সেটী সমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি। বর্তমানে দেশে দেশে সমাজ-বিবর্তনের যে ধারা দেখা যাচ্ছে তাতে শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সর্ব্বত্র সমান না হলেও তার বিবর্তনের চালটা কমবেশী এক। কোনো দেশ এই বিবর্তনের ধারায় কিছু অগ্রসর, কোনো দেশে বা কোনো বিশেষ ঘটনাবলীর ফলে বিবর্তনের ধারা কিছু পরিবর্তিত। জগৎ-জোড়া শ্রমিক বিপ্লব আসন্ন এমন কথা ভাবা আমার মতে আজকের দিনেও infantilism—এ যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদ যাবে না কিন্তু তার কেন্দ্র পরিবর্তিত হবে বলে আমার ধারণা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য দেশগুলি হাত ছাড়া হবে, সুতরাং ভারতবর্ষই একমাত্র জমিদারী। এ যুদ্ধে প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে ইংরেজ আমেরিকা স্পষ্ট কোনও কথা বলেন না, প্যাসিফিক্ চার্টার হয় না তার মূলে এই কারণ। এ যুদ্ধে যদি পশ্চিমের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়—অবশ্য এ আশাও সম্ভবতঃ দুরাশা—পূর্বের সমস্যা সামলাতে আর একটা যুদ্ধও লাগতে পারে। আমেরিকার মহাজনীর ব্যবসাও দ্বিতীয় যুদ্ধে পাকা হলো, মহাজনদের

ব্যবসা স্থায়ী হলেই তারা জমিদারী কেনে। কুলীন দেনদারে তৃপ্তি নেই, এবার এদিকে নজর পড়বে না কি ? কিন্তু সে কথা যাক্। এ যুগের মোট কথাটা হচ্ছে, ধীরে সুস্থে এগোবার দিন নেই, ভূমিকম্পে ভিত পর্যন্ত টলেছে। সাজানো বাগান শেকড় উপড়ে তছনছ হোলো। এরপর নতুন বাগান জমবে কি না সেইটেই আসল প্রশ্ন, যদিও শেকড় ওপড়ানোটাই এখনও অনেকসময় বড়ো। বিভিন্ন দেশের মোটামুটি একই দিকে গতি না হলে অদ্বৈত ব্যাখ্যা অচল। বর্তমানে সে রকম গতিসাম্য আগের চেয়ে বেশি। এইজন্যই সমাজ ও শিল্পের স্বাস্থ্যের জন্য নিঃশ্রেণীক সমাজের প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু সাম্যবাদ কোনও আদর্শ নয় এবং যেহেতু সাহিত্য প্রচারপত্র নয়, এই মূল সমস্যা ও তার প্রকাশভঙ্গীটাও সমালোচকের বিবেচ্য। ব্যাপারটা কি ঘটলো, তার সঙ্গে ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটলো, সাহিত্যে এ দুটি আলোচনারই সমান স্থান, এবং এ দুটার পাশাপাশি স্থান নয়, জড়িয়ে যাওয়া অবস্থা।

সমাজতন্ত্র, ভাবতন্ত্র, রূপতন্ত্র—বিপ্রয়োগ

তা হলে দেখা যাচ্ছে আমরা এপর্যন্ত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি

প্রথম, সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ বিচিত্র এবং ঐতিহাসিক। শিল্পেরও তাই। দ্বিতীয়, সমাজ যে পথে বিবর্তিত হচ্ছে তাতে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ক্রমশঃই সংকটের দিকে অগ্রসর। এ সময় মহৎ সাহিত্যের অভ্যুদয় সম্ভব নয়। মহৎ শিল্পেরও একই অবস্থা।

তৃতীয়, বর্তমানে সমাজবিবর্তনের যে নানা বৈশিষ্ট্য নানা জায়গায় দেখা যায় তার ফলে ভাবের রূপায়নের পার্থক্য ঘটলেও তার গতি প্রধানতঃ এক দিকে—সে হিসেবে তাদের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য, অন্ততঃ প্রেরণাগত সাদৃশ্য, মেলে। যদি ভাঙনই একালের সমাজ বিবর্তনের প্রধান কথা, শিল্পে নতুন চেহারার চেয়ে নতুন আঙ্গিকের সন্ধানই বেশি মিলবে। অর্থাৎ সমাজ বা শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই যন্ত্রীর চেয়ে যন্ত্র প্রধানতর।

চতুর্থ, ভাবের বিভিন্ন রূপায়ন সব সময় এক নয়। তার দুটী কারণ—একটী সমাজগত, অপরটী রূপায়নের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে সেখানে বিশেষ অবস্থা বিশেষ মেজাজ বিশেষ ভঙ্গীর উদয় হয়। সার্বজনীন নিয়মের মূল কাঠামোর মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়ে পড়ে। অপর কারণটী ভাবের বাহনের মধ্যে নিহিত। শিল্পীমনে যে একটী ভাবের উদয় হলো, চিত্রে, কাব্যে বা স্থাপত্যে, সঙ্গীতে বা নাটকে তার প্রকাশ একভাবে হয় না কারণ এগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। ইদানীন্তন শিল্পকর্ম আলোচনা করলে এই কথাগুলি স্পষ্ট হবে।

ইতিপূর্বে প্রথম তিনটী সিদ্ধান্তের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থটী উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু চতুর্থটীরও কিছু আলোচনা

না করলে তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ হবে না এবং তত্ত্ব সম্পূর্ণ জানা না থাকলে তা তথ্য বিচারের কাজেও লাগবে না। সুতরাং ভাবের বিভিন্ন বাহনের বিভিন্ন চালের কথা আলোচ্য। তথ্য তারপরে।

রসগ্রহণের দুটী প্রধান বাহ্য ইন্দ্রিয়, চক্ষু এবং কর্ণ। কাব্য, গান, উপন্যাস ও গল্প শব্দগ্রাহ্য। ছবি, মূর্তি এবং স্থাপত্য চক্ষুগ্রাহ্য। নাটকের আবেদন উভয়তঃই।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে শব্দের মহিমা যথেষ্ট। রসগঙ্গাধরে কাব্যের সংজ্ঞা হচ্ছে রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দ। শব্দ কথাটীর ব্যবহার সম্বন্ধে টীকাকার নাগেশভট্ট বলেছেন, "কটাক্ষাদি-নিবারণায় শব্দ ইতি।", কটাক্ষ বা অঙ্গভঙ্গীতে কোনও রস ব্যঞ্জিত হলে সেটী কাব্যরস হবে না, তার জন্য শব্দ থাকা চাই-ই। এ কথা বলা দুঃসাহসের পরিচয়। এ মতবাদ অক্ষরে অক্ষরে মানতে হলে অভিনয়ের রসই উড়ে যায়, নাটকও পঠিতব্য ছাড়া দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য থাকে না। এর ইঙ্গিত হচ্ছে কাব্য সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত নির্যাস, অন্ততঃ সেটী যে পাঠক ও কবির প্রত্যক্ষ ভাববিনিময় তা এই সংজ্ঞাকারের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচারে জগন্নাথের উক্তি আকস্মিক বলে মনে করা চলে না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে কাব্যরসের উল্লেখই নেই, তাতে শুধু নাট্যরস হিসেবেই রসের কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদের পিছনেও একটী ইতিহাস আছে। সেকালে নাট্যের অন্ততঃ তিনটী সম্প্রদায় ছিলো[১] —(১) নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় (২) ভরত সম্প্রদায় (৩) কোহলমতঙ্গ সম্প্রদায়। ভরত কেবল আঙ্গিক অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁর

১। অশোকনাথ শাস্ত্রী: অভিনয় দর্পণ।

মতে রস শব্দোদ্ভূত-ও, তার জন্য বিভাব-অনুভাব ইত্যাদির প্রয়োজন ; কিন্তু নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় সম্ভবতঃ প্রাচীনতর সম্প্রদায়, তাঁদের মত আঙ্গিক অভিনয়ের বিরোধী নয়। তৃতীয় সম্প্রদায়ে দুয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা ছিলো। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মতবিরোধ যাই হোক্, প্রশ্ন ওঠে শব্দের গুরুত্ব নিয়ে। কাব্যে শব্দের গুরুত্ব যাই থাক, শব্দই যে রস প্রকাশের একমাত্র বাহন এমন কথা বলা চলে না। সাহিত্যদর্পণকারের মতে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য দুয়েরই স্থান সমান। মালার্মে তাঁর চিত্রকর বন্ধুকে বলেছিলেন কাব্য লেখা হয় শব্দের দ্বারা, আইডিয়ার সাহায্যে নয়। এ আর একটা চরম উক্তি, কারণ শব্দ আইডিয়ারও সম্বল। অপর দিকে পাওয়া যায় ক্রোচের মতবাদ। তিনি বলেন To intuite is to express ; and nothing less (nothing more, but nothing less) than express. এই কারণেই তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, Intuitive activity possesses intuitions to the extent that it expresses them. কিন্তু Intutition এবং Expression নামান্তর এ কথা বলার একটা বড়ো বিপদ আছে। ঐরকম পরিকল্পনার ফলে সহজ অনুভূতির উপরই ঝোঁক পড়ে বেশি, এমন কি তার প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকৃত হয়, অনুভূতিই প্রধান কথা হয়ে দাঁড়ায়। ক্রোচে বলছেন People believe that any one could have imagined a Madonna of Raphael, but that Raphael was Raphael owing to his technical ability in putting the Madonna upon canvas. Nothing can be more false than this view. যে কেউ ম্যাডোনার পরিকল্পনা করতে পারতেন এমন কথা নিশ্চয়ই স্বাকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু শুধু পরিকল্পনাই যে আর্ট এ কথাও গ্রহণ করা কঠিন।

এই মতবিরোধের মূল বাস্তবিক দুটা সমস্যার মধ্যে। কবি-মনের সঙ্গে বাহ্য জগতের সম্পর্ক কি, সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার

ফলে এরকম তর্ক ওঠা স্বাভাবিক। কবির মনে যে ভাবতরঙ্গ জাগে তাকে পুনরায় সমাজে সঞ্চারিত করা আর্টের ধর্ম। সে কারণে কবিকর্মের মধ্যে অনুভূতি এবং অনুভূতি-বিস্তার এ দুটীরই প্রয়োজন। সে হিসেবে তার একটা সামাজিক রূপ অনস্বীকার্য। কবিমনের সঙ্গে সমাজের যদি একটা সুস্থ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় তা হলে অনুভূতি বড়ো কি প্রকাশভঙ্গীই বড়ো এ তর্ক অবান্তর। কবিকর্মের সমগ্রতার মধ্যে দুটাই ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত, ও দুটী independent variable নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে রসে আঙ্গিকের গুরুত্ব নিয়ে। প্রকাশের প্রয়োজন স্বীকার করলেও সেই প্রকাশের বাহন কি, সেই বাহন অনুসারে রস বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয় কি না, এ প্রশ্ন হতেই ভরত-নন্দিকেশ্বরের মতবিরোধ। কিন্তু এখানেও মতবিরোধের প্রকৃত কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলবার চেস্টা করেছি কবিমন কি ভঙ্গীতে সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ কবিধর্ম কি। সেই সঙ্গে আর একটী প্রশ্ন জাগে, সমাজের সঙ্গে ঐভাবে সংযুক্ত হবার ফলে কবিমনে যে কবিতা জাগে সেটীর বাহ্য প্রতিরূপ কি উপায়ে সম্ভব? অর্থাৎ কবিকর্ম কি। ব্যক্তিমনের বৈশিষ্ট্য সত্বেও যেমন নানা কবির মধ্যে একটী সাধারণ সামাজিক ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন আঙ্গিকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সত্বেও তাদের মধ্যে একটী সাধারণ কবিকর্ম আছে কেননা তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য কবিমনের অনুভূতিকে প্রকাশ করা। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের মতে এই প্রকাশ ক্রিয়াটী অলৌকিক, রস প্রকাশিত হলে আঙ্গিকের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। যদি রসোদ্বোধের পরও আঙ্গিকের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করতে হয় তা হলে কার্যজ্ঞান এবং কারণজ্ঞান দুটীরই যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কার্যজ্ঞান ও কারণজ্ঞানের একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। এইজন্যে তাঁরা বলেছেন আঙ্গিক রসবোধের কারণ নয়, আঙ্গিকের সাহায্যে রস নিষ্পন্ন হয় মাত্র। "তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ"

—ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি[২]। এই কারণে যাঁরা ভালো কবি তাঁদের মধ্যে আঙ্গিকের দিকে স্বতন্ত্র নজর দেবার প্রয়োজন হয় না, "কেন না যদিও বিশ্লেষণ বুদ্ধির কাছে তাঁদের রচনাভঙ্গী ও অলঙ্কার প্রয়োগের কৌশলনিরূপণ দুর্ঘট ও বিস্ময়াবহ, কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির রস-সমাহিত চিত্ত থেকে তারা ভিড় করে ঠেলাঠেলি বেরিয়ে আসে।" "অলংকারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি।" লক্ষ্য করার বিষয়, এই থিওরিতে সংস্কৃত আলংকারিকেরা আসল কথাটা বলি বলি করেও বল্‌লেন না, মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। আঙ্গিকের সাহায্যে অলৌকিকত্ব সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই অলৌকিকত্বের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। অলৌকিক কথাটার অর্থ এখানে নেতিবাচক, তার অর্থ এমন কিছু যা লৌকিক নয়। অর্থাৎ সেটা দৈব এমন কোনও কথা নেই, বরং লৌকিকের মতো হয়েও লৌকিক নয়। পূর্বে বলেছি, কি চিত্র, কি গানে, কি কাব্যে বাহ্যজগতের প্রতিরূপ থাকলেও অন্ততঃ শ্রেণিবদ্ধ সমাজে তার মধ্যে একটা poetic idealisation বা heightening থাকে যার ফলে কাব্যের জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের আপাতসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য সুস্পষ্ট। আমরা যে কাব্যরস অনুভব করি সে ঐ heightening এর ফলে। এই কারণেই রসাস্বাদের সময় আঙ্গিকের কোনও স্থান নেই সত্য, কেননা একবার মায়ার জগৎ সৃষ্ট হলে সেখানে আঙ্গিক অনেকটা অবান্তর, কিন্তু ঐ মায়ার জগৎ

২। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসাতে (২য় সংস্করণ, ৫০ পৃঃ) এই বৃত্তি উদ্ধার করে লিখেছেন "অর্থাৎ রসবাদী আলংকারিকেরা হচ্ছেন কাব্যমীমাংসায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। চেতনাচেতন এই জগৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নয়, কিন্তু তা থেকে ভিন্নও নয়। কাব্যের এই সব অঙ্গ কাব্যের আত্মারস নয়, কিন্তু রস থেকে ভিন্নও নয়।" এই ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ একটা আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক কেননা ও দুয়ের সম্বন্ধ বোঝাতে অদ্বৈততত্ত্বই যথেষ্ট, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের দরকার নেই।

রচনা আঙ্গিক ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং তুলি, রং বা শব্দ, অভিনয় বা সংগীত—এগুলির সাধারণ ধর্ম একটী অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করা, যেটী বাহ্য জগতের মতো হয়েও বাহ্যজগতের মতো নয়। স্পেঙ্‌লার তাঁর মিষ্টিক দৃষ্টিতে কথাটী এইভাবে চেয়েছিলেন ৩—

The clearest type of symbolic expression that the world-feeling of higher mankind has found for itself is (if we except the mathematical-scientific domain of presentation and the symbolism of its basic ideas) that of the arts of form. *And with these arts we count music* in its many and very dissimilar kinds···For the formative impulse that is at work in the *wordless* arts can never be understood until we come to regard the distinction between optical and acoustic means as only a superficial one. To talk of the art of the eye and the art of the ear takes us no further···Music, sight, hearing *equally* are bridges into the soul and nothing more. To the Greek this visionary kind of artistic enjoyment was utterly alien. He *felt* the marble with his eye, and the thick tones of an aulos moved him almost *corporeally*. For him, eye and ear are the receivers of the *whole* of the impression that he wished to receive. বলা বাহুল্য, এর মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, কেননা বিভিন্ন আঙ্গিক সবসময়ে (সম্ভবতঃ কখনই) সমগোত্রীয় নয়।

৩। Oswald Spengler : *The Decline of the West* (One volume edition by Allen Unwin.) p 219 *et seq*.

স্পেঙ্‌লারের দ্বিতীয় দুর্বলতা সেইখানে, যখন তিনি মনে করেন আঙ্গিক যে রসবস্তুকে প্রকাশ করে সেটী সামাজিক ছোঁওয়ার উপরে, কাণ্টের পরিভাষায় সেটী নুমিনার রাজত্বের অধিবাসী—তাকে ফেনোমেনার জগতে রূপান্তরিত করাই কবিকর্ম। Be the artist painter or musician, his art consists in creating with a few strokes or spots or tones an image of inexhaustible content, a microcosm meet for the eyes or ears of the Faustian man; that is, in laying the actuality of infinite space under enchantment by fleeting and incorporeal indications of something which, so to say, force that actuality to become phenomenal. কিন্তু অতিরঞ্জন এবং মতিবিভ্রম সত্ত্বেও এর মধ্যে দুটী দরকারী কথা আছে। প্রথমতঃ, ভাবপ্রকাশের জন্য যে আঙ্গিকই ব্যবহৃত হোক্ না কেন, তাদের একটা সাধারণ ধর্ম এই যে তারা ভাবের বাহন এবং সে হিসাবে প্রতীক। এই প্রতীকধর্মিতাতেই এদের প্রথম সাদৃশ্য এবং প্রথম পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ, মায়ার জগৎ অর্থাৎ শিল্পের জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের পার্থক্যের একটা কারণ বাস্তবজগতের স্থান ও কালের পরিমাপ (Space and time dimension) কাব্যজগতের স্থান কালের পরিমাপের মতো নয়। এই পার্থক্যের মূলেও ঐ প্রতীক-রহস্য। চক্ষুকর্ণের বিবাদে এই প্রতীকধর্মিতা কি ভাবে পৃথক্ হয়ে পড়ে তার আলোচনা হতে এই কথাটী স্পষ্ট হবে।

৩

চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে আমরা যতোগুলি প্রতীক রচনা করেছি তার মধ্যে শব্দই সম্ভবতঃ জটিলতম। ছবিতে যে প্রতীক রচনা

করা হয় অনেকাংশে সে প্রতীকিতা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ, যদিও বর্তমানে তার প্রতীকিতার উপর বেশী দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু শব্দের সাহায্যে কোনও বস্তুর ছবি বা আকার চোখের সামনে ধরবার চেষ্টা হয় না, এক একটী কথা এক একটী বস্তুর সূচনা করে। শব্দের অর্থ প্রথমে কি ভাবে নিরূপিত হলো তা বলা কঠিন। এই কারণেই শব্দের সঙ্গে নানা স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, স্থানকালপাত্রভেদে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শব্দ কাব্যজগৎ গড়ে বহু উপায়ে। প্রথমতঃ, তার দুটী প্রধান দিক্। একটী বস্তুগত, একটী ব্যক্তিগত। বস্তুগত দিক্ দিয়ে তার একটী প্রায় চিরন্তন অর্থ আছে। যেমন 'পর্বত' বল্‌লে পাথর-ওয়ালা উঁচু জায়গা বোঝায়। এইখানে তার প্রথম প্রতীকিতা। আমাদের স্মৃতিতে পর্বতের যে ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে আছে সেইটীকে মনে করিয়ে দেবার জন্য 'পর্বত' কথাটীই যথেষ্ট। অর্থাৎ পর্বতের স্মৃতির প্রতীক হচ্ছে 'পর্বত'শব্দটী। এই বস্তুগত দিক্‌টী বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলছেন, শব্দের অর্থ বাস্তবিক কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়, শব্দের দ্বারা জাতি সূচিত হয়। যেমন 'পর্বত' শব্দে কোনও বিশেষ পর্বত সূচিত হয় না, পর্বতজাতিই সূচিত হয়। শব্দের এই বস্তুগত দিক্‌টী দরকারী তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সবটা নয়। সুতরাং তার ব্যক্তিগত দিক্‌টীও অস্বীকার করা চলে না, তারও গুরুত্ব বেশি বৈ কম নয়। এইটী অনুভূতির দিক্। একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন লোকের কাছে এক নয়। হিমালয়ের অধিবাসীর মনে পর্বত যে চিত্র জাগায়, সমতলনিবাসীর মনে সে চিত্র জাগে না। কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে অনুভূতিসামান্য আছে। ব্যক্তিগত পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছেই, তা না হলে কথাটীর প্রতীকধর্মিতা লোপ পেত।

এই দুটীই শব্দের প্রাথমিক সম্পত্তি। এই দুটী সম্পত্তি স্বীকার করলে শব্দের আর একটী সম্পত্তি চোখে পড়ে। নানা কারণে এই দুটী

সম্পত্তি সব শব্দে সমান পরিমাণে নেই। কোনও শব্দের ব্যক্তিগত দিক্‌টাই বেশী, কোনোটাতে বস্তুগত। প্রথমটার চরম নিদর্শন সুর। অস্বীকার করা চলে না যে সুরের সাহায্যে ভাববিনিময় সম্ভব, কিন্তু তার বস্তুগত ভিত্তি প্রায় নেই-ই। কিন্তু যেগুলি অর্থযুক্ত শব্দ সেগুলির বেলা এ কথা খাটে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতি, অর্থাৎ 'আমি' বড়ো, কোনও ক্ষেত্রে বা বস্তুর প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্দ্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত।" (কালান্তর, ১৩ পৃষ্ঠা) এই বাক্যের মধ্যে 'দেখছি' 'শুভবুদ্ধি' 'বিশ্বাস' 'স্পর্দ্ধা' 'কল্যাণ' 'আদর্শ', এই শব্দগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত দিক্‌টা যতো বড়ো, 'আপনার পরে' 'আজ', 'করে' 'করতে', এর মধ্যে সেটা ততো বড়ো নেই, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই উভয় দিক্ বর্ত্তমান, তাদের কোনোটার উপস্থিতিই একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

এক একটা শব্দের মধ্যে যেমন এই খেলা আছে শব্দসমষ্টির মধ্যে সে খেলা আরও বিচিত্র এবং গভীর। গল্প উপন্যাস এবং কবিতার প্রধান পার্থক্য এইখানে। এদের মধ্যে পাঠকসমাজের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম মিলনভূমি সবসময়েই আছে, তা না হলে সাময়িক সাহিত্য ছাড়া কিছু রচনা সম্ভবই হতো না। কিন্তু গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে বস্তু বড়ো, পাঠক ও রচয়িতা যেন দর্শক হিসেবে সেই চলচ্ছবি দেখছেন। "অমিত রায় ব্যারিস্টার।" এ কথাটার মধ্যে যে পরিমাণ তথ্য আছে "তোমারেই আমি ভালবাসিয়াছি শতযুগে শতবার" এর মধ্যে 'আমি' তার চেয়ে বড়ো। অর্থাৎ রসসৃষ্টির উপায়টা তফাৎ, ঝোঁকটা অন্য জায়গায়। নাটকে এগুলির চমৎকার সংমিশ্রণ। সে কথা পরে আলোচ্য।

শব্দের এই তৃতীয় সম্পত্তি স্বীকার করলে নানা প্রশ্ন উঠে পড়ে। এর মধ্যে ব্যক্তি ও বস্তুর বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত আছে। তারই ফলে অর্থের দৌড় সুদূরব্যাপী, তাকে সহজে সীমাবদ্ধ করা চলে না।

এই কথাটাকে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন শব্দের অন্যতম ধর্ম imagination, কারণ কাব্যও এক হিসেবে imagination. কাব্য শুধু কল্পনা কি না সে সম্বন্ধে প্রচণ্ড তর্কের অবসর থাকলেও শব্দের মধ্যে imagination অর্থাৎ image-রচনা নিশ্চয়ই আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই অর্থকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। "স্যাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোঽত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা।"—কাব্যপ্রকাশ, ২। ১। প্রথম, বাচ্য অর্থ। প্রত্যেক শব্দের একটা সাধারণ অর্থ আছে যেটা প্রথমেই মনে উদয় হয়। এইটা হচ্ছে শব্দের বাস্তব দিক্‌টা। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, লাক্ষণিক অর্থ। যেখানে একটা শব্দের প্রাথমিক অর্থ না বুঝিয়ে একেবারে অন্য অর্থ হয় সেখানে লক্ষণা। আলংকারিকরা উদাহরণ দিয়েছেন গঙ্গায়াং ঘোষঃ, অর্থাৎ গঙ্গার তীরে ঘোষেরা বাস করে। এখানে গঙ্গার অর্থ গঙ্গার মধ্যে নয়, গঙ্গার তীরে। গঙ্গার বাচ্য অর্থ গঙ্গার তীর নয়। এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সামাজিকী-করণের ফলেই এরকম ব্যবহার সম্ভব। তা না হলে 'গঙ্গা' বলায় গঙ্গাতীর বোঝায় না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা আর একটা অর্থের কথা বলেছেন, সেটা ব্যঙ্গ অর্থ। যেখানে বাচ্য অর্থটাও বজায় থাকবে অথচ সেটা প্রধান না হয়ে অপর একটা অর্থ বোঝাবে এবং সেই দ্বিতীয় অর্থটা ব্যঞ্জিত বা ব্যঙ্গ অর্থ। লক্ষণায় বাচ্য অর্থ অগ্রাহ্য, ব্যঙ্গে বাচ্য অর্থ থাকে কিন্তু সেটা অপ্রধান হয়ে থাকাতেই সৌন্দর্য্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতায় আছে,—

> কেসর কহে "তোমারি পথ চেয়ে
>
> দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা।"
>
> রাণী কহে, "আমারো সেই দশা।"
>
> একশো সখী হাসিয়া বিবশা,—
>
> পাঠানপতির ললাটে সহসা
>
> মারেন রাণী কাঁসার থালাখানা।

এখানে কেসর খাঁয়ের উক্তির যে অর্থ রাণীর উক্তির অর্থ তা নয়।

"আমারো সেই দশা" কথাটীর নিজের একটী অর্থ আছে। কিন্তু এখানে রাণীর প্রকৃত বলার কথা তা নয়, তাঁর 'দশা' বস্তুতঃ অন্যরকম। কিন্তু ঐ শব্দের প্রাথমিক অর্থবোধ হবার পর আর একটী অর্থ বোঝা যাচ্ছে এবং সেইটেই প্রধান। এরই নাম ব্যঙ্গ।

বস্তু হতে ব্যক্তির দিকে আরও অগ্রসর হলে দেখা যায় বলার ভঙ্গী ও গলার স্বরেও অর্থের তারতম্য ঘটে। এর একটী সুন্দর উদাহরণ আছে ম্যাকবেথ নাটকে। লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ম্যাকবেথের দ্বিধা ঘুচছে না।

Macb.

If we should fail,—

Lady M. We fail !

But screw your courage to the sticking-place,

And we'll not fail. I. vii, l. 58-60

লেডি ম্যাকবেথের উক্তি "We fail"-এর শেষে তিন রকম পাঠচিহ্ন আছে। একটী পূর্ণচ্ছেদ। লেডি ম্যাকবেথ বলতে চান, আচ্ছা স্বীকার করলুম হারবো; কিন্তু তবুও সাহস করো, তাহলে নিষ্ফল হবার সম্ভাবনা নেই। অপরটী বিস্ময়-চিহ্ন। যেন আশাভঙ্গ একেবারে অসম্ভব। তৃতীয়টি প্রশ্নচিহ্ন। কি করে একথা ভাবা চলতে পারে? শোনা গেছে বিভিন্ন অভিনেত্রী লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গী ব্যবহার করেছেন। তাতে রস অব্যাহত রয়েছে কিন্তু রস বিভিন্ন ভঙ্গীতে সৃষ্টি হলো। যেখানে অন্যান্য উপকরণ সবই এক, সেখানে এর জন্যও রসবৈচিত্র্য ঘটা অসম্ভব নয়।

সাহিত্য ও সমাজের যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে তার ফলেই যদি সাহিত্যকারের মন উদ্বুদ্ধ হয় তা হলে স্বীকার করতে হয়, সাহিত্য রচনার আঙ্গিকের মধ্যেও সাহিত্য ও সমাজের এই বিচিত্র লীলা চলছে। পূর্বেই বলেছি সাহিত্যরস একটী অখণ্ড রস, তার সহায়গুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে নির্ণয় করা চলে না। তাই শুধু যে সাহিত্যিকের মনই বস্তু ও ব্যক্তির

লীলাক্ষেত্র তা নয়, তার প্রভাব আঙ্গিক পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। শব্দের এই বিভিন্ন ক্ষমতাগুলি আলোচনা করলে সেই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন বস্তু অপরিহার্য, অপরদিকে তেমনই ব্যক্তি—এ দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাত শব্দের মধ্যেও লীলায়িত। যে যুগের সামাজিক পরিবেশের ফলে কবি বেশী আত্মমুখীন সে যুগে তিনি এমন শব্দ খোঁজেন যার মধ্যে ব্যক্তিক দিক্‌টাই বেশী, এবং সেই শব্দের সাহায্যে এমন কিছু রচনা করেন যার মধ্যেও ব্যক্তিক দিকটা বেশী। আসলে ঝোঁকটাই স্বতন্ত্র। কাজেই সজ্ঞানে না হলেও শিল্পীর মন স্বতঃই অন্যদিকে ঝোঁকে, যার ফলে সমগ্র ভাবেও সাহিত্যের চেহারা বদল হয়। রোমান্টিক যুগে কবিদের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের মিল ছিলো না, বাহ্য জগৎ তাঁদের কাছে বন্ধন। সুতরাং তাঁদের পলায়নী বৃত্তি এদিক্ দিয়ে বোঝা সহজ। কিন্তু আরও লক্ষ্য করা উচিত সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের মধ্যে কাব্যের উপর ঝোঁক পড়লো, কেন না কাব্যে বস্তুর বন্ধন অপেক্ষাকৃত কম। আবার সেই কাব্যের মধ্যে বেশী ভাগ বর্ণনীয় স্বকীয় অভিজ্ঞতা স্বকীয় আশা আকাঙ্ক্ষা, 'আমি'-ময় কাব্য। সেই আমি-ময় কাব্য সাহায্য নিলো ছন্দের ঝংকারের অর্থাৎ সুরের, যার মধ্যে বস্তুর ভার সব চেয়ে কম। শব্দগুলিও তেমনই সুদূর,—প্রত্যক্ষ নয়, vital নয়। সুতরাং রোমান্টিক কাব্য যেহেতু রোমান্টিক অতএব পলায়নী মনোবৃত্তি থাকবে, ঝংকার থাকবে, সমাজকে অস্বীকার থাকবে একথা বললে সাহিত্য সমালোচনা হয় না। মার্কা চিনে নাম দেওয়া অনেক নীচুদরের কাজ। রোমান্টিক কাব্য কি কারণে রোমান্টিক, রোমান্টিক হলে কেন পলায়নী বৃত্তি থাকবে একথা পর্যন্ত না পৌঁছলে সাহিত্যের মৌলিক ক্রিয়া বোঝা যায় না। যেমন ইদানীং দেখা গেলো ইংরেজ রসিকের মন ছন্দোবদ্ধ নাটকের দিকে কিছু ঝুঁকেছে। প্রশ্ন ওঠে, এর কারণ কি? কেউ বল্‌বেন এ রসিকের খেয়াল। পুনরায় প্রশ্ন ওঠে, এ খেয়াল কি নিতান্ত আকস্মিক, না এর পটভূমিকা আছে? দেখা যায় এর একটী পটভূমিকা আছে, সেটী এ যুগের সমাজ, তার

কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ফলে ঐ ধরণের খেয়াল হওয়া স্বাভাবিক। নাটকে শব্দ ও অর্থের বিচিত্র লীলা, সেই সঙ্গে চক্ষুগ্রাহ্য আঙ্গিকগুলিরও। অথচ তার মধ্যে একটী সংহতিবোধ আছে। বস্তু ও ব্যক্তির নিগূঢ়তম তীব্রতম সংঘাত ও সংমিশ্রণ। এ যুগের কবিরা সেটাকে গ্রহণ করছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ছন্দের আশ্রয়ও গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ নাটকের সংহতিবোধের মধ্যেও কিছু বন্ধন কাটাবার চেষ্টা। কিন্তু এ কালের কবিরা অজ্ঞান ন'ন, তাই ছন্দের মহোচ্ছাস তাঁদের রুচলো না, ছন্দ তরংগবর্জিত, ঝংকারবর্জিত, ওঠাপড়া নেই, তীব্রতাও কম। অর্থাৎ কবির পক্ষে সমাজকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু স্বীকার করাও সম্ভব নয়। অনেকসময় এই সংঘর্ষসচেতন দ্বিধাগ্রস্ত মনের ফলেই এই ধরণের প্রকাশভঙ্গী। আরও লক্ষ্য করা যায়, যে কবির মন এই ধরণের তিনি যখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বর্ণনা করেন, সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা তাঁর বিষয়, তখন স্পষ্ট অনুভব করা যায় তাঁর কাব্য তাঁর মনের স্রোতের উজান বেয়ে চলেছে, লগি ঠেলতে হচ্ছে। ফলে ছন্দ ফাঁপানো, সহজ কথা সহজে বলা চলছে না। কিন্তু সেই কবি-ই যখন প্রাচীন যুগের কাহিনী রচনা করেন তখন এ দোষগুলি দেখা যায় না। এলিয়টের দুটী বই The Family Re-union এবং Murder in the Cathedral-এর কথা মনে করলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব, দু-একটী অংশ উদ্ধৃত করছি। ও দুটী বই সম্বন্ধে অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, বই দুটী ভালো-ও, কিন্তু তা হলেও সেগুলির পুনরালোচনা ও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

AGATHA. It is going to be rather painful for Harry

* * * *

I mean painful, because everything is irrevocable,

Because the past is irremediable,

Because the future can only be built
Upon the real past. Wandering in the
tropics
Or aganist the painted scene of the
Mediterranean,
Harry must often have remembered
Wishwood—
The nursery tea, the school holiday,
The daring feats on the old pony
And thought to creep back through the
little door.
He will find a new Wishwood.
Adaptation is hard.

—*The Family Reunion*, p. 17.

শব্দে একটা স্বেচ্ছাকৃত নীরসতা আছে, কখনো কখনো অকারণে দীর্ঘ শব্দও আমদানি করা হয়েছে। আর বলার কথাটাও লক্ষণীয়। এর ভঙ্গীটা 'কাব্যিক' নয়, কিন্তু সাধারণ গদ্যও কি এই? এ রকম প্রত্যেক কথায় কৈফিয়ৎ, একটি নীরেট গঠন—একি সাধারণ গদ্য? এর সঙ্গে এই অনবদ্য পংক্তিগুলি তুলনীয়—

THOMAS.

For a little time the hungry hawk
Will only soar and hover, circling lower,
Waiting excuse, pretence, opportunity.
End will be simple, sudden, God-given.
Meanwhile the substance of our first act
Will be shadows, and the strife with shadows.

Heavier the interval than the consummation.
All things prepare the event. Watch.

বা

THE FOUR TEMPTERS.

Man's life is a cheat and disappointment ;
All things are unreal,
Unreal or disappointing :
The Catherine wheel, the pantomime cat,
The prizes given at the children's party,
The prize awarded for the English Essay,
The scholar's degree, the statesman's decoration.
All things become less real, man passes
From unreality to unreality.

—*Murder in the Cathedral.*

অবশ্য এটীও Waste Land-এর রচয়িতারই রচনা, এর মধ্যে যে কাব্যত্ব আছে সেটী কোনও সরল ভঙ্গীতে বলা সহজ কথার কাব্য নয়, কোনো হাঁ-ধর্মী মনোবৃত্তির নিদর্শন নেই, বরং তার বিপরীত লক্ষণগুলি আছে। এর মধ্যে এমন কোনও কাব্যত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যার মধ্যে প্রধানতঃ 'নেই' 'নেই' ছাড়াও একটা সজীব বৈজ্ঞানিক আশাবাদ আছে। তার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলি তুলনীয়,—

MR. A.

I'm sick of the news. All you can hear
Is politics, politics everywhere :
Talk in Westminster, talk at Geneva, talk in
the lobbies and talk on the throne ;
Talk about treaties, talk about honour, mad
dogs quarrelling over a bone.

What have they ever done, I ask you ?
What are they ever likely to do
To make life easier, make life happier ? What have they done for me or for you ?

MRS. A.

Smiling at all the photographers, smoking, walking in top hats down the lake,
Treating the people as if they were pigeons, giving the crumbs and keeping the cake.
When will they notice us ? When will they flatter us ?
When there's a war !
Then they will ask for our children and kill them ; sympathize deeply and ask for some more.

MR. A.

Night after night we have listened to the ignoble news.

MRS. A.

We have heard
The glib justification of the sorry act.

MR. A.

The frantic washing of the grimy fact.

MRS. A.

But nothing to bring a smile to the face.

MR. A.

Nothing to make us proud of our race.

MRS. A.

Nothing we should have been glad to have done
In a dream, or would wish for an only son.

MRS. A.

Nothing to take us out of ourselves,
Out of the oppression of this city,
This abstract civic space imposed upon the fields,
Destroying that tie with the nearest which in
Nature rules.

MRS. A.

Where we are unable to lose sight of the fruits
of our extraordinary industry.

—*The Ascent of F 6*

বর্তমান জীবনযাত্রার প্রতি অসন্তোষ দুই কবিরই। কিন্তু শেষের কবি ভবিষ্যতে আস্থাবান্, সেইজন্যে অসন্তোষ সত্ত্বেও শুধুই 'নেই' 'নেই' তাঁর কাব্যে নেই। এইজন্যেই শেষ উদ্ধৃতিটাতে কবিধর্ম সম্ভবতঃ বেশী-ই। স্বেচ্ছাকৃত নীরসতা নেই, একটা বলার কথা আছে এবং সেই বলার কথাটি নেতিবাচক নয়, সেটা ইতি-ধর্মী। এলিয়টের কাব্যে একটী গদ্য-ঘেঁষা ভঙ্গী আছে, কিন্তু অপর কবি আরও একটু উচ্ছ্বসিত হতে ভয় পাননি। তাতে হয়তো এলিয়টের মতো এমন রচনা সম্ভব হয়নি যার মধ্যে শেক্‌সপীরীয় ধ্বনি ও গাম্ভীর্যের আভাস আসে, কিন্তু তার মধ্যে unreality ছাড়াও আরও কিছুর সন্ধান মেলে। এ কবি দেখ্‌লেন যেখানে আমাদের শ্রমের ফল আমরা পাই না সেইখানেই প্রকৃতির বিপর্যয়। সেই বিপর্যয়-নিবারণই আজকের সুস্থ মনের কথা। সুস্থ মনের কাছে শুচিবায়ু আসে না, সেইজন্য ছন্দ সযত্নে পরিহার

করারও কোনও চেষ্টা নাই। প্রত্যেক দিক্‌টা স্বাভাবিক,—জোর করে চড়া গলায় বলতে হয়নি, অথচ অসাধারণ নতুন—নতুন যুগের মনের জন্য সার্থক নতুন কাব্য। এ পর্যায়ে এলিয়ট অগ্রসর হননি, বর্তমান জীবনযাত্রাকে অস্বীকার করতে গিয়ে তিনি জীবনকেই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তবুও বেকেট-সম্বন্ধীয় কাব্য অপর রচনাটির চেয়ে ভালো হতে পেরেছে তার কারণটা কবির মনে—কবির মনের সঙ্গে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মিল বেশী। ইয়েট্‌সের কথায় Speaking through Beckets' mouth Eliot confronts a world growing always more terrible with a religion like that of some great statesman, a pity not less poignant because it tempers the prayer book with the results of mathematical philosophy. যতক্ষণ সেই ভয়ানক ধর্মের স্বরূপবিশ্লেষণ ততোক্ষণ মানা চলে কিন্তু সমন্বয়ের বেলায় ফাঁকি, তার জন্য দৌড়তে হয় ক্যাথিড্রালে এবং অতীতে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠে পড়ে। শব্দের যে যে উপকরণগুলির উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও তাদের আর একটা ক্রিয়া আছে, যে ক্রিয়াটা সেই উপকরণের মধ্যে থেকেও তার অতীত। প্রতীক হলেই তার সঙ্গে স্থান ও কালের পরিমাপের কথা ওঠে। প্রতীক ব্যবহারের অন্যতম কারণই হচ্ছে স্থান কালের বাধা হতে মুক্তিলাভ। শব্দের সাহায্যে এই স্থান কালের নতুনতরো পরিমাপ রচনা সম্ভব। সে কারণেই কাব্যজগৎ রচনাও সহজতর। এ দিক্ দিয়ে আলোচনা করলে শব্দের প্রতীকধর্মিতার চেয়ে ছবির প্রতীকধর্মিতা আরও প্রত্যক্ষ, কিন্তু সম্ভবতঃ কিছু সীমাবদ্ধ। স্থানের পরিমাপ ছবিতে ফোটানো সহজ, কিন্তু কালের পরিমাপ ফোটানো কঠিনতর। চতুর শিল্পীর পক্ষে এই বাধা অতিক্রম অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ বর্তমান আঙ্গিকে তা সহজেই হতে পারে, কিন্তু তবুও ওটা একটা বাধা। শব্দের প্রাতিভাসিক জগৎ গড়বার প্রধান উপকরণ ভাষা, ছবির উপকরণ

বাস্তবজগতের স্মৃতিগত প্রতিরূপ। শব্দের যেমন বিভিন্ন সংগঠয়িতা হচ্ছে অর্থ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি, তেমনি ছবির হচ্ছে রেখা, আলো-ছায়া, বর্ণ, বিষয়-সন্নিবেশ। এ ছাড়া বর্তমান চিত্রকলার মধ্যে আর একটা আঙ্গিক অপরিহার্য হয়ে উঠ্‌ছে। সেটা স্তর-বিপর্যাস। পূর্বের আঙ্গিকগুলির সাহায্যে স্থানবোধ জাগানো সহজ, কিন্তু তার সঙ্গে কাল-পরিমাপ ব্যঞ্জনার চেষ্টা স্তর-বিপর্যাসের মধ্য দিয়ে সহজ হলো। মানুষের মনের বিভিন্ন স্তর একই ছবিতে চিত্রিত। সুতরাং ছবিটা আর জীবনের একটা মুহূর্ত ফ্রেমবদ্ধ হয়ে রইলো না, তার মধ্যে একটা কাল-ক্রমও আছে। এই কাল-বোধের ফলে চিত্র এযুগে সফলতর, তার মধ্যে জীবনের নানা সমস্যার বৃহত্তর স্থান ও নিবিড়তর অনুভূতি ও সার্থকতার প্রকাশ আছে। চিত্রকলা এইভাবে বর্তমান ভাবধারার বাহন হতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় ছিলো না, হয়তো অন্যান্য বাহনগুলিই প্রধান হয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু দুটী জিনিষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথমতঃ, শব্দের প্রতীকিতার চেয়ে চিত্রের প্রতীকিতা অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, চিত্রের প্রতীকিতা শব্দের প্রতীকিতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। সেইজন্যে কোন কোন সময়ে দেখা গেছে নতুন কোনও ভাবতরঙ্গ প্রথম ধরা পড়েছে ছবিতে, কিন্তু ক্রমশঃ তার জটিলতা যতো বেড়েছে শব্দের দিকে ঝোঁক পড়েছে বেশী। শব্দের সঙ্গে স্থানকালপাত্রের স্মৃতি বেশী জড়ানো, তাই সম্ভবতঃ খেলানো চলে বেশী। সম্ভবতঃ এই কারণেই ওদেশের ভাবচাঞ্চল্য প্রথম ধরা পড়ে ছবিতেই।

ভাস্কর্যের ভঙ্গী ছবি বা শব্দ কোনটারই নিছক সমগোত্রীয় নয়। ওগুলিতে যে যে আঙ্গিকের সাহায্যে প্রতিভাসরচনা সম্ভব ভাস্কর্যে তার অনেকগুলি অনুপস্থিত। যেমন রং। ভাস্কর্যে রং-এর স্থান আরও সীমাবদ্ধ, সেইজন্যে তার মধ্যে কাল-পরিমাপ ফোটানো আরও কঠিন। এই বন্ধন হতে মুক্তি পাবার চেস্টায় আধুনিক ভাস্করেরা অবাস্তব অর্থাৎ বাস্তবাতীত হবার চেষ্টা করছেন। ধরা যেতে পারে এপ্‌স্টাইনের মূর্তি। অনুরূপ নয়—স্পষ্টতঃই নয়। সাদৃশ্য বজায় রেখে অসাদৃশ্য

আরও বেশী। এ ছাড়া বন্ধন মুক্তির উপায় নেই, নানা বিচিত্র সাময়িক ভঙ্গীর আড়ালে যে 'বিশুদ্ধ' আর্ট-রূপ আছে তাকে ফোটানোর উপায় নেই। কাব্যে যেমন 'বিশুদ্ধ' কাব্য অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সামাজিক ছোঁওয়া বাঁচিয়ে শুধু সূক্ষ্মাবস্থায় যে কাব্য নানারূপে নানা ভঙ্গীতে বিকশিত সেই কূটস্থ অবস্থা নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা, ছবিতেও তাই, ভাস্কর্যেও তাই। এ যে সুস্থ মনের কথা নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় এযুগের সঙ্গে গ্রীক যুগের তুলনা করলে। গ্রীক ভাস্করের মনেও এ সমস্যা জেগেছিলো, কিন্তু তাঁরা এই য়্যাবাস্ট্র্যাক্ট্ রূপে পৌঁছবার চেষ্টা করেন নি, তার পরিবর্তে সমাজকে স্বীকার করেছেন, কেন না সমাজেই তাঁদের ধৃতি। প্রথম যুগে কাল-বন্ধন হতে মুক্তি দেবার চেষ্টা করা হলো মূর্তিগুলি সচলভঙ্গীতে পাশাপাশি সাজিয়ে। যেমন, পার্থেননের ফ্রীজ। পরপর শোভাযাত্রা চলেছে। শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এটা যে সে যুগের সামাজিক পরিস্থিতিরই ফল তার প্রমাণ, পরের যুগের মূর্তিগুলির ভঙ্গীটাই স্বতন্ত্র। ও যুগে সামাজিক সত্তা প্রবল, কিন্তু যখন শ্রেণীবিভেদ বাড়লো সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ তীব্রতর হলো, সে সময়ই চেষ্টা হলো বিশেষ একটা মুহূর্তের বিশেষ একটা ভঙ্গীকে চিরস্থায়ী করার। এর নিদর্শন ভ্যাটিকানে রক্ষিত বেলভেডিয়ার অ্যাপোলো মূর্তিতে। একটা পায়ে ভার রক্ষিত, একটি হাত প্রসারিত, যেন অত্যন্ত লঘুস্পর্শে দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, মাটিতে পা ঠেকে কি ঠেকে না। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় যখন আরও বেশী সে সময় হেলেনিষ্টিক যুগে পাওয়া গেল প্লাটের (Platea) অ্যাপোলো মূর্তি। তাতে আর কোনও বিশিষ্ট ভঙ্গীকে প্রকাশ দেবার চেষ্টা নেই, হাত দুটা স্থিরভাবে পাশে ঝুলছে। কল্পনার অবাধ প্রসারের সুযোগ, কিন্তু শিল্পী তাঁর দর্শকদের কল্পনার উপর যে দাবী জানিয়েছেন তা জানিয়েছেন কোনও নতুন আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে নয়, তা জানিয়েছেন একেবারে আঙ্গিক বাদ দেবার চেষ্টায়। আবার সেই গদ্যছন্দের কবিতা। কিন্তু ভাবসাম্য থাকা সত্ত্বেও আঙ্গিকের জন্য তফাৎটাও অনস্বীকার্য। একালে

যতো সার্থক কবি, এমন কি সর্বাঙ্গীনভাবে সার্থক না হলেও শুধু সার্থক ভঙ্গী-কৃৎ, এমন কবিও যতো জন্মেছেন, সার্থক চিত্রকর যতো দেখতে পাওয়া যায়, সার্থক ভাস্করের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম—সেটি কি কেবল আকস্মিক ঘটনা ?

৪

সাহিত্য ও সমাজের সংযোগ ও বিয়োগের এই আলোচনা হতে দুটী কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ সাহিত্যকারের মনে, দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেই কাব্যের জন্ম। এইখানে বন্ধন ও অবন্ধনের একটী বড়ো সংগম। কাব্যের দায়িত্ব চিরকালই অবিচল, তার কাজ রসসৃষ্টি। কিন্তু নানান যুগের মানুষ নানাভাবে নানা চিন্তা করে এসেছে, তাদের রসোপলব্ধির পন্থা যুগে যুগে বদলে যায়। মানুষ সে হিসেবে চিরন্তন এবং সাময়িক, অথচ নিছক কোনোটাই নয়। তেমনি সাহিত্যের আঙ্গিকেও এই বন্ধন ও অবন্ধনের লীলা। আঙ্গিকের প্রতীকধর্মিতার অর্থই হলো স্থান ও কালের বাধা কাটানো, কিন্তু প্রতীক হলেই তার উপর স্থান ও কালের ছাপ থাকবে। দক্ষ শিল্পী এই বন্ধন ও অবন্ধনকে খেলাতে পারেন, বন্ধন থাকায় তাঁর বরং সুবিধেই বেশী। আধুনিক কবি লিখেছেন,

> বড়োবাজারের উপল উপকূলে
> জনগণের প্রবল স্রোত
> উগারিছে ফেনা

এর ক'টী অংশে রবীন্দ্রনাথের রচনার ধ্বনি আছে। সাগরিকা স্নানশেষে উপল উপকূলে বসে থাকে, উপল-উপকূল কথাটীর সঙ্গে তার স্মৃতি জড়িত। এখানে ঐ কথাটীকে নতুন ভঙ্গীতে ব্যবহার করার ফলে আমাদের সেই স্মৃতি অপ্রত্যাশিতভাবে নাড়া খায় আর সেই সঙ্গে মনে হয় আমরা যারা শহরে বাস করি, তাদের জীবনে সাগরিকার অবকাশ

কতটুকু মেলে! আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তৈলেন্ধনতণ্ডুল আহরণের এমন ঠাসবুনোনি যে তার মধ্যে সাগরিকার প্রবেশ করার মতো রন্ধ্রপথ সহজে মেলে না। কিন্তু এতগুলি কথা এবং এতো বিচিত্র রস সম্ভব হতো না যদি না উপল-উপকূলে কথাটার সঙ্গে ঐ স্মৃতি বিজড়িত থাকতো। সুচতুর শিল্পীর হতে বন্ধনই এখানে অবন্ধনের কারণ, তাই সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি। সার্থক সাহিত্য বা শিল্পে সমাজতন্ত্র, ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রের সংযোগ ও বিয়োগ দুই-ই আছে, কিন্তু তফাৎ হয়ে নেই, একটা সমগ্রতার মধ্যে তারা সংহতিবদ্ধ হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চঞ্চল। কঠিন আবরণের সংহতি ভাঙতে ভাঙতে এগোলে আমরা পরমাণুর পরপারে পৌঁছই, যেখানে প্রত্যেকটা পরমাণুই স্বতন্ত্র, কিন্তু স্ব-তন্ত্র নয়, বিশেষ কিন্তু একটা সমগ্রের মধ্যে বিশেষ, প্রাণের বেগে চঞ্চল কিন্তু দেহের সীমায় সীমাবদ্ধ।

সমাজ ও সাহিত্য—দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব ও কবিতা

সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, এ কথার দ্বিতীয় পর্যায় অবতারণার একটী কারণ আছে। সমাজ ও সাহিত্যের যে সম্বন্ধ নির্দেশের চেষ্টা পূর্বের তিন অধ্যায়ে করা হলো তার মধ্যে একটী কথা এই যে, সমাজ ছাড়া সাহিত্য যেমন কোনো কালেই হয়নি, সম্ভবও নয়, এমন কি বহির্জগতকে অস্বীকার করার কারণও বহির্জগতের অর্থাৎ সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নিহিত,—তেমনি সাহিত্য সাহিত্যিক ছাড়া রচিত হয় না, তার জন্যে সাহিত্যিক প্রতিভারই প্রয়োজন অন্য কিছুর নয়। কবিরা ত্রিশির কাঁচের মতো, এটী সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের উপমা। মূল রংএর উপর কবিদের হাত নেই, কাব্যের মূল কাঠামো সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু বর্ণচ্ছদ রচনার কাজ কবির নিজস্ব। সেই বর্ণচ্ছদের চেহারা কি হবে সেটী নির্ভর করে ঐ ত্রিশির কাঁচের, কবিমনের বৈশিষ্ট্যের উপর। কিন্তু কবিকর্মের এই ধারণা সর্ববাদিসম্মত নয়।

ভারত-নাট্য-শাস্ত্রে বলা হয়েছে নাট্যরস শুধু নাট্যকারের উপর নির্ভর করে না, অভিনেতাদের উপরও নির্ভর করে। পারিভাষিক কথায় বিভাবাদি প্রক্রিয়া সেইজন্যে এখানে কিছু অন্য। অর্থাৎ রসে রূপকারের ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্য।

পক্ষান্তরে অন্য একটী মতবাদ ক্রমবর্ধমান। নিম্নলিখিত উপদেশগুলি খারকভ সাহিত্য সম্মেলনে সাম্যবাদী লেখকদের জন্য বিতরিত ঃ [১]

(1) Art is a class weapon.

(2) Artists are to abandon 'individualism' and

১। Stephen Spender : *The Destructive Element*, p. 232

the fear of strict discipline as petty bourgeois attitudes.

(3) Artistic creation is to be systematized, organised, 'collectivized', and carried out according to the plans of a central staff like any other soldierly work.

(4) This is to be done under the 'careful and yet firm guidance of the Communist Party.'

(5) Artists and writers of the rest of the world are to learn how to make proletarian art by studying the experience of Soviet Union.

(6) 'Every proletarian artist must be a dialectical materialist. The method of creative art is the method of dialectical materialism.'

(7) 'Proletarian literature is not necessarily created by the proletariat, it can also be created by writers from the petty bourgeoisie, and one of the chief duties of the proletarian writer is to help the non-proletarian writers to 'overcome their petty bourgeois character and accept the viewpoint of the proletariat'.

প্রথম মতের সঙ্গে দ্বিতীয় মতের পার্থক্য আকাশপাতাল যদিচ লেনিনের মতে prolecult আন্দোলন bunk.

একালের সোভিয়েট বাণীর উদ্ধৃতি বিপজ্জনক, কারণ প্রচারের আগ্রহে তার সত্য এবং অসত্য উভয়ই বিকৃত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু অ-সোভিয়েটী লেখক টি. এস. এলিয়েটের মত হচ্ছে the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality. এটী অবশ্য সোভিয়েটী অর্থে

ব্যক্তিত্ব নিরাশ নয়; কারণ পূর্বোদ্ধৃত উদ্ধৃতিতে ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত কিন্তু তার স্বাধীন লীলা স্বীকৃত নয়, কিন্তু এলিয়টের মতে কবিরা ব্যক্তিত্বহীন নির্গুণ ব্রহ্ম। একদিকে ব্যক্তিত্বের জয়গান অন্যদিকে একটী বিশেষ ভঙ্গীতে ব্যক্তিত্বের প্রযোজনা, তৃতীয় মতে ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকেই অস্বীকার—এ তিনটী মতবাদের সমন্বয় ঘটানো দূরের কথা, এর কোন্‌টা সত্য কোন্‌টী মিথ্যা, কোন্‌টী বাহ্য কোন্‌টী আরও বাহ্য সে কথা স্থির করাও সহজ নয়।

এর থেকে সমালোচনার স্বরূপ কি বা পদ্ধতি কি, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবতারণা ঘটে।

২

সামাজিক বিপ্লবের জন্যই কবিরা বদ্ধপরিকর হবেন এ মতবাদের বিস্তৃত আলোচনার স্থান অন্যত্র। বিপ্লবের কাজে কবিরা কতটুকু সহায় হতে পারেন আর বিপ্লবের ফলে কাব্যের চেহারা কি হয় এ দুটী প্রশ্ন ঠিক এক নয়। সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ কি এ প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান, কিন্তু একটীর গোড়ার কথা সমাজ, অপরটী গোড়ার কথা সাহিত্য। এ দুয়ের বিরোধী সম্বন্ধ কল্পনা করার কোন কারণ নেই, আর সামাজিক দুরবস্থার ফলে সাহিত্যের যে অবনতি অনিবার্য তার ফলে সাহিত্যিকেরা যদি সাহিত্য রচনা বন্ধ রেখে বিপ্লবের কাজে লাগেন তাতে পরিণামে সাহিত্যিক মঙ্গলেরও সম্ভাবনা, কিন্তু তবুও প্রত্যক্ষতঃ সেটী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত, সাহিত্যের নয়। লেনিন-শবসৌধের স্থপতি বিপ্লব সাধনে অংশ গ্রহণ হয়তো করেছিলেন, কিন্তু ঐ সৌধ-পরিকল্পনার সময় তাঁর বৈপ্লবিক মন অন্য ভঙ্গীতে প্রকাশিত। বিপ্লব সেখানে সামাজিক সংস্থানের ফলেই, কিন্তু তার প্রকাশটী সেখানে সামাজিক নয়, শিল্পগত। শিল্পগত আলোচনায় বিপ্লবের ফলে স্থাপত্যের কি নতুন চেহারা দেখা দিলো সেইটীই আলোচনার বিষয়, কিন্তু বিপ্লবের জন্য বেশী আলোচনা দরকার স্থপতিকে কি ভাবে বিপ্লবের কাজে লাগানো যেতে পারে।

সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ নিয়ে তর্ক এখানে নয়, এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে পার্থক্য। সুতরাং সমাজবিপ্লবের ফলে কি ধরণের সাহিত্যিক বিপ্লব দেখা দেয় তার আলোচনায় ও মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়, যদিও কি সাহিত্যিক কি শিল্পী প্রত্যেকেই সমাজের অন্তর্গত এবং সে হিসেবে স্বকীয় শ্রেণীঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বিপ্লবের যোদ্ধা, স্বপক্ষে বা বিপক্ষে।

কিন্তু একটী কথা লক্ষ্য করা যায় যে, যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করতেই উৎসুক তাঁরাও সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের স্থান অস্বীকার করেন নি। শিল্পীকেও যোদ্ধার মত নিয়ম-কানুনে বাঁধা দরকার, এ কথা বলার অর্থ এই যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্বৈরাচার সম্ভব নয়, তাকেও একটী বিশেষ বাঁধা খাতে বহাতে হবে। বিপ্লবের জন্য প্রবাহ একটী বিশেষ খাতে পরিচালনা দরকার, কিন্তু তার অর্থ প্রবাহকে অস্বীকার করা নয়। সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হলো এ মতবাদ তারই একদেশদর্শী মাত্র। কবিরা যুগপ্রতিভু এবং যুগস্রষ্টা—উভয়ই। কোনো সময় কবিরা রিচার্ডসের কথায় most conscious point of the age-এ বর্তমান থেকেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু এমন কোনো সময় আসে সে সময় কবির প্রতিভু অপেক্ষা স্রষ্টার চেহারাই বড়ো, কবিতা expression-এর চেয়ে exhortation-এই পরিণত হয়, কবিদের বহির্মুখীনতা বেশি। যে কবি "কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না" বলে কবিতা লেখেন তাঁর মনের ঐ ভঙ্গীতে উদ্দীপনা সব সময়ে আকস্মিক ঘটনা নয়, তাঁরা শুধু কবিই নন সজ্ঞান-বিপ্লবীও। এগুলির সামাজিক কারণ আছে। বর্তমান সামাজিক পরিবেশে কাব্যের ভঙ্গী ক্রমশঃই ওদিকে এগিয়ে চলবে, প্রত্যেক সচেতন কবিই এ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী হতে বাধ্য! পূর্বনির্দিষ্ট মূল্যবোধ নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে তার উপরে কাব্য রচনা করা কোনও কবির পক্ষেই আজ আর সম্ভব নয়, ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছতেই হয়। এমন কি যাঁরা প্রতিবিপ্লবী তাঁদের পক্ষেও এ কথা সত্য।

সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় মতে অন্য পার্থক্য থাকলেও সাহিত্য-প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে তৃতীয় মতের বক্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক। সেই কারণে এটীর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রশ্ন ওঠে—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক কি? অর্থাৎ ঐতিহ্যের স্বরূপ কি? এলিয়টের মতে ঐতিহ্যের দুটী উপকরণ। এর প্রথম উপকরণ একটী ইতিহাস-বোধ। কিন্তু এই ইতিহাসবোধের সঙ্গে আরও একটী উপকরণ দরকার, তা না হলে অতীত মৃত হয়েই থাকবে কিন্তু ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হবে না। ঐতিহ্যের অর্থ এই যে, অতীত শুধু অতীতেরই জিনিষ নয়, বর্তমানের পক্ষেও তার মূল্য আছে। এলিয়টের কথায়—the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence. The historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. ঐতিহ্যের এই অর্থনির্দেশ করলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, কোন কবিই তাঁর রচনার জন্য একটী নিজের আলাদা কাব্যনীতির দাবী করতে না পারলেও এবং প্রাচীন ন্যায়ে তাঁর মূল্যবিচার সম্ভব না হলেও প্রাচীনের সঙ্গে তাঁর তুলনা অবশ্যম্ভাবী। No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists.···In a peculiar sense he will be aware also that he must inevitably be judged by the standards of the past. I say judged, not amputated, by them; not judged to be as good as, or worse or better than the dead and certainly judged by the canons of dead critics.

It is a judgement, a comparison, in which two things are measured by each other.

ইতিহাসবোধের এই অর্থ করলে কতকগুলি অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। অতীত শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্মদাতা হিসেবেই দেখা দেয় না, বর্তমানের সঙ্গেও গুরুত্ব তার সমান। কিন্তু যে অতীত শুধু ধারণার বিষয় নয় বাস্তব জগতের অন্তর্ভুক্ত, সে অতীতের এ চেহারা সম্ভব নয়। সে কারণে যে অতীত বর্তমানের সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এক হিসাবে যুগপৎ বর্তমান, সে অতীত কর্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডেরই—সেটাকে আমরা অনুভব করি কিন্তু বর্তমানের সক্রিয় জন্মদাতা এবং গতিশীল বাস্তব জিনিষ হিসেবে আলোচনা করি না। ঐতিহ্যের এই সংজ্ঞা একাধারে ইতিহাসবোধের অন্তর্গত কিন্তু ইতিহাসবোধের বিরোধী। অতীত সম্বন্ধে সচেতনতা ইতিহাসবোধের অন্তর্গত, কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তার জ্ঞানরাজ্যে যুগপত্তা এবং বাস্তব জগতে অতীতের একটা বিশিষ্ট অবদানকে অস্বীকার করা ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মূলনীতির বিরোধী। এককালে ইয়েট্‌স্ লিখেছিলেন—we can no longer permit life to be shaped by a personified ideal, we must serve with all our faculties some actual thing. এলিয়টের কথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁর অতীত একালেও বর্তমান, কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে একালের জন্মদাতা নয়।

জ্ঞানরাজ্যে অতীত ও বর্তমানের এই বিবরণ সম্ভব হতে হলে একটা নির্বিকার ক্ষেত্রও অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেন না, যে কবি অতীতকে এই চোখে দেখতে রাজী নন তাঁর কাব্যেও ঐতিহ্যবোধও থাকা সম্ভব নয়। সমর সেনের কবিতায় অতীত সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু ও অর্থে সত্য নয়, ক্ষয়িষ্ণুতার ভাণ্ডার এবং নবযুগের জন্মদাতা হিসাবেই তার দান। সমর সেনের মনে অতীত সম্বন্ধে ওরকম নির্বিকার মত পোষণ সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে মতামত তাঁর সুদৃঢ়ই, অতীত বর্তমানের

সঙ্গে চলেছে কিন্তু বর্তমানের জন্মদাতা নয় এরকম ধারণা তাঁর কাব্যে মিলবে না। সেই জন্য যাঁদের চোখে ঐতিহ্যের এলিয়টী ছাড়া অন্য কোনও স্বরূপ নেই তাঁদের চিত্তক্ষেত্রের একটী বিশেষ নির্বিকারতার প্রয়োজন আছে। কবির ব্যক্তিত্ববোধ থাকতে সে নির্বিকারত্ব অসম্ভব, এই জন্যেই the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality.

কবির চিত্তক্ষেত্র নির্বিকার হলে সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াও অন্য ধরণের দাঁড়ায়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াতে কবির স্থান নেই, অর্থাৎ কবির ব্যক্তিত্বের স্থান নেই, কবি কেবলমাত্র ক্ষেত্র। এলিয়ট এটীকে একটী উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন—

When two gases previously mentioned (*i.e.* oxygen and sulphur dioxide) are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulphurous acid. This combination takes place only if the platinum is present ; nevertheless the newly-formed acid contains no trace of platinum, and the platinum itself is apparently unaffected ; has remained inert, neutral, and unchanged. The mind of the poet is the shred of platinum. It may partly or exclusively operate upon the experience of the man himself ; but, the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates ; the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material.

৩

সাহিত্য ও সমাজের যে সম্বন্ধনির্ণয় এলিয়ট করেছেন তা হতে দুই-একটী সিদ্ধান্ত সহজসাধ্য। তাঁর চোখে অতীতের বস্তুস্বরূপ কম, সে যেন নিশ্চিন্ত অতীত এবং বর্তমানের আলোচনার জন্য আর একটী নিকষ পাথর কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তার সজীব যোগসূত্র, বস্তুগত ঐতিহাসিক যোগসূত্র, নেই। কবির মধ্যবর্তিতা ছাড়া কবিতা সম্ভব নয় কেবল মাত্র এটুকুর জন্যই কবির প্রয়োজন, কিন্তু কবিতা যে কবির ব্যক্তিত্বের নিদর্শন এ কথা শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্বন্ধে বলা চলবে না। যদি ভৌতিক প্রক্রিয়ায় কবিতা লেখা সম্ভব হতো, medium-হিসেবে জীবন্ত কবির পরিবর্তে আধিদৈবিক আত্মাতেই কাজ চলতো তা হলে সম্ভবতঃ কবির প্রয়োজনই হতো না। এ কথা মতবাদ-হিসেবে নয়, কাজে প্রমাণের চেষ্টাও চলছে। চিত্রকলায় যাঁরা শুধু বর্ণলীলাবাদী তাঁদের একদল সহজ ন্যায়ে এগিয়ে চলতে চলতে এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে ছবির পরিবর্তে একটী যন্ত্র আছে যে যন্ত্র হতে নানারকম রঙের প্রতিফলনের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এঁরাও সম্ভবতঃ এখনও এলিয়টী ঐতিহ্যে পৌঁছতে পারেন নি, কারণ যন্ত্রচালনার জন্য এখনও শিল্পীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি ঐ রকম একটী অচেতন অথচ স্বয়ংচালিত যন্ত্র সম্ভব হয় তা হলে এলিয়টী নির্বিকারত্ব বজায় রেখেও শিল্প সৃষ্টি বোধ হয় সম্ভব হতে পারে।

অবশ্য প্লাটিনম খণ্ডের সঙ্গে কবির তুলনার একটী অর্থ আছে। কোনো কোনো কবির কবিতায় দেখা যায়, কবির মধ্যে এমন একটী আত্মসচেতনতা আছে যার ফলে কবি নিজের আবেগে আত্মহারা নন, তাঁর রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি রচনা করেছন এ রকম একটা বোধের পরিচয় পদে পদে মেলে। নিজের লীলায় কবি নিজেই দর্শক। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে এরকম একটী নৈর্ব্যক্তিকতার সন্ধান মেলে, কবিতার খ্যাতি নিন্দা কবির পক্ষে সেখানে তুচ্ছ। শেলীর কবিতার

সঙ্গে এর তুলনা করলে এলিয়টের বক্তব্য সহজেই বোঝা যায়। শেলী যেখানে নবযুগান্তর রচনা করেছেন সেখানে সে যুগান্তর না ঘটলে তাঁর ক্ষতি-বৃদ্ধি অত্যন্ত বেশী। কিন্তু শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সে অবস্থা নয়। কবিদের মধ্যে এই আত্মসচেতনার, এই দ্বিত্ববোধের ধারা বহুকালের। নানা সময়ে নানাভঙ্গীতে এই দ্বিত্ববোধের প্রকাশ হয়ে থাকে। কোনো ক্ষেত্রে এই দ্বিত্ববোধ জীবন-দেবতার রূপ গ্রহণ করে, কোনো সময় এই দ্বিত্ববোধ anti-self নামে কথিত। আর এই দুই রূপের সম্বন্ধও কালে কালে ভিন্ন, সকল সময়ে এই দ্বিত্ববোধ এক ভাবে প্রকাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা পর্যায়ের কবিতা এবং শেষ পর্যায়ের কবিতা পাশাপাশি আলোচনা করলেই এ কথাটী বেশ বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়ের কবিতায় দ্বিত্ববোধের ফলে কবি জীবন-দেবতা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সে জীবন-দেবতার সিংহাসন কবিরই মনে, কোনো বাহ্য জগতে নয়। জীবন-দেবতার সঙ্গে কবির আলাপ রহস্যালাপ, তার মধ্যে বহির্মুখীনতা কম, অন্তরের লীলাই প্রধান। কিন্তু শেষ পর্যায়ের দ্বিত্ববোধ অন্য প্রকারের, সেখানে কবি কবিতার উচ্ছ্বাস মুক্ত এবং বহির্মুখীন। এই কারণে সেখানে কবির এক অংশ কবিতা লেখে কিন্তু অপর অংশ কৃষাণ মজুরের কবির জন্য কান পেতে থাকে। জীবন-দেবতার চরণধ্বনির পরিবর্তে কৃষাণ মজুরের পদধ্বনির মধ্যে একটী বড়ো যুগের ব্যবধান। কিন্তু দ্বিত্ববোধ উভয় স্থানেই। সে হিসেবে ব্যক্তিত্বের বিনাশেই শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্ভব এ মতবাদের একটা সুদূর অর্থ খুঁজে পাওয়া গেলেও ও মতবাদ যে সমর্থনীয় তা নয়। কারণ, যেটীকে এলিয়ট ব্যক্তিত্ব-বিনাশ বলে ভাবেন আসলে সেটীও একটী বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। গোড়ার কথাটা শেষ পর্যন্ত এইটুকুই দাঁড়ায় যে, আপনহারা আবেগ একালের কবিতায় অচল, কবিতায় সচেতনতার যুগ এসেছে।

এলিয়টী ব্যক্তিত্ব-বিনাশ আসলে যে একটী নতুন ধরণের ব্যক্তিত্বেরই নামান্তর, এলিয়টের কবিতা হতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এলিয়টের কবিতার মধ্যে একটী ধারাবাহিক উচ্ছ্বাসের সন্ধান মেলে না, তাঁর

কবিতা সাধারণতঃ নানা খণ্ডচিত্রের সমষ্টি। ঐ খণ্ডচিত্রগুলি কবির মনের দ্বারা সংযুক্ত, অন্য কোনও স্থায় বা অন্য কোনও সংহতি তার মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। এর ব্যতিক্রমও এলিয়টের কাব্যে আছে কিন্তু এই সুরটাই প্রধান। স্বকথিত ঐতিহ্যবোধ তার মধ্যে প্রবল, প্রাচীন কবিতার লাইন, প্রাচীন রূপক উপমা ও ভঙ্গীর পাশাপাশি একালের জীবনের চিহ্ন আছে, অতীত ও বর্তমানের যুগপত্তা স্পষ্ট। কিন্তু আলোচনা করলে দেখা যায়, এ কাব্যও এলিয়টের ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ—

When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table

বা

I grow old···I grow old
I shall wear the bottoms of my trousers rolled

এ ধরণের কাব্য রচনা ১৯০৯ সালে কোনো প্রচলিত কাব্যরীতির অন্তর্গত ছিলো না। এলিয়টী প্রতিভা ছাড়া ও ধরণের কবিতা সম্ভব হয়নি, ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। এলিয়ট এ কবিতায় কখনো আত্মসচেতনতা হারাননি, তিনি কি লিখেছেন সে সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সজাগ—কিন্তু সে কারণে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েনি একথা অচল।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংকটের ইতিহাস আলোচনা করলে এলিয়ট যাকে একটী নির্ব্যূঢ় সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করেছেন তার প্রকৃত স্বরূপ এবং তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। গত মহাযুদ্ধের পরবর্তী মানস পরিবর্তনের সব চেয়ে বড়ো কথা অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের ফলে প্রথম যুগে লেখকেরা অন্তর্মুখীন হয়েছিলেন। কোনো কোনো কবি স্বকীয় বিশ্বাসে তৃপ্ত ছিলেন কিন্তু সে বিশ্বাসকে সামাজিক বিশ্বাসে পরিণত করার সাহস পাননি, কিন্তু অনেক কবিরই অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মতো হলো। তাঁদের অতীতও নেই ভবিষ্যতও নেই, অর্থাৎ অতীতে ফিরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু কোনো প্রাণবান ভবিষ্যতের

আশাতেও তাঁরা সঞ্জীবিত ন'ন। অগত্যা অতীত হতে নানা খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে বর্তমানের সঙ্গে জোড়া দেওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিলো না। তাঁরা বুঝতে পারেননি, যে সচেতনতার জন্য তাঁদের হাহাকার সে সচেতনতা তাঁদের নির্দিষ্ট সীমানাতেই আবদ্ধ নয়। অবিশ্বাসের যুগ কাটবার পর ভবিষ্যতে বিশ্বাস দেখা দেয়, সে অবস্থায় ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমান এবং অতীতের একটী ধারাবাহিক ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ধরা পড়ে। সেই কারণেই এ ধরণের মতবাদ সম্ভব হয়েছিলো। ব্যক্তিত্ব কোনো কোনো সময়ে স্বৈরাচারেরই নামান্তর, সে হিসেবে প্রয়োজনকালে সেই ব্যক্তিগত স্বৈরাচার নিরসন করে তাকে সমাজবিপ্লবে প্রযোজিত করতে হবে এ কথা বলার পরিবর্তে এই অবিশ্বাসী যুগের কবিরা ব্যক্তিত্বকেই অস্বীকার করলেন। অবিশ্বাসের যুগে নিজের কবিতা সম্বন্ধেও কবির প্রত্যয় নেই—সেই কারণে নেতিমুখে কবিতার প্রকাশ এবং ব্যঙ্গহাসিরই প্রাধান্য। কবি সহজে ধরা দিতে চান না, এমন কি, নিজের কবিতার মধ্যেও নয়।

এর ফলে কবিতার অবনতি অনিবার্য। সমাজকে স্বীকার করতে এ মতবাদের প্রবৃত্তি নেই, কেন না, সামাজিক বিবর্তন যে মঙ্গলময় ভবিষ্যতের দিকে বা বিপ্লবের দিকে এর কোনো বিশ্বাসই এঁদের নেই। অস্বীকার করার পথে এগোতে এগোতে তাঁরা শেষে নিজেকেই অস্বীকার করতে উদ্যত। অর্থাৎ এঁদের ব্যক্তিত্ব নেতিধর্মী। এই কারণে দুরূহ কবিতায় এঁদের আপত্তি নেই, যদি পাঠক সমাজ তাতে রস না পান তা হলে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডী রচনা করে তার মধ্যেই পারস্পরিক প্রশংসায় সময় কাটানো যেতে পারে। এলিয়টের এই উদ্দেশ্য ছিল বলছি না, কিন্তু ঐ ধরণের মনোবৃত্তির সামাজিক ফল শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ঐখানে।

সামাজিক কারণে এ মতবাদের উদ্ভবে বিস্মিত না হলেও এর মধ্যে সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ ধরা পড়ে না। এ মতবাদও একধরণের ব্যক্তিত্বের ফল। সেইজন্যে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধবিচারে ওরকম

দুই মহলা মনের সন্ধানে ব্যস্ত না হয়ে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করতে হয়। এই রকম দ্বিত্ববোধ একই মনের ক্রিয়া, তার জন্যে দুই মহলা মনের কোনও প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটা নির্ভর করে কবির সঙ্গে তাঁর সামাজিক পরিবেশের সম্বন্ধের উপর। বাংলা কাব্যের নবযুগের আলোচনায় দেখা যাবে গীতাঞ্জলির অন্তরলোকের পর বলাকার বহির্মুখীনতা বা বিষ্ণু দে'র ব্যঙ্গহাসির পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রায় প্রচারপত্রের মতো কবিতা—এগুলির সঙ্গে সঙ্গে কবির মন যে কখনও অন্তর্মুখীন কখনও বহির্মুখীন হয়েছে সেটার সঙ্গে সামাজিক হাওয়াবদলের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কোনো যুগে আমাদের প্রাথমিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সাধারণ মতৈক্য থাকে,—সে যুগে কবিরা নানা 'চিরন্তন' বিষয়, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার একটা 'সার্বকালিক' রূপ, ব্যক্তিগত কবিতা ইত্যাদি নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকতে পারেন। কথাটা অবশ্য একটু অতিশয়-ধর্মী হলো, কেন না, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ সব সময়েই সংযুক্ত—একটাকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা সম্ভব হয় না। কিন্তু তুলনায় ওকথা বুঝা যায়। যে যুগে সে রকম মতৈক্য নেই সে যুগেও অন্তর্মুখীনতা দেখা দেয়, কিন্তু সে অন্তর্মুখীনতা অন্য ধরণের, নির্মোকের আবরণে বাইরের আঘাত আটকাবার চেষ্টার মতো। পরে আর একটা ভবিষ্যৎ আদর্শে সঞ্জীবিত হলে আবার নির্মোকমুক্ত বিচরণ সম্ভব হয় এবং সামাজিক দিকটাই বেশী চোখে পড়ে। এ কথা এলিয়ট-উত্তর ইংরেজী সাহিত্যেও দেখা যায়। কিন্তু তাতে সমাজ ও সাহিত্যের মূল সম্বন্ধ পরিবর্তিত হয় না, সেটা একই। সমাজের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ একই, সে সম্বন্ধের চেহারা নানারকম হতে পারে, কোনো হাওয়ায় কবিদের স্ফূর্তি, কোনোটাতে তাদের অস্বাস্থ্য। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায়, কবিরা চারপাশের জল-হাওয়াতেই পুষ্ট, নির্বাতাস কাঁচের ঘরে তাঁরা জীবন নির্বাহ করেন না। আর কবিদের ব্যক্তিত্ব বিনাশেই যে শ্রেষ্ঠ কবিতার উদ্ভব তাও নয়, কেন না, কবিরা যে নিজেদের ধরা দিতে সাহস করছেন না কেবল কতকগুলি অভিজ্ঞতার মালা গাঁথছেন—এ মনোবৃত্তি বিশেষ নো'কা

যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার উপযোগী মনোভাব হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় তার বিপরীত কথাও সত্য; কারণ কোনো কোনো সময় সজোর কণ্ঠই কবিধর্মের বেশী উপযোগী। সে হিসেবে ব্যক্তিত্বের প্রকাশভঙ্গী দুই সময়ে দুই রকম, কিন্তু নির্বিকল্প কবি কেউই ন'ন, ব্যক্তিত্ব উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। যাঁরা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাসী তাঁরা বরং ব্যক্তিত্বকে বেশী করেই ধরবেন, ঐতিহ্যের চাপে সে ব্যক্তিত্ব আজ বিপ্লবী হবার সম্ভাবনা এবং সেই ব্যক্তিত্বকে সংঘবদ্ধ করে বিপ্লবের কাজে লাগানোই বিপ্লবের স্বার্থ।

সুতরাং সাহিত্যের 'সামাজিক' ব্যাখ্যা কথাটী একহিসাবে অর্থহীন। তার অর্থ যেন দাঁড়ায় যে, হাজারটী ব্যাখ্যার মধ্যে 'সামাজিক' ব্যাখ্যা অন্যতম। কিন্তু এ ধারণা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ না জানার ফলেই সম্ভব হতে পারে। 'সাহিত্যের সামাজিক ব্যাখ্যার' অর্থ এ নয় যে, চীনে বোমা পড়লে পরদিনই পেরুর কবি সে সম্বন্ধে কবিতা লিখতে বসবেন। রাজনীতিতে দেখি, যেদিন বৃটিশ শ্রমিক টাফভেল কেসে পরাজিত হলো সেই সময় হতেই নতুন আইন প্রণয়নের চেষ্টা সুরু হলো; এমন কি, পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সূচনাই সেইখানে। সম্বন্ধটা প্রত্যক্ষ; নানা বাধা বিপত্তি অগ্রগতি পশ্চাদ্‌গতি সত্ত্বেও সম্বন্ধটী প্রত্যক্ষ। কিন্তু সাহিত্যে বা শিল্পে উভয়ের সম্বন্ধটা এতো প্রত্যক্ষ নয়। সম্বন্ধটা সমাজের ঘটনাবিবর্তনের সঙ্গে শিল্পভাবনার নয়, সম্বন্ধটা শিল্পীর মনে। এ কথাটী যে অভ্রান্ত সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কেন না, এলিয়টের মত এর ঠিক বিপরীত। তাঁর মতে honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. কিন্তু কবিতার নানা ভঙ্গী বুঝবার পর সেগুলি এলো কেন সেটী বুঝতে হলেই কবির মনে পৌঁছতে হয়। এই মনটীকে বুঝতে হলে তার পটভূমিকার আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই কারণেই বলতে হয় উভয়ের সম্বন্ধ শিল্পীর মনেই। অর্থাৎ সামাজিক হাওয়াবদল তরঙ্গ তোলে প্রথমে কবিরই

মনে, কবিতায় নয়। কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, কি একই কবির বিভিন্ন মানসিক সংস্থান অনুসারে, একই সামাজিক ঘটনার চাপে বিভিন্ন কাব্য রচিত হয় তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের তাই একটু বৈচিত্র্য আছে। তাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ়, কিন্তু সংযোগের সঙ্গে বিপ্রয়োগ জড়িত। কিন্তু কখনই একটী আছে অপরটী নেই এমন হয় না, কেন না, শিল্পীর মনে যে সংঘাত পড়লো তার ফলে দুটী জড়িয়ে যায়। সংস্কৃত নৈয়ায়িকেরা দু' ধরণের জড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন—একটী তিলতণ্ডুল ন্যায়, যাকে বেছে আলাদা করা চলে, আর একটী নীরক্ষীর ন্যায়, যাকে আলাদা করা চলে না, মিশ্রণের পর সবটির চেহারাই বদলে যায়। সাহিত্যিকের মনে সমাজ ও সাহিত্যের যে মিলন ঘটে সেটি নীরক্ষীর ন্যায়ের। বিশ্লেষণের মুখে তাকে আলাদা মনে করি কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সাহিত্য ও সমাজের বিপ্রয়োগ শুধু যে এই কারণেই ঘটে তা নয়। একই সামাজিক ঘটনায় উদ্বুদ্ধ কবিমন, এমন কি, একই ভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন কবিমন, বা একটী কবিমনই আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে। একালের হাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে ধাপে পৌঁছেছিলেন ছবিতে সে ধাপে পৌঁছননি, তা সম্ভবতঃ আঙ্গিক পার্থক্যের জন্যই —কোনো সামাজিক ঘটনা-পার্থক্যের জন্য নয়। বিপ্রয়োগের পালা এখানেও শেষ নয়। বিশ্লেষণ চালাতে হলে আরও গভীরে পৌঁছতে হয়, আরও বহু ধাপ এগোতে হয়। আঙ্গিকের জন্য পার্থক্য, অর্থাৎ আঙ্গিক বেছে নেওয়ার পিছনে কবিমনের বৈশিষ্ট্য হেতু যে পার্থক্য, স্বীকার করা গেলো। কিন্তু একটী আঙ্গিকের মধ্যেও নানা উপকরণ আছে যেখানে এই সংযোগের মধ্যে বিপ্রয়োগ, বন্ধনের মধ্যে অবন্ধনের লীলা অস্বীকার করা চলে না। যেমন কবিতা। সম্প্রতি কোনো লেখক দেখিয়েছেন এর মধ্যেও অন্ততঃ নিম্নলিখিত উপকরণগুলি লক্ষণীয়; সেখানেও পার্থক্য ঘটতে পারে : (১) ছন্দ-প্রকৃতি অর্থাৎ অর্থ আর ভাবের সমন্বয়ে উৎপন্ন ভিতরকার একটা গতি ও ধ্বনি

বোধ, (২) যতিবিন্যাসের ফলে সেই ছন্দলীলার বাইরেকার রূপ, (৩) বাক্যধারার গঠন, (৪) শব্দনির্বাচন, (৫) অর্থপ্রাধান্য, আর (৬) ধ্বনির দিক থেকে বাক্যধারায় তাদের বিন্যাস, (৭) ব্যাকরণ নিয়মাবলীর প্রয়োগ-বিশেষত্ব, (৮) অলঙ্কার পদ্ধতি আর (৯) ব্যক্তিগত বা (১০) যুগসুলভ নানা বাহ্যিক ঢঙ বা ভঙ্গিমার ব্যবহার। এর সঙ্গে আরও নানা উপকরণ যোগ করা চলতে পারে। যেমন ব্যঞ্জনার ব্যবহার। শব্দের তির্যক ব্যবহার একালের সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক একটী শব্দের সঙ্গে নানা স্মৃতি জড়িত থাকে, সুতরাং চলতি কথার অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহারও আমাদের মনে নতুন রস জাগায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণ রাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত; দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায় হেলান দিয়ে।" এর সমস্ত ঠাট্টাটুকুই ঐ 'কল্যাণ রাগে' আর 'কেদারা রাগিণী'র অর্থ নিয়ে খেলানোর উপয় নির্ভর করে।

কিন্তু উপকরণের সংখ্যা বাঁধবার চেষ্টা বৃথা। তার শেষ নেই। উপকরণের সংখ্যানির্দ্দেশের চেষ্টাতেই শেষের যুগের সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থগুলির অপমৃত্যু ঘটেছিলো। প্রথম যুগের লেখক দণ্ডী বিশেষ গোলমালের মধ্যে যাননি, তাই বলেছেন "নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্। অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥" কাব্যসম্পদের জন্য স্বাভাবিক প্রতিভাও চাই, বহুনির্মল জ্ঞানও চাই, বারবার অভ্যাসও চাই। দণ্ডী অবশ্য স্পষ্ট বলেননি যে, এগুলি চাই কিন্তু এক সঙ্গেই চাই, তাঁর উক্তি যে খুব গভীর তাও নয়। তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা যে রুগ্ন নয়, বিদগ্ধ না হলেও বিকৃত নয়, সে সম্ভবতঃ তিনি প্রথম যুগের লেখক বলেই। শেষ যুগের সংস্কৃত আলংকারিক জগন্নাথের মতে কবিতার কারণ "কবিগতা কেবলা প্রতিভা" এবং সেই প্রতিভার হেতু হচ্ছে "ক্বচিদ্দেবতামহাপুরুষ

প্রসাদাদিজন্যমদৃষ্টম্। ক্বচিচ্চ বিলক্ষণব্যুৎপত্তিকাব্যকরণাভ্যাসৌ। নতু ত্রয়মেব।" কোথাও বা দেবতা মহাপুরুষের প্রসাদ জন্য অদৃষ্ট, কোথাও বা বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি, কোথাও বা কাব্যকরণের অভ্যাস। কিন্তু "ন তু ত্রয়মেব"—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক একটা কারণই স্বীকার্য, তিনটীর যুগপৎ উপস্থিতি স্বীকার করা চলবে না। যেন, যে কাব্য অদৃষ্টের ফলে রচিত তার মধ্যে শুধুই অদৃষ্ট আছে, কাব্যকরণের কোন অভ্যাসই নেই!

সংস্কৃত কাব্যাদর্শের এই ইতিহাস স্মরণ থাকলে উপকরণের সংখ্যা বাঁধবার বৃথা চেষ্টা কেউ করবেন না। আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধটা টাফ্‌ভেল কেসের সঙ্গে শ্রমিক দলের অভ্যুদয়ের সম্বন্ধের মতো নয়। সম্বন্ধটা সাহিত্যকারের মনের মধ্য দিয়ে, তাই কার্যকারণক্রম ওভাবে নির্দেশ করা চলে না। সংযোগের তলায় বিপ্রয়োগের তরঙ্গ আছে, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আছে। কবিরা যখন রচনা করেন তখন তাঁরা প্রত্যেক ধাপটীর বিচারের পর রচনা করেন না, যাঁরা অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং পরিশ্রমী কবি তাঁরাও নয়। কিন্তু বিশ্লেষণের সময় দেখা যায়, কবিদের মন সজ্ঞানে, কিম্বা অজ্ঞানেও, হাওয়াবদলের সঙ্গে বদলায়। এ শুধু যে বড়ো বড়ো যুগান্তরের বেলায়ই বলা চলে তা-ই নয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। আসল কথা, মেজাজটাকে বিচার করা। কি ভাবে মেজাজ বদলালো, কেনই বা বদলালো, বদলানোর ফলে কি হলো? সাহিত্যের সামাজিক ব্যাখ্যার তা হলে অর্থ দাঁড়ালো এই যে, সাহিত্যের গভীরতর আলোচনা, শিল্পরূপের রূপায়নের ও রূপান্তরণের মৌলিক কারণনির্দেশ। সমাজের একটা ইতিহাস আছে; এবং যেহেতু ইতিহাস বর্তমানের কারণ, বিরোধমুখে বা অন্বয়মুখে, এবং যেহেতু মানুষের মন সবসময়েই তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেইজন্যে সমাজের রূপায়নে ও ভাবের রূপায়নে দীর্ঘকালে এবং নিকটকালেও একটী ঘনিষ্ঠ এবং বিশিষ্ট কার্যকারণসম্বন্ধ থাকে। ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব

ও কবিতার সম্বন্ধ এইখানে ধরা পড়ে। সুতরাং সুদূর দেশের হাওয়া আমাদের মানস-সরোবরে তরঙ্গ তুললে কাব্যহংসকে একটু চঞ্চল হতে হয় বই-কি।

৪

সাহিত্যসৃষ্টির গোড়ার কথাটা বুঝলে অনেক মিছে তর্কের সমাধান সহজ হয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে দুটো বড়ো তর্ক মনে পড়ে। আর্টের চিরন্তনতা নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় আপাততঃ মনে হয়, সাহিত্যে সার্বকালিক বলে কিছু নেই-ই। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তা নয়। কিন্তু যাঁরা নিছক ব্যক্তিবাদী তাঁরা পারিপার্শ্বিককে একেবারেই অস্বীকার করতে চান। এঁদের বলা চলে বিশুদ্ধিবাদী—অর্থাৎ চারপাশের ছোঁয়া থেকে মানুষের 'সার' বস্তুটাকে নিয়ে এঁদের কারবার। কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গাও গঙ্গা আর সাগর দ্বীপেও গঙ্গা, তবু দুই এক নয়। তাদের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগ আছে, কিন্তু বিপ্রয়োগও আছে। নানা তটভূমির আঘাতে যে নানা আবর্ত দেখা দিলো সেগুলিকে অস্বীকার করলে গঙ্গার স্বরূপ বর্ণনা হলো না। বৈজ্ঞানিক বলবেন—উভয় জায়গার জলই এইচ-টু-ও, কিন্তু তাতে রসের ক্রিয়া ধরা পড়ে না। পাথর কেটে যে ক্ষীণ স্রোত তীরবেগে চলে তার সঙ্গে সমতলবাহিনী মন্থরগতি নদীর যোগ থাকলেও তফাৎটাও স্পষ্ট, তার চেহারাটাই বদলে গেছে। সেইজন্যে যুগে যুগে মানুষে মানুষে একটা যোগসূত্র বজায় আছে—আঙ্গিকগুলির কাজই হলো স্থান কালের বন্ধন কাটানো। কিন্তু যোগসূত্রের চারপাশে নানা বৈশিষ্ট্য জড়ানো, নীরক্ষীরের মতো জড়ানো—এমনভাবে জড়ানো যে দুয়ের তফাৎ স্পষ্ট হলেও তা আলাদা করা চলে না। কিন্তু ঐ আঙ্গিকগুলিও তো ঐতিহাসিক ও সামাজিক জালে বাঁধা—এক সঙ্গে তাদের মধ্যেও বন্ধন অবন্ধনের খেলা চলেছে। এ খেলা মনে হয় সাহিত্যের সর্বত্র। অবনীন্দ্রনাথ

লিখেছেন, "একদেশের মানুষে অন্যদেশের মানুষে যেমন একদিক দিয়ে স্বতন্ত্র, তেমনি অন্যদিক দিয়ে এক। সঙ্গীতের চাল দেশকালপাত্র-ভেদে ভিন্ন কিন্তু সঙ্গীতের প্রাণ যেটা সুরের দোলায় দুলছে সেখানে ভেদাভেদ নেই। কালানুগত প্রথা, আচার-বিচার ধরে' সৃষ্টি হয় চাল-চোলের—যেমন বাংলা কীর্তন এবং পশ্চিমের ওস্তাদী গান। এখানে চাল দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে দেখাচ্ছে কিন্তু যখন রসের দিক দিয়ে দেখি তখন বিষয়ের উচ্চ নীচ, চালের রকম-সকম দিয়ে এতে ওতে ভিন্নতা তার হিসেবের খাতার দরকার হয় না। রসটি পাওয়াই হল আসল কাজ কাব্যে শিল্পে সঙ্গীতে এবং মানবজীবনে।"[১] কিন্তু "মানুষের অন্তর অন্যের সঙ্গে মিলতে চায়, ভাব করতে বলে, কিন্তু ভাবের লোকটি সহজে তো খুঁজে পায় না, ফলেই সেখানে একের রুচি অন্যের রুচিতে ভিন্নতা নিয়ে দুটি মানুষ পৃথক।" রস একই, কিন্তু রসবোধ এবং রসের উদ্দীপনা তো একভাবে হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মনে নানা সংস্কার বদ্ধমূল, মন আর চারপাশ একই সঙ্গে জড়ানো, তাতে গঠনই আলাদা হয়ে যায়, তার মধ্যে চিরন্তন আর সাময়িক বলে হিসেবমাফিক আলাদা বিচার করা চলে না। শুধু মানুষের মন নয়, যে আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে রসের উদ্বোধন হয় সে আঙ্গিকগুলিও প্রতীক, অর্থাৎ তার সঙ্গে সামাজিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। এইখানেই তো সাহিত্যকারের চমৎকারিত্ব, এইখানেই সাহিত্যকারের মনের বৈশিষ্ট্য। রসের বাহ্যতম হতে অন্তরতম ধাপের প্রত্যেকটাতেই এই বস্তু ও ব্যক্তি জড়িয়ে আছে, তার মধ্যে সাময়িক ও চিরন্তন জড়িয়ে আছে,—প্রত্যেক ধাপে—প্রত্যেক ক্ষণে এই দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেই কাব্যদীপ্তি চমকে উঠছে, প্রাণের লীলা রূপ ধরছে। তা না হলে আমরা হয় পেতাম যোগলব্ধ জ্ঞান যার মধ্যে "ঐশী" প্রেরণা ছাড়া কিছু আছে বলে স্বীকার করা হয় না, নয় তো দেখা যেতো প্রচারপত্র যার আয়ু

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ২২১ পৃঃ

একদিনের বেশী নয়। সাহিত্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সেইজন্যে কোনও নতুন পদ্ধতির ব্যাখ্যা নয়, সেটী কেবল মানুষের মনকে নিবিড়ভাবে গভীরভাবে সত্য করে দেখা। যাঁরা বলেন, সাহিত্য কেবল বিশুদ্ধ প্রেরণার ব্যাপার তাঁরা মানুষের মনটীকেই অস্বীকার করেন—তার একদিক দেখেন কিন্তু মনের প্রকৃত স্বরূপ ও তার লীলাপদ্ধতি দেখেন না। মানুষের মন সৃষ্টির বেলায় অখণ্ড, সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত মিলিয়ে তার সত্তা, সেখানে একটীকে এই সমগ্রতার মধ্য থেকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা অন্ধের হস্তীদর্শন ছাড়া কিছু নয়। সাহিত্যের প্রকৃতি ঠিক বুঝলে, সে কারণে চিরন্তন বা সাময়িক বলে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ছাতি যাওত ফাটিয়া

আজকালকার বাঙালী এ ভাষায় কথা বলে না কিন্তু তা হলেও এর রসবত্তা অম্লান, কারণ, এর রস আমরা অনুভব করতে পারি। বরং প্রাচীন ভাষার আবরণে এর রস যেন আমাদের কাছে আরও ফুটলো। কিন্তু

ব্যারিষ্টার উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মন্দ্রাজি উড়িয়া শীখ বাঙালি চ দলে দলে॥
এরূপ কত যে মূর্তি সমাগত সভাস্থলে।
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিতে ফতে॥

এ কাব্যাংশটীতে অনুষ্টুপ ছন্দ রসের বাহন হয়নি, বরং হাসিরই উদ্রেক করেছে। প্রাচীন ভঙ্গীই যে রসের বাহন নয়, অর্থাৎ নিছক সার্বকালিক রস বলে কিছু নেই, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ঐ শ্লোক ছন্দকে এ যুগের কানে ভালো লাগাবার জন্যে পরিবর্তিত রূপ দিতে হয়—

অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণী যে দিন
স্নান করি উঠেছিল বসন্তে নবীন ;

বা

রে অচেনা মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?

অথচ রস যে নিছক সাময়িক নয় তারও প্রমাণ বিদ্যাপতির ঐ লাইনটা। রস হচ্ছে মানুষের মনের ব্যাপার। মানুষের মনে যে নানা বিচিত্র ভাবের উদয় হয় সেই ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ দেওয়া এবং ফলে পাঠকচিত্তে রসসৃষ্টি করার কাজেই কাব্য নিযুক্ত হয়ে এসেছে। তাই মানুষের মনের গঠন যেমন নতুন হলো, রসোদ্বোধের পন্থাও নতুন হলো। রামায়ণের বক্তব্য বিরহমিলন কথা, রঘুবংশেরও তাই, উত্তররামচরিতেরও তাই, কিন্তু এক হয়েও তারা এক নয়। তেমনি জবালা-সত্যকাম কাহিনী উপনিষদে আছে আবার রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—এ দুটার স্বাদ বিভিন্ন। সব ট্র্যাজেডির মধ্যেই মৃত্যু থাকে, কিন্তু সেই কারণে গ্রীক লেখকদের পর শেক্‌সপীয়রের আর ট্র্যাজেডি লিখবার দরকার ছিলো না, একথা ভাবাও চলে না। নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মানুষ এক সূত্রে গাঁথা, আবার এক সূতোয় গাঁথা হয়েও সে তফাৎ—এইখানেই কাব্যসৃষ্টির মূল রহস্য ধরা পড়ে। এ হিসেবে রস সাময়িকও নয় চিরন্তনও নয়, অথচ উভয়ই। এইজন্য সংস্কৃত আলংকারিকেরা যখন বলেন সহৃদয়ের রসবোধই সাহিত্যবিচারের মাপকাঠী তখন তার চেয়ে বড়ো কথা একহিসেবে আর কিছু নেই, যদিচ এই 'সহৃদয়' কথাটার অপব্যাখ্যার ফলে সমাজকে অস্বীকার করার চেষ্টা দেখা দিলে সাহিত্যের মূল প্রকৃতিকেই অস্বীকার করা হয়।

ব্যক্তিগত চর্বণাই যদি রসের কারণ না হয়, সামাজিকীকরণ থেকেই রসের উৎপত্তি হয়, তা হলে সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীলের প্রশ্নও অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ এই নয় যে, সাহিত্যে অশ্লীল বলে কিছু নেই। তা নিশ্চয়ই আছে, সাহিত্যের দোহাই দিয়ে পর্নগ্রাফির প্রচলন সমর্থন করা

চলে না। কিন্তু এই যে সমর্থন করা চলে না তার মূলে কোনও নীতির বাঁধন নেই, বাঁধন কেবল শিল্পের। কোনো জিনিষ তখনই অশ্লীল যখন তা রসোদ্রেকে বাধা জন্মায়, সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাষায় যখন সত্ত্বোদ্রেক সম্ভব হয় না। কিন্তু রসোদ্বোধের নির্ভর যেহেতু মনের গঠনের উপরে, সে কারণে শ্লীলতা অশ্লীলতার মাপকাঠি সামাজিক সংস্কার। 'স্তন' কথাটী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অশ্লীল ছিলো না। কিন্তু পশ্চিমী রুচিবোধে ও কথাটীর স্পষ্ট উল্লেখ বোধ হয় বাধে। অন্ততঃ মাদাম বোভারী লেখার জন্য যখন লেখক অভিযুক্ত হয়েছিলেন তখন স্তন-বর্ণনা তাঁর অন্যতম দোষ বলে অভিযোগ করা হয়েছিলো। এ শুধু শব্দের বেলায় নয়, ব্যঞ্জনার বেলায়, বর্ণনার বেলায়, জীবনের চালচলনে, সর্বত্রই। সুতরাং খাঁটি সাহিত্য হলে তার মধ্যে অশ্লীলতা থাকা সম্ভব নয় এবং যাঁরা প্রকৃত শিল্পী তাঁরা অশ্লীল শিল্প সৃষ্টিই করতে পারেন না—সৃষ্টি করলে সেটীর শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছনো সম্ভব নয়। দেশভেদে কালভেদে ব্যক্তিভেদে এই আদর্শ কিছু কিছু বদলায় কেন না, সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধই তাই। এই কারণে কাব্যাদর্শে সাহিত্যের বিষয়বস্তু বলে কোনো আলাদা অধ্যায়ের দরকার নেই, যে কোনো বিষয়বস্তুই সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে যদি সাহিত্যিক তা হতে রস আদায় করতে পারেন। 'আধুনিক' সাহিত্য রচনার বেলাতেও একথা প্রযোজ্য, কারণ কবিগুণে এরোপ্লেন সম্বন্ধীয় কাব্য অপেক্ষা গোলাপ সম্বন্ধীয় কাব্যও বেশী আধুনিক হতে পারে, অর্থাৎ তার মধ্যে এ কালের মানসিক স্পন্দন আরো ভালোভাবে ধরা পড়তে পারে। রুচিবোধে সংস্কারের প্রাবল্যও এখানে ধরা পড়ে। যে তিনটী তর্কের উল্লেখ করলাম সেগুলির প্রকৃত সমাধান সেকারণে ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব ও কবিতার সুষ্ঠু সম্মিলনে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা

ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনার পর হতে বাংলা কাব্যের যে অসাধারণ বিকাশ দেখা গিয়েছে, অন্য কোনও ভারতীয় সাহিত্যে তা সম্ভবতঃ হয়নি। এর কতকগুলি কারণ আছে। আর এই বিকাশের যে বৈচিত্র্য আছে তারও কতকগুলি কারণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হতে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কৃতী শিল্পীদের রচনা আলোচনা করলে দেখা যায়, এর বিবর্তন একটা বিশিষ্ট রীতিতে হয়ে এসেছে। অতিসহজতার অপবাদ সত্ত্বেও বলা চলতে পারে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানতঃ বাংলা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্ম, উত্থান ও বিকাশের ইতিহাস। সংক্ষেপে উল্লেখ করা চলতে পারে, মধ্যবিত্ত সমাজের জন্মের প্রথম উচ্ছ্বাস মাইকেলের কাব্যে কল্লোলিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দুটী বিপরীত ভাবধারার বুদ্ধিগত মিলনের চেষ্টা আছে। তাই একদিকে আছে বৈদেশিক অনুকরণের প্রতি উপহাস, অন্যদিকে বুদ্ধির সাহায্যে নতুন ধর্ম সৃষ্টির চেষ্টা। কিন্তু সমাজকে তিনি বড় করতে চেয়েছিলেন সমাজবিবর্তনের মৌলিক প্রকৃতি বুঝে নয়, চিত্তবৃত্তির মধ্য দিয়ে। আশা ছিলো, এ সমাজের যেটুকু ভালো পশ্চিমা সমাজের যেটুকু ভালো এই দুই ভালোর সমন্বয় ঘটিয়ে একটী সুস্থ সমাজ গড়তে পারা যাবে। কিন্তু সমাজবিবর্তনের পথে শ্রেণীসংগ্রাম যখন তীব্রতর হয়ে উঠলো তখন দেখা গেলো, এ ধরণের সংঘর্ষহীন সমন্বয় সম্ভব নয়, স্থায়ী সমাধানে পৌঁছতে হলে সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই পৌঁছতে হবে। এই রকমের প্রথম সংঘর্ষ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। তার একটী বিশেষত্ব ছিলো। প্রথম স্পষ্ট আঘাত যখন জাতির উপর পড়লো তখন সে আঘাত বাইরে থেকে এলো এবং তার ফলে জাতির সমস্ত শ্রেণীই এক হয়ে বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলো। বিবাদ বহিঃশত্রুর সঙ্গে, ভেতরের

কলহ চাপা ছিলো। এইজন্যে সে যুগের সাহিত্যে এতো 'ভাই' 'ভাই' রব। সংহতির চেষ্টা যেন অস্বাভাবিক বেশী। এই সংহতির মুখে রবীন্দ্রনাথের উদয় আকস্মিক ঘটনা নয়, তাঁর কাব্যের সঙ্গে এই সামাজিক ও মানসিক হাওয়ার নিবিড় যোগ আছে। কালক্রমে দেখা গেলো সংঘর্ষ শুধু বাইরের সঙ্গে নয়, ভেতরেও। সে দিক্‌টাকে উপেক্ষা করলে অসাফল্য নিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক্ রাখিয়া যদি হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে···একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল।" (কালান্তর, ৩২ পৃষ্ঠা) প্রথম অসহযোগ আন্দোলন সর্বাঙ্গীন আন্দোলন নয়, নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন। সংঘর্ষ তীব্রতর; সুতরাং রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য অপর সব কিছুই বিসর্জন দিতে হবে। টেক্‌নিক্ ক্রমশঃ ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠ্‌ছে। তারপর দেখা গেলো হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষ, অভ্যন্তরীণ কলহ প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। ভাঙনের ধারা বাড়তে বাড়তে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে এই আলোড়নে শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা সংকটজনক, মানসিক পরিমণ্ডলে নেতিবাদ বাড়ছে। অতি-আধুনিক বাংলা কাব্যে যে ভাব, ভাষা, বলার ভঙ্গী, ছন্দ, উপমা দেখা যাচ্ছে সেটাও আকস্মিক ঘটনা নয়, এরকম ভাঙন কি অবস্থায় সম্ভব এবং স্বাভাবিক সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

বাংলা সাহিত্যের বড়ো বড়ো যুগবিভাগগুলির সঙ্গে সামাজিক বিবর্তনের যোগ সুস্পষ্ট। এর বিস্তৃত আলোচনার স্থান অন্যত্র,[১] কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে দেখা যাবে, বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা বুঝতে হলে দুটী জিনিষের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম,

১। দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আঠারো শতকের মধ্যভাগ হতে এপর্যন্ত এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস কি, বৈশিষ্ট্যই বা কি? দ্বিতীয়তঃ, বাংলা দেশে এর কোনও বিশেষত্ব আছে কি না, অন্ততঃ অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলার এমন কোনও পার্থক্য আছে কি না যার ফলে বাংলা সাহিত্যের এরকম প্রসার সম্ভব হয়েছিলো? এগুলি হতে বাংলা কাব্যের পটভূমিকা বোঝা যায়, বোঝা যায় কি হাওয়া-বদল হতে সৃষ্টিবদল সম্ভব হলো, দুয়ের সম্বন্ধ কি।

২

ভারতবর্ষের সমাজবিবর্তনের কথা আলোচনা করতে হলে একটী কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার। সেটী তার রাজনৈতিক অধীনতা। পূর্বে বাইরে থেকে আঘাত এসেছিলো, কিন্তু তার প্রভাব এ ধরণের নয়। মুসলমান বিজয়ের পর আমাদের দেশে পরিবর্তন দেখা গেলো, কিন্তু সে পরিবর্তনও এ তুলনায় অল্প। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়।...এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চির প্রথার সঙ্গে আর এক চির প্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি।... বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোর লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলেনি। তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান, হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকের দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা ভাঙাভাঙি চলেছিলো কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি যাতে বাহিরের

বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হোতে পারে। সেই জন্যে পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।" (কালান্তর ২-৩ পৃষ্ঠা)।

পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আসর বজায় থাকায় কতকগুলি ফল ফলেছে। সেকালে এই যে বিভিন্ন শ্রেণী স্নেহের বাঁধনে চণ্ডীমণ্ডপের আসরে বাঁধা ছিলো, তার অর্থনৈতিক ইঙ্গিত হচ্ছে তখনও শ্রেণীসংগ্রাম প্রবল হয় নি, সংঘর্ষ তীব্র নয়। পশ্চিমী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ হচ্ছে মানুষের অধীনতা মানুষের কাছে, বস্তুর কাছে নয়। এখানে যে সামন্ততন্ত্র ছিলো, পশ্চিমী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তার প্রধানতঃ সাদৃশ্য থাকলেও কতকগুলি পার্থক্যও ছিলো। দেশের সুদূরবিস্তৃতি (এবং সেকালে বহির্বাণিজ্য) এবং জীবনযাত্রার সরলতার ফলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, মানুষের কাছে মানুষের অধীনতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তার আসল রূপ চাপা দেওয়ার চেষ্টা ছিলো। সেইজন্যেই আমাদের সভ্যতার কেন্দ্র গ্রামেই রয়ে গেলো, আমাদের আসর চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে বৈঠকখানায় পৌঁছলো না। নগর সভ্যতার নাড়ীছেঁড়া টান তখন অনুভব করা যায় নি। একেই মার্কস বলেছেন—"We must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of Oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies."[২] যে জীবনযাত্রায় আমরা অভ্যস্ত

২। *Marx and Engels on India :* edited by Mulk Raj Anand (Socialist Book Club, Allahabad).

ছিলাম, বিশেষ কতকগুলি সামাজিক ঘটনার ফলেই সেটা বজায় ছিলো। কিন্তু তাতে নতুন আঘাত লাগলো ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কথায় "মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারেনি।" আমরা প্রথম অনুভব করলাম, এই সভ্যতার এমন একটা শক্তি আছে, যে শক্তি এই আবহাওয়ায় এদেশের মতো হতে চায় না, তার স্বকীয়তা বজায় রাখে এবং সেই স্বকীয়তার জোরে আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চায়। সমাজতাত্ত্বিকের কথায় এর historical energies আছে, সেইজন্যই তার এই জোর। আবার মার্কসের কথায় বলতে হয়, Arabs, Turks, Tartars, Moguls, who had successively overrun India, soon became Hinduised, the barbarian conquerors being, by the eternal law of history, conquered themselves by the superior civilisation of their subjects. The British were the first conquerors superior, and therefore inaccessible to Hindu civilisation. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry and by levelling all that was great and elevated in the native society. সেইজন্য যে পশ্চিমী সভ্যতার দূত হয়ে ইংরেজ এসেছিলো সে সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সভ্যতার একেবারে মৌলিক পার্থক্য। প্রথম যুগে আমরা এর চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু যখন দেখা গেলো যে, ও সভ্যতার বাণী পুঁথিতে লেখা থাকলেও রাজ্যশাসনে অচল তখন আহত আত্মাভিমানে আমরা বলতে চেয়েছিলাম, "তোমরা কি এতই শ্রেষ্ঠ। তোমরা না হয় কল চালাইতে ও কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা

আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর।"৩ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা দুর্বলের কথা, "দরিদ্র বঞ্চিত মানব এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।" কিন্তু মনে রাখতে হবে এদেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতাও সেই নবাগত সভ্যতাকে গ্রাস করতে পারে নি, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে আলোড়ন দেখা দিলো তার ফলে এই প্রাচীন সভ্যতারই সংকটকাল ঘনিয়ে এলো। এতকাল নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও সামাজিক কাঠামোর কোনও সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন সম্ভবতঃ হয়নি, কিন্তু এইবার এই সভ্যতার সংঘাতে এক নতুন পরিবেশ গড়ে উঠলো।

কর্নওয়ালিস যখন এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন সে সময়ে দেশে কয়েকটা বড়ো শ্রেণী ঃ একদিকে জমিদারেরা, অপর দিকে চাষীরা এবং শিল্পীরা, আর একদিকে ব্যবসায়ীরা এবং অন্যান্য কয়েকটী শ্রেণী ছিল। এদের মধ্যে যদিও জমিদারেরই প্রাধান্য, তবুও সেকালের সমাজ নিছক সামন্ততন্ত্র বলা যায় না। জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ সামন্তবংশের ধ্বংসাবশেষ হলেও তাঁদের অনেকেই হঠাৎ-বড়লোক, প্রজার সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে যে সম্বন্ধ থাকলে বা থাকা সম্ভব হলে সামন্ততন্ত্র ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় তার অনেকগুলিই সে সময় ছিলো না। অন্য দিকে চাষীদের কোনও শ্রেণীগত চেহারা প্রবল নয়, আর শিল্পী বা ব্যবসায়ীরা সেই সমাজে ভাঙন ধরানো দূরের কথা সেই সমাজেরই অন্তর্গত ছিলেন; শিল্প তখনও গৃহপালিত। সেইজন্য তখন ঐতিহাসিক প্রেরণা জাগানো ইংরেজের পক্ষে সহজ হয়েছিলো, বিশেষতঃ তাদের তখন শিল্প-বিপ্লব ও সাম্রাজ্যিক প্রসারের নতুন উৎসাহ। কিন্তু যেহেতু অধীন দেশের নিছক লালনপ্রবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কোনোকালেই সম্ভব নয়, তাই গোড়া হতেই লুণ্ঠনপ্রবৃত্তিই প্রবল। প্রথম যুগে লোভ নির্লজ্জ; এর দ্বিবিধ প্রকাশ

৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা

—একদিকে শিল্পের ধ্বংসসাধন, অন্যদিকে চাষ ছেড়ে চাষীর উপর নজর। এই দ্বিতীয় কাজে সহায়তা করেছিলেন হঠাৎ-বড়লোকেরা। মার্কস লিখেছেন, এসিয়ার চিরাচরিত রাজ্যশাসন পদ্ধতির তিনটী প্রধান কাজঃ অর্থ সংগ্রহ, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জনসেবা। ইংরেজেরা প্রথম দুটী গ্রহণ করলেও তৃতীয়টীকে অস্বীকার করেছিলেন, তারই ফলে সে সময় দেশের চরম দুরবস্থা।[৪] এ দুরবস্থা থেকে উদ্ধারেরও কোনও উপায় ছিল না, কারণ যে আঘাত এসে লাগলো তাতে আলোড়ন বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ গভীরতর হতে লাগলো। হেস্টিংস সেই কারণে যে অত্যাচার করেছিলেন, কর্নওয়ালিস তা করলেন না, দেখা গেলো একটু ধীরে কাজ করাই শ্রেয়ঃ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়সেইজন্য চাষের উন্নতির আশা কর্তৃপক্ষের ক্ষীণভাবে

৪। "There have been in Asia, generally, from immemorial times, but three departments of government, that of finance, or the plunder of the interior, that of war, or the plunder of the exterior ; and finally the department of public works, climate and territorial conditions, especially the vast tracts of desert, extending from Sahara, through Arabia, Persia, India & Tartary, to the most elevated Asiatic high lands constituted artificial irrigation by canals and water works, the basis of Oriental agriculture. • • • Now, the British in East India accepted from their predecessors the departments of finance and of war, but they have neglected entirely that of public works. Hence the deterioration of an agriculture which is not capable of being conducted on the British principle of free competition, of *laissez-faire* and *laissez-aller*. But in Asiatic empires we are quite accustomed to see agriculture deteriorating under one government and reviving again under some other government. • • • Thus the oppression and neglect of agriculture, bad as it is, could not be looked upon as the final blow dealt to Indian society by the British intruder, had it not been

ছিলো। কিন্তু জগতের ইতিহাসে চাষের প্রকৃত উন্নতির ভার রাষ্ট্র বা চাষীর উপরেই পরিণামে পড়ে। বিশেষতঃ এখানকার বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে চাষের উন্নতির অধিকার বা অবস্থা কোনোটাই চাষাদের না থাকলেও জমিদারদেরও চাষের উন্নতির উপায় বা ইচ্ছা ছিলো না। ঐতিহাসিক বিচারে তার এ ক্ষমতা থাকা সম্ভবও নয়, কেন না এ জমিদারতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র নয়, স্বদেশীয় শিল্পবিপ্লব ঠেকাবার জন্যই সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে এর জন্ম। এ গোড়া হতেই বিকলাঙ্গ। সেইজন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুটো ফল ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। একদিকে গৃহশিল্পের বিনাশ, অপর দিকে চাষের দুরবস্থা এবং চাষীরও ক্রমিক দুরবস্থা। প্রথম যুগে জমিদারদেরও দুরবস্থা, তারপরে তাঁদের সমৃদ্ধি। ইংরেজ সাম্রাজ্যের এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটা ফল বাঙালা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। বলা বাহুল্য, বুর্জোয়া অর্থে মধ্যবিত্ত এঁরা নন, এঁরা আমাদের ঘরোয়া অর্থে মধ্যবিত্ত। বিকলাঙ্গ সমাজের এই অঙ্গটা এদেশে বড়ো হয়ে উঠ্‌লো, এমন কি সমাজবিবর্তনে যে স্থান ধনিক সম্প্রদায়ের অধিকার করা উচিত ছিলো, এদেশে সে স্থান বহুপরিমাণে অধিকার করলে মধ্যবিত্ত সমাজ। বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগ এই মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম ও বৃদ্ধির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কেন না সমাজে যে প্রাণস্পন্দনের ফলে নতুন সাহিত্য সম্ভব, মধ্যবিত্ত সমাজে সেই প্রেরণা ছিলো।

attended by a circumstance of quite different importance, a novelty in the annals of the Asiatic world. However changing the political aspect of India's past must appear, its social condition has remained unaltered since its remotest antiquity, until the first decennium of the nineteenth century. · · British steam and science uprooted, over the whole surface of Hindusthan, the union between agricultural and manufacturing industry."—Karl Marx.

৩

পূর্বে বলেছি, বাংলার সমাজবিবর্তনের সব চেয়ে বড়ো কথা পরাধীনতা। কথাটা অতিরঞ্জিত মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তার প্রমাণ এই মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব। সমাজবিবর্তনের সাধারণ নিয়মে দেখা যায় ধনতন্ত্র প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাঁদের মধ্যবিত্ত বলি তাঁদের অবস্থা সংকট হয়ে ওঠে। তাঁদের স্বকীয় পদবী হতে শ্রমিক পর্যায়ে অবনতি ধনতন্ত্রের প্রসারের অনিবার্য ফল। সে সময়ে এঁদের প্রথমে চেষ্টা হয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম চরমে পৌঁছবার পূর্বেই এঁরা শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হতে বাধ্য হন। বরং শ্রমিক বিপ্লবের গোড়ায় শ্রমিকদের পরিবর্তে এঁরাই সে বিপ্লবে নেতৃত্ব করেন। কাজেই যেখানে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হয় সেখানে বাঙালী অর্থে যাঁরা মধ্যবিত্ত তাঁদের নেতৃত্ব আশা করা চলে না। ধনিকতন্ত্রে নেতৃত্ব ধনিকের, শ্রমিকতন্ত্রে শ্রমিকের,—এঁরা ত্রিশঙ্কুর মতো দোটানায় ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু ভারতবর্ষে বিপরীত ব্যাপার। এদেশে এখনো ধনিকতন্ত্রই দেখা দেয়নি, অথচ শ্রমিক বিপ্লবের কিছু কিছু সূচনা দেখা যাচ্ছে। এখনো ভূমিজ প্রভাবই কাটলো না, অথচ শ্রমিক বিপ্লব! মনে হয় এখানকার অবস্থা পুঁথিগত কাঠামোর বাইরে। আবার নেতৃত্ব যে এই দুই-এক বছরের জন্য নয় দেড়শো বছর ধরে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে, এও পুঁথিগত কাঠামোর বাইরে, কেন না কর্নওয়ালিসের সময়েই যদি প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের শেষ অবস্থা তাহলে তারপরে ধনিকতন্ত্র এবং ধনিক-নেতৃত্ব আশা করাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, মধ্যবিত্ত-নেতৃত্ব নয়। কিন্তু তা ঘটলো না। এর কারণ রাজনৈতিক অধীনতা। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা'র ধারণা আত্মপ্রসাদের অনুকূল হলেও প্রকৃত সত্য নয়। আর কোনো সাম্রাজ্যবাদই অধীন দেশকে স্বাধীনতা দেয় না, অন্ততঃ ডি-কলোনিজেশন তত্ত্ব সে হিসেবে একেবারেই নিরর্থক। সেইজন্য সেকালেই যে এদেশের

ভৌমিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈদেশিক শক্তি সখ্যবন্ধনে বাঁধা পড়লেন সে কেবল এদেশী ধনিকতন্ত্রের জন্মনিরোধের জন্যে। এর তিনটী ফল ফলেছিলো। প্রথমতঃ, যে ভৌমিক সম্প্রদায় গড়ে উঠলো তার স্বকীয় কোনো ঐতিহাসিক সার্থকতা নেই, কোনও ঐতিহাসিক প্রেরণাও নেই। সে কেবল সৌখিন লতার মতো পরের ছায়ার আশ্রয়ে শোভাবর্ধন করেছে। অবশ্য তাতে দুই-একটা ফুল ফোটে, এতেও ফুটেছিলো, কিন্তু সেটা প্রাসঙ্গিক, মৌলিক নয়। দ্বিতীয়তঃ দেখা গেলো, বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে দেশী ভূমিজ সম্প্রদায়ের সন্ধির ফলে স্বদেশী ধনতন্ত্রের জন্ম হলো না। কিছুদিন পরে ইতস্ততঃ দুই-একটী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ধনিকতন্ত্রের সৃষ্টি হলো না। সে জন্ম হতেই বিকলাঙ্গ। তৃতীয় ফল দেখা গেলো, ভৌমিক সম্প্রদায় বা যেটুকু ধনিক সম্প্রদায় ছিলো কারোরই হাতে সমাজ-নেতৃত্ব এলো না, সমাজনেতা হয়ে দাঁড়ালেন মধ্যবিত্ত। এবং এই মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভবের জন্যও দায়ী ঐ ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন। এই তিনটী ফল ইংরেজ সাম্রাজ্যের দান; এই কারণে আমাদের সমাজবিবর্তনের ধারা গোড়া হতেই একটী বিশিষ্ট খাতে বইলো। তার গতি কুটিল, ফিনান্স-ক্যাপিটালের বাধায় তার প্রসার সহজ হতে পারে নি।

আমাদের এই সমাজবিবর্তনের প্রথম যুগের কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, বৈদেশিক মূলধন তিনটী ক্রমিক পর্যায়ে এদেশে দৃঢ় আসন সংগ্রহ করেছিলো। প্রথম যুগে বৈদেশিক মূলধনের কাজ ছিলো এদেশের গৃহশিল্পগুলির ধ্বংসসাধন। এই যুগে দেখা গেলো যাঁরা ছোটো ছোটো ব্যবসার স্বাধীন মালিক ছিলেন তাঁরা তাঁদের ভূতপূর্ব শত্রুর সঙ্গে মিলিত হতে দ্বিধা বোধ করেন নি, স্বাধীন ব্যবসার পরিবর্তে তাঁরা অধীনতা স্বীকার করতে ক্রমশঃ অকুণ্ঠ। এ যুগে কেবল ভাঙন এবং দিক্‌পরিবর্তন চলেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ঠিক দেখা দেয় নি, নতুন জমিদার সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ভাঙছে, তার সভ্যেরা নিরুপায়, কিন্তু ছোটো গৃহশিল্পের মালিকেরা

চাকরি নিতে উদ্যত। সেকালের চিঠিপত্রে রিপোর্টে এর প্রচুর পরিচয় মেলে।[৫] তারপরে দ্বিতীয় যুগ দেখা দিলো,—এ সময় বৈদেশিক মূলধন শুধু ভাঙনের কাজেই নিঃশেষিত নয়, ক্রমশঃ ক্রমশঃ আপন আপন প্রাধান্য দৃঢ় করছে। এই সময়েই হেস্টিংস যে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করেছিলেন তার একটা অর্থ ছিলো। দেখা যায়, সে সময় হতেই বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ এদেশে ক্রমশঃ বাড়তে স্বরু করেছে।

৫। জমিদারদের অবস্থা ও তার বর্ণনা Fifth Report-এ মেলে। সে যুগের কোম্পানীর ডাইরেক্টররাও তাঁদের কর্মচারীদের ব্যবহার সহ্য করতে পারেন নি। সে যাই হোক, বর্ণনাটী হতে লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ক্রমশঃ একেবারে উৎখাত হয়েছে। "The disapprobation of the Court had been excited by the frequent changes which had marked the financial system of their Government of Bengal, and they expressed their preference of a steady adherence to almost any one system, attended with watchful superintendence. They censured the attempts that had been made to increase the assessment of revenue, whereby the zamindars (or hereditary Superintendents of land) had been taxed, to make room for the introduction of farmers sezauls, and aumeens, who having no permanent interest in the lands, had drained the country of its resources." *Fifth Report, Firminger's edition (Madras Reprint of 1883)*, vol. I, p. 14.

আর ব্যবসায়ীদের অবস্থা এই রকম দাঁড়ালো :—Under such conditions, the position of the merchants became precarious. When they discovered that their fortunes were liable to violent fluctuations they hesitated to continue as independent merchants bargaining with customers always possessing the upperhand. They preferred to become salaried agents of the company, which position gave them greater security; and thus developed the 'gomostah' system, the gomostah being an agent. The gomostah as an independent merchant was hitherto on the supply side along with the weaver

সে সময় এই যে প্রসার দেখা দিয়েছিলো সেই প্রসারেই আমাদের বর্তমান সমাজের গোড়া পত্তন। একদিকে একটা নতুন জমিদার সম্প্রদায় গড়ে উঠলো, কিন্তু সমাজনেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা তার নেই। অন্যদিকে শিল্পী ও চাষীদের অধিকার[৬] ক্রমশঃ খর্ব হয়ে এলো। কিন্তু মাঝ হতে যে বুদ্ধিজীবীর দল গড়ে উঠলো তাদের নেতৃত্ব অস্বীকার করার আর উপায় রইলো না।

and shared with him the oppression from the demand side. Now that he made his position by joining the latter, the burden of tyranny fell completely upon the weaver."—*The Structural Basis of Indian Economy* by H. Venkatasubbiah, p. 94.

তারপর যখন দ্বিতীয় যুগ এলো তখন এই 'গোমস্তা' দলের পরিবর্তে কোম্পানী নিজেই লাভের বৃহত্তর অংশের দাবী জানালো।

This state of affairs gave an opportunity for a further and more direct domination of the industries. When Hastings was appointed to Madras in 1771, he sought to improve matters and gave powers to the ware-house-keeper to check the high-handedness of the 'gomostah'. He was allowed a share in the profits of the commission for the trouble. The ware-house-keeper, being the company's own man, and having the gomostah under his authority, became practically the director of the industries . . . "The rendering secure the course and circulation of the merchant's trade was indeed the central object of Hastings' scheme ; the *course* of the trade of the merchants was mainly towards the Company, and the *circulation* between the factory, themselves and the Company." —Venkatasubbiah, pp. 96-97.

৬। চাষীদের অধিকার কি ছিলো এবং কি ভাবে নষ্ট করা হলো তার বিস্তৃত বিবরণ Bengal Land Revenue Commission-এ আমার লিখিত সাক্ষ্য দেবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা পূর্বে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার অন্যতম কারণ এইটা। ইংরেজ সাম্রাজ্য যেমন যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরাই শাসন ব্যবস্থার বনেদ শক্ত করেছে সিমলা হতে শিলচর পর্যন্ত। যখন এই সব প্রদেশ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ফিরলো তখন বাঙালী মধ্যবিত্ত, বিশেষতঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত, বহুদূর অগ্রসর। সেইজন্যে বাঙালীর নায়কত্ব স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় রইলো না। এমন কি সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত দেখি একই ধারা চলেছে। সিপাহীবিদ্রোহকে অনেক সময়ে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা হয়। কথাটা এক হিসেবে সত্যি, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যি নয়। আসল ব্যাপার, একটা বিজিত জাতের অর্থসম্পত্তিশালীরা অপর একটা জাতের অধীনতা স্বীকার করতে চাইছিলেন না। বৈদেশিক শক্তির চোখে এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু শ্রমিক-বিপ্লব বা শ্রেণী অত্যাচারের অবসানের ক্ষীণতম আভাসও এর মধ্যে ছিলো না। মজার কথা, এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব বাংলার হাতে ছিল না, নানাসাহেব, কুঁয়র সিং হতে স্বরু করে নানা অবাঙালীর নাম এই উপলক্ষ্যে বার বার শোনা গেছে। কিন্তু বাংলার নবগঠিত শ্রেণীগুলি তাঁদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। তখনও সহযোগিতার পরাকাষ্ঠা। তখনও রাষ্ট্রে আবেদন-নিবেদনের পালা চলেছে, সমাজ ও সাহিত্যে বিদেশী আবহাওয়া আমদানির চেষ্টা উদগ্র।

এর পরে তৃতীয় যুগ দেখা দিলো। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈদেশিক ধনতন্ত্রের সঙ্গে দেশী ধনতন্ত্রের কিছু কিছু বিরোধ—অর্থাৎ দেশী ধনতন্ত্র সামান্য দেখা দিতে স্বরু করেছে। অন্ততঃ ধনতন্ত্র না গড়ে উঠলেও দেশী ধনিক দুই একজন দেখা যাচ্ছে। গত শতকের মাঝামাঝি বাঙালীর ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড মোড় ফেরার চিহ্ন আছে। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত জমিদারদের স্বপক্ষে সরকারকে সচেষ্ট হতে হয়েছিলো, কেন না নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা জমিদারদের

সম্পূর্ণ ছিলো না। আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী সাহায্যে দরকার হয়নি, কারণ সেকালের অর্থনৈতিক ঘটনা-সংস্থানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রসার স্বাভাবিক। কিন্তু ১৮৬৫ সালে গ্রেট্ রেণ্ট কেসের পর ইংরেজ শাসকদের সুর ফিরলো। বোঝা গেলো ১৭৯৩ সালে স্থায়ী শোষণের জন্যে জমিদারদের সঙ্গে সন্ধির যদি দরকার হয়ে থাকে ঠিক সেই কারণেই এখন আর জমিদারদের অন্ধভাবে সাহায্য করা চলবে না—তাতে পরিণামে ক্ষতি ইংরেজেরই। কিন্তু যে সময় চাষীদের জন্য একটু দরদ দেখানোর আগ্রহ যেমন দেখা গিয়েছিলো, তেমনি অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য সরকারের প্রাণ কাঁদেনি। অথচ সেই সময় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রথম প্রসার বন্ধ হয়ে এসেছে, ফলে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আশ্রয় ছেড়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা এর অন্যতম লক্ষণ ইংরেজ যেমন চাষীদের বাঁচাবার চেষ্টা—অবশ্য নিজের স্বার্থেই—যেটুকু করেছিলো, মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য সেটুকু করলে হয়তো রাজনৈতিক আন্দোলন বিলম্বিত হতে পারতো। কিন্তু এর পরিবর্তে ইংরেজ মুসলমানের শরণাপন্ন হলো। আমাদের সমাজবিবর্তনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বস্তুতঃ একটা অর্থনৈতিক শ্রেণী হলেও তার মধ্যে কতকগুলি কারণে হিন্দুরই প্রাধান্য। ১৮৯২ সালের আইন অনুসারে বিভিন্ন জেলার মিউনিসিপ্যালিটাগুলি কেন্দ্রীয় আইন সভার সভ্যের জন্য যে তেতাল্লিশটা নাম প্রস্তাব করেছিলো তার মধ্যে চল্লিশ জন ব্যারিস্টার।[৭] স্পষ্টতঃই মধ্যবিত্ত (যদিও উচ্চ মধ্যবিত্ত) সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই ভারতবর্ষে আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো। সে যুগের কংগ্রেস আন্দোলন তখনও গণ-আন্দোলন নয়,

৭। Krishna: *The Problem of Minorities* (Allen and Unwin), p.80.

মার্কসের ভাষায় সেটা movements of minorities in the interest of minorities. কিন্তু সেই সময় হতেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রথম বেসুরো বুলি সুরু। সেইজন্যে যখন সরকারের প্রয়োজন হলো পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলির প্রাধান্য খর্ব করার, তখন এক সার্কুলার জারী হলো (১৯০৭ সাল, ২৪শে আগস্ট) এবং তাতে প্রস্তাব করা হলো "জমিদার এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি" বাড়ানো হোক্। "জমিদার এবং মুসলমান সম্প্রদায়"—দুজনে সমগোত্রীয়; মুসলমান সম্প্রদায়কে একটা ধর্মসম্প্রদায় বলে স্বীকার করার দায় তখনও সরকারের ছিলো না—তখনও তাঁদের অর্থনৈতিক চেহারার উপরই ঝোঁক বেশী দেওয়া হয়েছিলো জমিদারদের গোত্রভুক্ত করে। আর এই অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা বুঝেই সে সময় ওদিকে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ সরকারী সহযোগিতার নীতি প্রচার করেছেন। এই কারণেই এ যুগে মধ্যবিত্ত সমাজে হিন্দু-মুসলমান ফাটল দেখা দিলো। ফলে মূলতঃ যেটা অর্থনৈতিক সমস্যা তার চেহারা বদল হয়ে দেখা দিলো সাম্প্রদায়িকতা। তা না হলে লর্ড মিণ্টোর আশীর্বাদে জন্মগ্রহণ করলেও মুসলিম লীগের শিকড় বিস্তার সম্ভব ছিল না, যদি না তার মাটী প্রস্তুত থাকতো। বাংলার এই সমাজবিন্যাস বাংলার অর্থ-নৈতিক সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই অর্থনৈতিক সঙ্কোচনের ফলে বাংলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন হিন্দু মধ্যবিত্তের দল এবং অন্য সেই সব শ্রেণী যাঁরা ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি, এবং ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি বলেই বরাবর রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রীতিপ্রদ হয়নি, এর নানা প্রমাণ আছে। পূর্ববঙ্গ আলাদা থাকলে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেরকম দ্রুত প্রসার সম্ভব হতো, সম্মিলিত বাংলায় হিন্দু মধ্যবিত্তের সংঘর্ষে সে দ্রুতগতি হয়তো সম্ভব হয়নি। এই কথা মুসলমান শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা কমিটীর মন্তব্যে এবং নানা মুসলমান লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। তবুও প্রথম আঘাত যে সময় জাতির হৃদয়ে লাগলো

সে সময় ভাবাবেগ এতো উদ্বেলিত যে স্বার্থের ক্ষতি বুঝেও মুসলমান সম্প্রদায় বর্তমানের মতো সেকালের আন্দোলনে বাধা দেননি। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক কারণেই ফাটল বৃহত্তর হয়ে উঠলো। সম্মিলিত বাংলাতেও মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশঃ শিক্ষিত হয়ে উঠলো এবং পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ে যে যে নতুন শ্রেণী বহুদিন পূর্বে গড়ে উঠেছিলো তার অনুরূপ শ্রেণী মুসলমান সম্প্রদায়েও গড়ে উঠলো। ফলে যে যে জীবিকায় হিন্দুদের এবং বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্তের একাধিপত্য ছিলো সে আধিপত্য আর রইলো না। এর দুটী সুদূরপ্রসারী ফল দেখা দিলো। প্রথমতঃ বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা —যদিও সেটী মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা—জটিলতর হয়ে উঠলো, এবং, দ্বিতীয়তঃ, অপর প্রদেশের সঙ্গে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মিল সুদূরপরাহত হয়ে উঠলো, কেন না অন্য প্রদেশগুলি সামাজিক বিবর্তনের এ পর্যায়ে তখনও পৌঁছয় নি।

বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাস উল্লেখ করার কারণ বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শুধু যে সাহিত্যকারেরা বহু সময়েই আর্থিক বা বুদ্ধিগতভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন সেজন্য নয়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন আমাদের সামাজিক হাওয়াবদলের মাপকাঠি। সেই কারণে এ দুয়ের সম্বন্ধ শুধু প্রত্যক্ষ নয়, আরও ব্যাপক, গভীর এবং সূক্ষ্ম। পূর্বেই বলেছি, এ পর্যন্ত আমরা সাহিত্যের যে বিভিন্ন তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছি সে তরঙ্গের মধ্যে একটী যোগসূত্র আছে। এই বিভিন্ন তরঙ্গে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এগুলি মোটামুটি মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি, বিভিন্ন ভঙ্গীর বিভিন্ন মেজাজের সৃষ্টি। কি ভাবে এই বিভিন্ন ভঙ্গী সাহিত্যে রূপান্তরিত হলো তার বিস্তৃত আলোচনা পরে আছে। আমরা যে মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি সে সময় আর একটী যুগান্ত আসন্ন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়ায় যেমন এই মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় একটী সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ ছিলো, এখন বোঝা যাচ্ছে আর টানাটানি করেও মধ্যবিত্ত

সমাজের—অন্ততঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের একাধিপত্য থাকবে না। এবারকার পালা স্বতন্ত্র লোকের। এই রকম মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা শুধু সাহিত্যে নয়, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিতেও পাওয়া যাচ্ছে। একদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমিক অবক্ষয়, অন্য দিকে একসঙ্গে দেশী ধনিকতন্ত্র এবং শ্রমিকতন্ত্রের ক্রমিক উদয় স্পষ্টতর হচ্ছে। এদের যুগপত্তা আমাদের দেশের আর একটা বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক কারণে এদেশে এ ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব ছিলো না। আমরা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে অতি-আধুনিক ভঙ্গী বলে একটা ভঙ্গীর ঘোষণা শুনেছি, তার পিছনে এই সব সামাজিক ঘটনাগুলির প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। বাঙালী মধ্যবিত্তের সাম্প্রতিক অবস্থা হতে একথাটা বোঝা যায়। যে পরিবর্তন এসেছে তাতে হাওয়া বদল ঘটে এবং তার ফলে সৃষ্টি বদল ঘটাও অনিবার্য।

৪

বাঙালী মধ্যবিত্তের সাম্প্রতিক অবস্থাটা তা হলে কী?

আঠারো শতকের শেষভাগের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এতদিনে একটা পর্বের সম্পূর্ণ অবসান হলো। সে সময়ের ভাঙনের মধ্য হতে মধ্যবিত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলো, এবার ভাঙনের মধ্য হতে জন্মগ্রহণ করছে অন্য সম্প্রদায়, যাতে মধ্যবিত্তের দিন আসন্ন। সে সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজের যে সম্প্রসারণ সুরু হয়েছিলো আজ তার প্রায় সম্পূর্ণ অবসান। সে যুগে সম্প্রসারণের ফলে মধ্যবিত্ত সমাজে আভ্যন্তরীণ বিভেদ ছিল না, পরে সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা কারণে বিভেদ বাড়তির মুখে। কিন্তু এই বস্তুর চাপ ছাড়াও মানস-পরিমণ্ডলে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলো, বোঝা গেলো পুঁথিতে যাই থাক্, এর বাস্তবিক রূপ শোষণের রূপ—সেইজন্যে সংঘাত অনিবার্য। এই আঘাত যখন প্রথম বঙ্গবিচ্ছেদের রূপে এসেছিলো,

তখন সমস্ত দেশ এক হয়ে তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলো। তারপরে এলো মহাযুদ্ধ। যে বাণীকে আমরা সভ্যতার বাণী মনে করেছিলাম, কর্মক্ষেত্রে তার কি রূপ তার পরিচয় পাওয়া গেলো। রবীন্দ্রনাথের কথায়, আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ব-বোধ যাচ্ছে চলে। পশ্চিমী সভ্যতার পরে বিশ্বাস হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এদেশের দুটী ঘটনা ঘটলো। শ্রেণীবিবর্তনের ফলে এদেশেও শ্রেণীবিরোধ প্রবল হয়ে উঠলো, আর সেই সঙ্গে রুশবিপ্লবের সাফল্য আশা জাগালো শ্রেণীবিরোধের পথে এগিয়ে গেলে একটা শুভ পরিণামে মিলবে। এ সময় মধ্যবিত্ত সমাজ আর চেহারা বদলেও স্বকীয় প্রাধান্য বজায় রাখতে পারবে না একথা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হচ্ছে। এমন কি সংখ্যাপ্রমাণেও দেখা যায় এই ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন দেখা দিতে সুরু করেছে।[৮]

জীবিকা	উপার্জনকারীদের সঙ্গে উপার্জন-অক্ষম পোষ্যের অনুপাত (শতকরা হিসাব)		
	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
১। জীবপালন ও কৃষি	৪৭ : ৫৩	৪৬ : ৫৪	৪৪ : ৫৬
২। খনিজ দ্রব্যের কাজ	৫৮ : ৪২	৬৪ : ৩৬	৪৪ : ৫৬
৩। শিল্প	৫০ : ৫০	৪৭ : ৫৩	৪৫ : ৫৫
৪। যানবাহন	৪৮ : ৫২	৪৫ : ৫৫	৪৩ : ৫৭
৫। ব্যবসা	৪৫ : ৫৫	৪৪ : ৫৬	৪২ : ৫৮
৬। পুলিশ, সৈন্যসামন্ত (Public force)	৪৫ : ৫৫	৪৮ : ৫২	৪৬ : ৫৪
৭। শাসনব্যবস্থা পরিচালন (Public Administration)	৩৭ : ৬৩	৩৮ : ৬২	৩৬ : ৬৪
৮। ডাক্তারী, চাকুরী ইত্যাদি (Profession & Liberal Arts)	৪২ : ৫৮	৪১ : ৫৯	৩৯ : ৬১
৯। অন্যান্য বিবিধ	৫৭ : ৪৩	৫৪ : ৪৬	৪৪ : ৫৬
	৪৭ : ৫৩	৪৬ : ৫৪	৪৪ : ৫৬

৮। Census Report, 1931, vol. I, part I, p. 275

দেখা যাচ্ছে যেগুলি মধ্যবিত্তদের জীবিকা, যথা শাসনব্যবস্থা পরিচালন, বা চাকরি, সেগুলিতে পোষ্যের সংখ্যা যে অন্যান্য জীবিকার তুলনায় অনেক বেশী তাই নয়, ক্রমবর্ধমান। এটী জাতি-হিসাবে বা শ্রেণীহিসাবে ক্ষয়িষ্ণুতার পূর্বলক্ষণ। সেই সঙ্গে দেখা যায় মধ্যবিত্ত সমাজে পরিবারের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট। এগুলি ধনবৃদ্ধির লক্ষণ, যার ফলে অপঘাত নিশ্চিত। সেন্‌সসে [৯] দেখা যায়, মধ্যবিত্ত (উচ্চ মধ্যবিত্ত) সম্প্রদায়ের পরিবার ছোটো।

জীবিকা	পরিবারের গড়পড়তা আকার
১। কৃষি ও জীব পালন	৪·৩
২। শিল্প	৪·২
৩। যানবাহন	৩·৭
৪। ব্যবসা	৪·৩
৫। পুলিশ, সৈন্য ইত্যাদি	৩·৯
৬। শাসনপরিচালন	৩·৯
৭। চাকুরী বা স্বাধীন জীবিকা ইত্যাদি	৪·৩
৮। বিবিধ	৪·১

এর ফলে যাঁরা উচ্চ মধ্যবিত্ত তাঁরা ক্রমশঃ উদীয়মান ধনিকতন্ত্রে মিশে যাবেন যদিও তাতে পরিণাম অবক্ষয়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবেন না, আর যাঁরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত তাঁরা আরও নীচের দিকে নেমে বিপ্লবের দলপুষ্টি করবেন। বিশেষতঃ এই মহাযুদ্ধের ফলে অভাব অভিযোগ, শ্রেণীবিরোধ আরও যতটুকু বাড়লো এবং ফলে সমাজবিবর্তনের গতিবেগ আরও যেটুকু বাড়লো তাতে এরকম অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে আসা হয়তো বিচিত্র নয়।

সেইসঙ্গে আরও কতকগুলি জিনিষ চোখে পড়ে। আমাদের সমাজ সমগ্রভাবে যদি ঐ পথে এগিয়ে চলে, তার সঙ্গে তার ভিতরেও কয়েকটী পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে যার গুরুত্ব উপেক্ষা করা চলে না।

৯। Census Report, 1931, vol. I, part II, p. 598

সমাজের গতি কোনো সময় সমস্তরে (Horizontal), কোনো সময় বিসমস্তরে (Vertical)। সমস্তরে প্রগতি সহজতর, কিন্তু বিসমস্তরে নড়াচড়ার ফলে নতুন চেহারাই স্বাভাবিক। আমাদের সমাজ-জীবনের সাম্প্রতিক গতি সমস্তর অপেক্ষা বিসমস্তরেই বেশী, কারণ একদিকে সমগ্রভাবে সমাজ যেমন বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে অন্য দিকে শুধু যে জাত-বেজাতের গণ্ডী ভাঙছে তাই নয়, তথাকথিত নীচু জাতগুলিও ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, জাতের বাধা বর্তমানে আর বাধা নয়।

এর সঙ্গে এলো নতুন ভাবমণ্ডল। দেশের মনে যে নতুন হাওয়া বইলো সেই হাওয়ায় মানুষ অনেক দূর এগিয়ে গেলো, এমন কি বাস্তব জগতে না হলেও মানস-জগতে। সমাজবিবর্তন ব্যাপারটা এতই নিগূঢ়, এতই নিঃশব্দ-সঞ্চরণশীল, যে তার গতি সহজে ধরা সম্ভব নয়। তার মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আছে, যার পরিচয় সবটা প্রত্যক্ষ নয়। এমন কি যখন সংখ্যাতত্ত্বের মাপকাঠীতে কোনও সমাজবিবর্তন ধরা পড়ে না, তখনও যে সমাজের গতি স্তব্ধ একথা বলা চলবে না। কারণ, সমাজ ব্যষ্টি ও সমষ্টির বস্তুজগতের ও মনো-জগতের মধ্যে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। সে কারণে সমাজের বহিরাবরণ অটুট থাকলে তার পরিবর্তন হতে পারবেই না এমন কোনও কথা নেই, কেন না পরিবর্তন ব্যাপারটা শুধু বাস্তবও নয়, মানসও বটে। যতদিন দরিদ্র কৃষকেরা তাদের ভাগ্যে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে ততদিন তাদের অভাব থাকলেও অভাব-বোধ থাকবে না, যদিও অভাব আর অভাববোধের এরকম তফাৎ করা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন তাদের দরজায় ভবিষ্যৎ উন্নতির বাণী এসে আঘাত করে তখন তাদের কোনও বাস্তব পরিবর্তন না হলেও তাদের পরিবর্তন স্বীকার করতে হবে। ফরাসী বিপ্লবের বাণী শুনবার আগে ও পরে ইংলণ্ডের কৃষক সম্প্রদায় বোধ হয় ঠিক এক ছিলো না, যদিও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার বাস্তবিক পরিবর্তন হয়েছিলো বহু বৎসর পরে এবং তাও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, নানা রিফর্ম আইনের মধ্য দিয়ে। তেমনি যখন এদেশের হাওয়াতেও নানারকম বুলি চলতে সুরু হয়েছে তখন সে বুলি প্রথম প্রথম ধার করা হলেও তার ফলে পরিণামে আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানসিক হাওয়াবদল হবে না একথা বলা চলে না। আর সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় মানসিক হাওয়া-বদলই কাজের পূর্বদূত। এক্ষেত্রে যদি কবিরা বাহ্য ও বাস্তব পরিবর্তন আসার আগেই নবযুগের গান গাইতে সুরু করেন তাহলে তাঁদের ক্রান্তদর্শী বলে-ই অভিনন্দিত করতে হবে, তাঁদের চিন্তাধারা অসামাজিক ও অলীক বলে ব্যঙ্গহাসি হাসা চলে না, কেন না রবীন্দ্রনাথের কথায় ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। শ্রমিক সম্প্রদায়ের সার্বভৌম অধিকারের দিন আসন্ন এমন কথা বলি না, কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ চেহারা বদলিয়েও আর বেশী দূর এগোতে পারছে না, একথাও সত্য। সুতরাং আমাদের সাহিত্যের নবযুগের মধ্যে অনেকটা মেকি থাকলেও সেটা যে সম্পূর্ণ মেকি সে কথা নির্বিচারে কিছুতেই বলা চলে না কারণ সেখানেও মৌলিক পরিবর্তনের দিন এসেছে এ কথাও মানতেই হবে। সামাজিক পটভূমিকা ছাড়া এই পরিবর্তনের কতটুকু খাঁটি কতটুকু মেকি তা বোঝা সম্ভব নয়। সমাজ ও সাহিত্যের বিচিত্র সম্বন্ধ এইখানেই ধরা পড়ে।

নবযুগের কাব্য—পূর্বাভাস

কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন "বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে ঐ সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লবের প্রভাবটা একেবারে নকল সুতরাং বাজে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ঐ কথাটা অক্ষমতার সাফাই। এই জরা-মরণগ্রস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যে গত মহাযুদ্ধটা কি নতুন এনেছে যা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্বে ধরা পড়ার সম্ভব ছিল না? তবে ইউরোপীয় লেখকদের কথাটা কতক বোঝা যায়। Conscript Army-তে ভর্তি হয়ে তাঁদের অনেককেই সে যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে হয়েছে, তার দুঃখ ও ভয় ভোগ করতে হয়েছে। বাংলা আধুনিক কবি-সমাজে কোথায় সে অভিজ্ঞতা! এক বাঙালী হিন্দুর চাকরীর সংখ্যা ও বেতন কম ছাড়া অন্য কোন সামাজিক উপপ্লবের মধ্য দিয়ে তাঁরা গিয়েছেন!"[১] "এই জরা-মরণগ্রস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যে গত মহাযুদ্ধটা কি নতুন এনেছে যা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্বে ধরা পড়ার সম্ভব ছিল না?"—এ কথাটা নিয়ে আলোচনা করারও দরকার নেই, কেননা এ কথা সত্য হলে আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে এতো পিছনে জন্মেছি যে আমাদের কোনও কাব্যই লেখা চলে না—সব বিষয় নিয়েই তো কাব্য লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীযুত গুপ্তের অপর প্রশ্নটীর গুরুত্ব আছে। আমরা সম্প্রতি যে নতুন ভঙ্গী পাচ্ছি তার সবটাই মেকি, না তার পিছনে বাস্তবিক কোনও কারণ আছে, এ কথা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্ব অধ্যায়ে এযুগে আমাদের যে বাস্তব ও মানস পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেছি সেগুলির পটভূমিকায় সাম্প্রতিক কাব্যে মৌলিক পরিবর্তন আসা অপ্রত্যাশিত নয়। মধ্যবিত্ত সমাজে যেমন যুগ পরিবর্তন হয়েছে বাংলা কাব্যেও তেমনি যুগ বদল হবে এটা মোটেই আকস্মিক নয়। এর বিভিন্ন যুগগুলি আলোচনা করলেই একথা বোঝা যায়।

১। কবিতা, কার্তিক, ১৩৪৭

বঙ্কিমী ঐতিহ্য যখন রবীন্দ্র-রচনার প্রথম যুগে ঢলে পড়লো তখন রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র আকাশ পাতাল তফাৎ থাকলেও কয়েকটী ব্যাপারে মিল-ও ছিলো। তখন জাতির যে সর্বাঙ্গীন উন্মীলন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সেই উন্মীলনের স্রষ্টা ও প্রতিভূ হিসেবে এক নতুন ঐতিহ্য রচনা করছিলেন। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে বঙ্কিমী ঐতিহ্যের কোনও মিল নেই। কিন্তু নানা বিষয়ে তখনও বঙ্কিমের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ ভাষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যুগের রচনাতেও কোনো কোনো জায়গায় চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন (যথা, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র), কিন্তু সাধারণতঃ সে যুগে সাধু ভাষারই প্রাধান্য। শুধু সাধু ভাষার প্রাধান্য তাই নয়, সমাস ও দীর্ঘ শব্দেরও প্রাধান্য। যেমন, প্রাচীন সাহিত্য (১২৯৮)—

> যদি কৃত্তিবাস তখন হিমালয়ের প্রস্থে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। শীতল বায়ু মৃগনাভির গন্ধ ও কিন্নরের গীতধ্বনি বহন করিয়া গঙ্গাপ্রবাহসিঞ্চিত দেবদারুকে আন্দোলিত করিতেছিল। সেখানে হঠাৎ অকালবসন্তের সমাগম হইতেই দক্ষিণদিগ্‌বধূ সদ্যঃপুষ্পিত অশোকের নবপল্লব জাল মর্মরিত করিয়া আতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ভ্রমরযুগল এক কুসুমপাত্রে মধু খাইতে লাগিল এবং কৃষ্ণসারমৃগ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী হরিণীর গাত্র শৃঙ্গ দ্বারা ঘর্ষণ করিল (রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, ৫১২ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ সেযুগেই অন্য আঙ্গিকে এই বাধা কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কবিতায় এই বন্ধনমুক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। সোনার তরী ঐ রচনার সমসাময়িক, কিন্তু তাতে শব্দ বা সমাসের এই গুরুভার নেই। উপন্যাসে মাঝামাঝি অবস্থা। তার মধ্যে বর্ণনার বেলা দীর্ঘ শব্দ ও সমাসবদ্ধ ভঙ্গী থাকলেও কথোপকথনে তা নেই সেখানে সাধু ভাষা আছে কিন্তু গুরুভার নেই। চোখের বালি হতে কিছু উদ্ধৃত করছি; বর্ণনা ও সংলাপের ভাষায় পার্থক্য সুস্পষ্ট—

> বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে

বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ বাসা, তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত—ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে। * * *

বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান?"

মহেন্দ্র···কহিল, "সে তো এখন কলিকাতায় নাই।"

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। সে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি খবর লওয়া যায় না।

মহেন্দ্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার অশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব দুদিনের—তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে।

কবিতায় তিনি এ যুগেই আবিষ্কার করেছিলেন ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বলার ভঙ্গী অনেক সময় জোরালো হয়ে ওঠে। পরের যুগে তাঁর রচনায় শুধু ক্রিয়াপদ নয় যে সর্বাঙ্গীন সংক্ষিপ্ত ও তির্যক্‌ভঙ্গী এসেছিলো তারই প্রথম আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। যেমন সোনার তরী কবিতাটীরই প্রথম স্তবক—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারাভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

প্রথম লাইনটীর সংক্ষিপ্ত ভঙ্গী পরের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং শেষ লাইনে যে ক্রিয়াপদগুলি

ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিও চলতি ভঙ্গীর—'বসে', 'হল', 'এল',—ইত্যাদি। বিনোদিনী-মহেন্দ্রের সংলাপের মধ্যেও এর পরিচয় মেলে। "দরকারই কি সব।"—এই বাক্যাংশ নিশ্চয়ই "দরকারই কি সব হইল?"—এর চেয়ে জোরালো। তবু সেখানে ক্রিয়াপদগুলি পূর্ণ মুক্তি লাভ করেনি, 'লওয়া' 'হইতেছে' ইত্যাদি আছে এবং সেই সঙ্গে আছে 'আশৈশব' প্রভৃতি গুরুভার সমাস। রবীন্দ্রনাথের মন তখন হতেই বন্ধনমুক্তির চেষ্টা করছিলো, কিন্তু একটা আঙ্গিকে সেটা যেমন স্বভাবতঃই অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে মুক্তি পেয়েছিলো, অন্যত্র তা পায় নি। এর কারণ খুঁজতে হয় ঐ ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের বিপ্রয়োগে—গদ্যে যুক্তির প্রাধান্য, বলার কথার গুরুত্ব বেশী, লেখক অত্যন্ত আত্ম-সচেতন,—সেইকারণেই কি কবিতার মতো স্বাভাবিক মুক্তিলাভ এতে সম্ভব হয় নি?

আর এক দিক থেকে সে যুগের মনকে বিচার করা যেতে পারে। নৌকাডুবি বা চোখের বালি বা বউঠাকুরাণীর হাটের ভাষার মধ্যেই শুধু যে মোটামুটি মিল আছে তাই নয়, উপন্যাসের ভঙ্গীটাও এক। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, "শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব নষ্ট হয়। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।"[২] সেইজন্যে ঐ যুগের গল্প বলার ভঙ্গীটা তির্যক্ হয়ে উঠেনি, শুধু সংলাপের জোরে গল্প জমাতে হয় না,

২। চোখের বালি—রচনাবলী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ লিখিত সূচনা, রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।

ঘটনা, বর্ণনা, সাজসজ্জা সমারোহ করে আসে। তবু সেযুগেও গল্পে রবীন্দ্রনাথ অনাদৃত উপেক্ষিতের ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছিলেন, গল্পগুচ্ছে পাওয়া যায় মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনকাহিনী বর্ণনা। তা বৌঠাকুরাণীর হাটের মতো রাজারাজড়ার চরিত্র-চিত্রণ নয়—এমন কি রাজাদের মধ্যে যে সুখ দুঃখের মানবিক স্পন্দন আছে সেটাও এখানে বর্ণনীয় নয়। বর্ণনার পদ্ধতিও যেন বাঙালীর কীর্তনের মতো, একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে নানা ঢেউ আবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু গত মহাযুদ্ধের মধ্যে বা ঠিক পরেই রবীন্দ্র-রচনায় একটা সম্পূর্ণ নতুন যুগ দেখা দিলো। গীতাঞ্জলির মধ্যে একটা গভীর বিষাদের সুর ছিলো, সে সুরটা উপযুক্ত ছন্দে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে সর্বাঙ্গসুন্দর তবু লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে বিষাদ গভীর, আর সেখানে চলছে কবির সঙ্গে জীবন দেবতার রহস্যালাপ, 'আমি'-ময় কাব্য। এ যেন,

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে নারে

(১২৯, গীতাঞ্জলি)

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ধারণা, "এই যে সরু মোটা দুইটা তারে জীবন-বীণা জড়াইয়া যাওয়া, ইহাও ত এক অধ্যাত্মলীলা।" কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এতো সহজ নয়। অধ্যাত্মলীলার যে ধারণা এমন কি শাস্ত্রেও আছে সেখানে তার সরু মোটা হলেও জীবন বীণা বাজবেই, বরং আরো বিচিত্র সুরে বাজবে, সেই বিচিত্র সুরে বাজাটাই লীলা কিন্তু এখানে এমন সংমিশ্রণ যে লীলাই স্তব্ধ, সংঘাতই বড়ো। মানুষের চিরন্তন অনুভূতির সরু তার দৈনন্দিন জীবনের মোটা তারের চাপে নিস্তব্ধ, দুয়ে মিলে বিচিত্রতর সুরে জীবনবীণা বাজার পরিবর্তে বীণাই বন্ধ, জীবনই চলছে না।

আমি তোমার যাত্রিদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নিচে।

(৪৬, গীতাঞ্জলি)

কবির এই গভীর কুণ্ঠাবোধ অপরের অকুণ্ঠ দম্ভ ও আত্মঘোষণারই প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যেই তিনি রূপসাগরের সন্ধান করছেন, সেইজন্য তিনি এমন একটী দেবতার উপাসনা করছেন যাঁর কাছে দীনতম মানুষেরও মানুষ হিসেবেই সম্মান আছে, সমস্ত জগতের যেখানে সমান পূজাধিকার।

যেথা নিখিলের সাধনা
পূজালোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা॥
(৫০, গীতাঞ্জলি)

সেইজন্যেই তো কবির আহ্বান,

বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো॥
(৫৮, গীতাঞ্জলি)

কবি সমস্যাটী বুঝেছেন, কিন্তু তবুও তখনও তিনি তাঁর অন্তরলোকে বাস করছেন, বহির্মুখী হন নি। গীতাঞ্জলির মৃদুতার কারণ এইখানে। কিন্তু বলাকায় যে নবীন উচ্ছ্বাস দেখা দিলো তার মূলে আছে এই অন্তরলোক হতে কবির বাইরে আসা, নতুন চোখে জগৎকে নতুন করে বলাকার ছন্দ যে অক্ষরের হিসেবের বাঁধন ভাঙ্‌লো, ভাব যে তীব্রতায় বিচ্ছুরিত হতে লাগলো তার মূলে আছে এই রহস্য। গভীর অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে চলার বাণী। বলাকার গোড়ার কথাটা হচ্ছে

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেণা উঠে জেগে
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;

নানা যুগের মানুষের মধ্য দিয়ে মানবমনের যে চিরন্তন প্রবাহ বয়ে চলেছে তার আঘাতে আজ নতুন বস্তু-জগৎ গড়ে উঠলো—সেই নব-জন্মের বেদনায় প্রাচীন ধ্বংসপ্রায়। সেই বেদনাই নবযুগের বহ্নিভরা মেঘে কেঁদে ওঠে, তারপর দীর্ঘকালের রাত্রির অবসানে নতুন আলোর সন্ধান মেলে। গীতাঞ্জলির সঙ্গে বলাকার তুলনা করলে এই 'আলো' উপমাও তো একটা বড়ো পার্থক্য। গীতাঞ্জলির মধ্যে অন্ধকার, সন্ধ্যা, রাত্রির কথা ছড়ানো, কিন্তু বলাকার মধ্যে নতুন আলো নতুন জীবন নতুন যুগের জয়গান। তফাৎটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বা মানসিক অবস্থার নয়, সর্বাঙ্গীনই। ছন্দের নতুনত্বের উল্লেখ করাই অনাবশ্যক. কিন্তু নতুন নতুন শব্দ, অপ্রত্যাশিত শব্দগঠন আর সজীব শব্দের ব্যবহারও বলাকায় বিস্ময়কর। সে সময় শুধু যে রবীন্দ্রকাব্যে যুগ বদলালো তাই নয়, রবীন্দ্র-উপন্যাসেও অনুরূপ পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "তার পরে ওই পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোট গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তারপরে পলাতকার কবিতা-গুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল।" সুতরাং সবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ যে চলতি বাংলার প্রাধান্য স্থাপনা করলেন সেটা মোটেই আকস্মিক নয়, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সমাজের ও কবির মনের হাওয়াবদলে। সেই সঙ্গে তাঁর গল্পে এলো তির্যক্ ভঙ্গী, যদিও কবিতায় তা এলো না, গল্পে কবি বাঁকা হাসি হাসলেন কিন্তু কবিতায় তার বদলে দেখা দিলো নতুন মানবিকতা, আবার নতুন ভাবে প্রাণের জয়গান, মানবসমাজের সঙ্গে নিবিড়তর

নতুনতর পরিচয়, সম্ভবতঃ আরও গভীরতর কিন্তু তীব্রতর সংঘাতক্লিষ্ট পরিচয়। শেষের কবিতা ও যোগাযোগ যে পূরবী-পরিশেষের মধ্যবর্তী রচনা তা হতেই ঐ কথাটা বোঝা যায়।

সুতরাং নবযুগের কাব্যের গোড়ার কথাটা কী ?

এক কথায় বলতে হলে বলতে হয় সেটী হচ্ছে ক্রমিক বন্ধনমুক্তি। এই বন্ধন ভাষার বন্ধন, ভাবের বন্ধন, ছন্দের বন্ধন। বলা বাহুল্য, ভাষা ভাব বা ছন্দ তখনই বন্ধন যখন তারা কাব্যের প্রাণসারকে প্রকাশ করার বদলে ঢাকতে চায়। সে যুগের বলার কথা যে আঙ্গিকে ফুটতো এ যুগের বলার কথাটা তাতে ফোটে না কেননা এখন বলার কথাটাই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ বঙ্কিমী (কথাটা ভুল বোঝার ভয় করি) পর্যায় হতে রবীন্দ্র সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের (অর্থাৎ মোটামুটী সবুজপত্রের পূর্ব পর্যন্ত) প্রধানতম পার্থক্যই এই যে উনিশ শতকে যে কল্পিত সমন্বয়ের মধ্যে সেকালের লেখকেরা শান্তিতে বাস করছিলেন সে শান্তি সমাজে ভাঙলো এবং ফলে কাব্যেও নতুন রূপ ফুটলো। এই সমন্বয় ভাঙতে ভাঙতে চরম অবস্থায় পৌঁছলো গীতাঞ্জলির যুগে, তার পরেই কবি নতুন রূপে নতুন উৎসাহে নতুন হাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। যে দুর্মর প্রাণশক্তি রবীন্দ্রকাব্যের প্রধানতম লক্ষণ এবং যে ক্রমিক নবজন্ম রবীন্দ্ররচনার বৈশিষ্ট্য, সেগুলি নতুন হাওয়ায় উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠবে সেটা বেশী কথা নয়। স্পষ্ট অনুভব করা যায় একটী ধ্বস ভাঙলো, যেন একটী নতুন স্তর সৃষ্টি হলো। কাব্যের স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সামাজিক কথা প্রত্যক্ষতঃ আসে না, তাই বলাকা-পলাতকার মধ্যে নব বহির্মুখীনতা ঐ রকম নানা নতুনত্ব ফোটালো। অবশ্য বলাকাতেও 'আমি'-ময় কাব্যের জের চলেছে। গীতাঞ্জলির ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ পরিবর্তন হলো সম্ভবতঃ পলাতকায়।

সেখানে শুধু যে ছন্দ নতুন ধরণের বা দৃষ্টিভঙ্গী বহির্মুখীন তাই নয়, কবি নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রেখেছেন,—সেখানে কবিতার কেন্দ্র 'আমি' নয়, কবিতার কেন্দ্র হচ্ছে 'ঝামরু কুলীর বৌ' 'বিনু' প্রভৃতি। ভাষার বেলায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ চলতি ভাষার দিকে এগোলেন। চতুরঙ্গ (রচনাকাল, ১৩২১) সম্ভবতঃ সাধুভাষায় লেখা তাঁর শেষ উপন্যাস বা বড়ো গল্প। তার মধ্যে ক্রিয়াপদ এতো কম, ভাষা এতো কঠিনতার দিকে ঝুঁকেছে যে স্পষ্ট বোঝা যায় ঐ আঙ্গিক আর কবির ধাতে সইছে না। তারপরে দেখা গেলো ঘরে-বাইরে (রচনাকাল, ১৩২২)। তার মধ্যে চলতি ভাষার সন্ধান মিললো, কিন্তু সম্ভবতঃ চলতি ভাষা ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবোচ্ছ্বাস দিয়ে। দুটার ভাষা তুলনা করলেই এটা ধরা পড়ে।

> "আর একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ী ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন, আমরা অন্যমনস্ক।"
>
> —চতুরঙ্গ, রচনাবলী, ৭ম খণ্ড

> "বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে। হায়, হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম। ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেইদিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে। আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।"
>
> —ঘরে-বাইরে, রচনাবলী, ৮ম খণ্ড

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু এই পরিবর্তন কোনও ঐশী প্রেরণায় আসে নি, এসেছিলো চারপাশের নতুন হাওয়ায়। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি সেটা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সেটা রূপকারের মনেই। ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিমত এই: "যে-কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য

ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ-কথা বলা চলে যে লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে, "ঘরে-বাইরে" গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্প কাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।"[৩] আর "বলাকা"র মানস ইতিহাসও, রবীন্দ্রনাথের কথায়, এই ঃ "এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে-সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। ··· আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নব যুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।"[৪] এই আসন্ন অরুণোদয়ের আভা স্তরে স্তরে ছড়িয়ে গেলো, তার ফলে বলাকা হতে সব দিকেই নতুন সৃষ্টি। এটী গত মহাযুদ্ধের গোড়াকার অবস্থা।

কিন্তু যখন যুদ্ধশেষে ফলোদয় কিছুই ঘটলো না, জগতে নতুন যুগের উদয় হলো না, তখন আমাদের দেশে যে কারণে মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙন তীব্রতর হয়ে উঠল এবং অসহযোগ আন্দোলন দেখা দিলো, ঠিক সেই কারণেই সাহিত্যে আর এক যুগ উপস্থিত হলো। এ পর্যন্ত যে মুক্তি সাহিত্যে এসেছিলো, আর সে মুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকা চললো না, নতুনতর বাঁধন ভাঙার চেষ্টা দেখা দিল। কিন্তু যে যুগে ভবিষ্যৎ বিশ্বাস লুপ্ত নয় সে যুগে মুক্তির সন্ধানে একটা ভারসাম্য থাকে, তাই সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য বজায় থাকা তখন বিচিত্র নয়। কিন্তু যখন সামাজিক স্তর ভাঙায় শুধু নিরাশা শুধু নেতিবাদের

৩। রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা

৪। ঐ দ্বাদশ খণ্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা

প্রতিফলন, তখন সাহিত্যেও সেইরকম এলোমেলো স্তর ভাঙার কাব্য, এমন কি অসংলগ্ন ব্যক্তিক কাব্য, হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। বলাকা পলাতকার পর রবীন্দ্র-সাহিত্যে কি পরিবর্তন ঘটলো সেটা এদিক্ থেকে লক্ষণীয়। যেখানে ব্যক্তিক সুরটাই প্রবল সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় বিশিষ্টতায় অন্য দিকে ধরা পড়েন নি, পূরবী পরিশেষ তারই প্রমাণ। কিন্তু সেখানেও ঠিক প্রাচীন পদ্ধতিতে আর চললো না, তাঁর বক্তব্যের জন্য একটা নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন হলো সেই কথাটাই তিনি প্রমাণ করলেন গদ্য-ছন্দের উদ্ভাবন করে। এইখানে বাংলা অতি-আধুনিক কাব্যের শুরু।

বাংলা অতি-আধুনিক কাব্য কোথায় এবং কি ভাবে শুরু সে সম্বন্ধে কাব্যের প্রমাণের কথা পরে আলোচনা করলেও নাটক ও উপন্যাসের ধারা হতে সে কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। নাটক জিনিষটা প্রত্যক্ষতঃ সামাজিক, কিন্তু এই যুগে ঠিক সেরকম নাটক বেশী দেখা যায় না। এ যুগে রবীন্দ্রনাথের দুটো প্রধান উপন্যাস, শেষের কবিতা ও যোগাযোগ। যোগাযোগের ট্র্যাজিডিই হচ্ছে ধনতন্ত্রের ট্র্যাজেডি। আমার বিশ্বাস, সে হিসেবে যোগাযোগ শেষের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কুমুর মধ্যে দুর্বলতা আছে, কিন্তু সে দুর্বলতার পরিচয় আমরা সমাজেও পেয়ে থাকি, যেন পাথরের মূর্তি প্রাণবান্ হয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু চারপাশকে আয়ত্ত করার বা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করার ক্ষমতা তার নেই। ধনতন্ত্রের মানবসভ্যতার প্রতীক কুমু। তার আকার প্রকার মানুষের মতো, কিন্তু স্বাভাবিক বিকাশ তার হয় নি, যেন অনেকটা প্রাণহীন, যোগী আদর্শবাদী আর মোরগের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। মতির মা, মতির সঙ্গে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অথচ মধুসূদনের সঙ্গে তার ব্যবহার যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তা বলা চলে না। কেমন যেন পরিণতিহীন, সেই প্রথম আশাভঙ্গের ফলে যে আত্মসমাহিতি ঘটলো সেটা বরাবর অবিচল। অথচ যেখানে সত্যিকারের প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা ছিলো সেইখানেই রবীন্দ্রনা

পর্দা টেনে দিলেন—সুতরাং বইটী একটী বিশেষ টাইপের বিশেষ মনোভঙ্গীর ইতিহাস হয়েই রইলো। কিন্তু তবুও বইটীতে যতটুকু প্রাণের কথা আছে তা আমাদের হৃদয়ে লাগে। শেষের কবিতায় এ গভীরতা নেই, সেটী ট্র্যাজিডি কি ট্র্যাজিডি নয় তা সহসা বলা যায় না। সেখানে ধনতন্ত্রের ট্র্যাজিডি ফুটলো অন্যভাবে, পরগাছা-শ্রেণীর সৌখিনতায়, যে সৌখিনতা লাবণ্যের মানুষী প্রেমের কাছে ভেঙে পড়লো। শেষের কবিতার প্রথম লাইন, "অমিত রয় ব্যারিষ্টার।" ঐ প্রথম লাইনেই বইখানির সুর বাঁধা হয়ে গেলো, যে সৌখিন আভিজাত্য এই শ্রেণীর সম্বল অমিতের মধ্যে তারই পরাকাষ্ঠা। অমিত একটু অতিশয়-ধর্মী, তাই তার সাধারণ আলাপও তির্যক্‌ভঙ্গীর কবিত্বময় কথায়, কিন্তু তার অতিশয়টা বাদ দিলেই এযুগের সৌখিন শ্রেণীদের আমরা দেখতে পাবো। তাই শেষের কবিতার শেষ কথা হচ্ছে,

> তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
> রজনীর শুভ্র অবসানে।

সুখের মধ্য দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্য দিয়ে যে মহৎ মুক্তি নতুন ঊষায় দেখা দেয় সেই মুক্তিই লাবণ্য দিতে চায়। বাংলা কাব্যের মুক্তির সন্ধানে এই একটী দিগ্‌-নির্দেশক স্তম্ভ, অবশ্য অন্বয়মুখে নয়, বিপরীত-মুখে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যতটা আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন গদ্যে অর্থাৎ গল্পে বা উপন্যাসে তা পারেন নি তার প্রমাণ ঐ বই দুখানির অতিসংক্ষিপ্ত ভঙ্গী, গুরুচণ্ডালী বচনবিন্যাস, বৈহাসিক চটুলতা এবং গীতিধর্মিতা। সার্থক, অর্থাৎ, হাঁ-ধর্মী উপন্যাসে এর কোনোটীর উপরেই মুখ্যতঃ জোর পড়ে না; বিপরীতভাবে বলা চলে হাঁ-ধর্মের অভাবেই এগুলি এই সমস্ত ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। উপন্যাস আর গীতিধর্মিতা প্রায় বিরুদ্ধ, কিন্তু শেষের কবিতার শেষ কবিতাটী কবিতা না হলে কি ভাবে যবনিকা পতন হতো সেটী ভাববার বিষয়। সুতরাং

যে আঙ্গিকের মধ্যে সামাজিকতা বেশী সেখানে রবীন্দ্রনাথ কোনও সার্থক সমন্বয় খুঁজে পান নি, শুধু ভাঙনের ট্র্যাজিডিরই বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করলেন, যদিচ কবিতার মতো অধিকতর ব্যক্তিক রাজত্বে তিনি নতুন আঙ্গিক ও নতুন ভঙ্গীর সাহায্যে এই ভাঙনকে অন্য পথে চালাবার চেষ্টা করেছেন।

এই সময়ের আর দুজন গদ্যলেখকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে একটুও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু দুজনে বাস্তবিক একই কারণ থেকে উদ্ভূত। মুক্তির ইতিহাস-রচনায় এঁদের বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রমথ চৌধুরী চলতি ভাষার প্রচলনের জন্য অনেকটা দায়ী, সে হিসাবে তিনি মুক্তিদাতা নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি এই নতুন আঙ্গিকে কোনও নতুন 'হাঁ'-ধর্মী ঐতিহ্য রচনা করতে পারেন নি। যে সৌখিনতা শেষের কবিতায় নানা সুরে ঝংকৃত সেই সৌখিনতাই প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ব্যক্ত ও ব্যঞ্জিত, অবশ্য ঝংকৃত নয়। তবুও প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব এইখানেই যে, সৌখিনতার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন, তাঁর কথার বাঁধুনী যে কথারই বাঁধুনী সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আছে। সে হিসেবে তিনি কোনোকালেই unacknowledged legislators of the world হবার দুরাকাঙ্খা রাখেন না, তিনি স্পষ্টতঃই জানেন তিনি বীরবল, চুটকি কথার কারবারী। সে দিক্ হতে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ঐতিহাসিক ভাবে শরৎচন্দ্র অনেক বড়ো শিল্পী, কেন না ভাঙন তাঁর মধ্যে শুধু অবক্ষয়ে পরিণত হয় নি, আর একটা নতুন স্তরে তিনি নেমেছেন বলে তাঁর মানবধর্মিতা এবং কবিধর্মিতা এরকম কমে নি। তাঁর উপন্যাস চলতি ভাষায় রচিত নয়, কিন্তু তাঁর উপন্যাসে যাদের সন্ধান মেলে তারা অমিত, মধুসূদন, নীললোহিত বা চার ইয়ারের চেয়ে অনেক 'নীচু' দরের মানুষ, অর্থাৎ তারা যত্র তত্র ভোজন এবং হট্টমন্দিরে শয়ন করতে অভ্যস্ত, ঘুমোবার জন্য তাদের ইলক্ট্রাকোম্বে যাবার দরকার হয় না, কিন্তু তারা লোকনিন্দার ভয়ে

মারামারি গালাগালি করতেও পেছোয় না, বারবনিতার বাড়ী দিনেই যায়, রাত্রে নয়, তাদের নিয়ে বসবাস করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাদের প্রাণ আছে, মান নাই-বা থাকলো। প্রমথ চৌধুরীর যেখানে শেষ, শরৎচন্দ্রের শুরুই অনেকটা সেখানে। হয়তো রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী আরও সচেতন, কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে অবক্ষয়েরই অন্তর্ভুক্ত, আর এগোতে পারেন নি বলেই কথার কারসাজি। কিন্তু শরৎচন্দ্র আরও এগিয়েছিলেন, জ্ঞানে নয়, অজ্ঞানেই এগিয়েছিলেন, তবু এগিয়েছিলেন, তাই তাঁর রচনায় শ্রীকান্ত-দেবদাস-মহিম-সুরেশ-কিরণময়ীর শোভাযাত্রা। শুধু অসংলগ্ন মিছিল নয়, একটা দানাও আছে। সামাজিক দানা নয়, কবিকর্মের দানা। গৃহদাহ এই মনোবিকলনের যুগেও অচল নয়, কেন না, তার মধ্যে সমাজের যে অন্তঃসংঘর্ষের বিবরণ আছে শুধু বিবরণ হিসাবেই যে সেটা চমৎকার উৎরেছে তা নয়, সেই অন্তঃসংঘর্ষ আজও শেষ হয় নি বলে আজও তার সমসাময়িক মূল্য বিশেষ কমে নি। রবীন্দ্রনাথ এদিকে আর এগোন নি তার প্রমাণ তাঁর শেষ গল্পগুলিতেও আছে। "তিন সঙ্গী"র গল্পগুলি অপ্রত্যাশিত পাকে পাকে পাক খেয়েছে, কিন্তু সেই পাক খাওয়া সম্ভব হয়েছে কলমের জোরে, কবিতাধর্মিতার জোরে, অলংকারের জোরে কিন্তু সম্ভবতঃ জীবনের জোরে নয়। এ আঙ্গিকে যে কবির মন স্ফুরিত হতে চায় নি সেটাও সম্ভবতঃ আকস্মিক নয়। এ রকম ভাঙ্গনের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ সুস্থবোধ করেন নি।

এইখানে বাংলা কাব্যে নবযুগের তৃতীয় পর্বের শুরু। দুটী অসহযোগ আন্দোলন, রাজরোষ, বিশ্বব্যাপী মান্দ্য, মধ্যবিত্ত সমাজে তীব্রতর ভাঙন, মুসলমান মধ্যবিত্তের উদয়, শ্রমিক সম্প্রদায়ের সূচনা,—এ ঘটনাগুলি পর পর বাংলায় ঘটলো। সামাজিক স্তরে স্তরে যে হাওয়া বদল হলো তার ফলে নতুন আঙ্গিক ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিলো। এইখানে গদ্যকাব্যের আরম্ভ। "লিপিকা"র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সব প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা গদ্যকাব্যের। "পুনশ্চ"-এর ভূমিকায় কবি বলছেন,

"গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।···গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।"

আসল কথা, ভঙ্গীটা বিভিন্ন। সেইজন্যে তফাৎটা শুধু আঙ্গিকের নয়, সবদিকেই হাওয়া বদল, যদিচ প্রথম দিকে আঙ্গিকের খেলাই বড়ো কথা ছিল, সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ছাড়া শুধু আঙ্গিকের নতুনত্ব যে একটা মুদ্রাদোষ তা ততটা অনুভূত হয় নি। "পুনশ্চ"-এর কতকগুলি কবিতায় সেইজন্যে দেখা দিয়েছে নাটকীয়ত্ব বা নাটকীয় কথাবস্তু, যথা 'ক্যামেলিয়া', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'প্রথম পূজা' ইত্যাদি। আর এক ভঙ্গীও 'পুনশ্চ'-এ দেখা গেলো, তার মধ্যে সহজ মানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তাদের সুখ দুঃখের একটা মানবিক কিন্তু ঝংকারহীন বর্ণনা দেবার চেষ্টা আছে। যেমন 'কোপাই', 'খোয়াই', 'দেখি', 'শেষদান' প্রভৃতি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ পরিবেশেও নিজেকে সুস্থ মনে করেন নি। তাঁর মনে নতুন হাওয়ার সাড়া জেগেছে, কিন্তু তিনি যেন ঠিক সুর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পুনশ্চ-পত্রপুট-শেষসপ্তক যুগের গদ্যকাব্যে তাঁর একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব আছেই, যেটা কোনও না কোনও আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নাটকীয় কবিতাগুলিতে পর্দা টানা সুস্পষ্ট, কিন্তু 'কোপাই'-এর মতো অ-নাটকীয় সহজ কবিতাতেও এই দুর্বলতা ধরা পড়ে। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, "এই কবিতাটী সর্বতোভাবে অনবদ্য এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।" তার কারণ এ কবিতাটীর তিনটী বৈশিষ্ট্য; প্রথম, এর 'সহজ সরল

অভিব্যক্তি', দ্বিতীয়তঃ, এর 'নিসর্গ বর্ণনা', তৃতীয়তঃ এর মধ্যে 'প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে' স্বীকার করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে বলার ভঙ্গীর সঙ্গে মনের কথার বিরোধ বেধেছে,—দুয়ে মিল হয় নি। আর 'পত্রপুট'-এর ঘোষণা-ঘেঁষা সুর এবং চড়া অলংকার প্রমাণ করে যে কবিকে উজান ঠেলতে হচ্ছে। এগুলিতে নতুনত্ব আছে, কিন্তু সেটী বাহ্য, ভেতরে প্রবেশ করে নি।

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগালো প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্য্যাস্ত-সীমার রঙীন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়লো মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতীশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।

—পত্রপুট, ৯নং কবিতা

বা

এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্ম্মরধ্বনি
উধাও ক'রে দেয় আমার জাগ্রৎ স্বপ্নকে
চিল-উড়ে-যাওয়া দূর দিগন্তে
জনহীন মধ্যদিনে মৌমাছির গুঞ্জন-মুখর অবকাশে।

—পত্রপুট, ১৩নং কবিতা

এটী যে সার্থক কবিতা নয়, এর মধ্যে কবির মনের সুষ্ঠু স্ফুরণ ঘটে নি, একথা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্র-কাব্যের এবং সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তবু এর অসাধারণ গুরুত্ব আছে। যেমন "বলাকা"য় কবি অক্ষর-মাপ হতে ছন্দকে মুক্তি দিয়েছিলেন, এবার শুধু যে কবিতাকে প্রচলিত অর্থে ছন্দের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিলেন তাই নয়, কাব্যে একেবারে নতুন আবহাওয়া আনলেন। আঙ্গিকের দিক্ দিয়ে এ একটী নতুন রাজত্ব দেখা দিলো; ছন্দহীনতা মানে অবশ্য কাব্যহীনতা নয়; তার মানে এমন

একটী ছন্দ যেটী ছাড়া ওকথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হ'তে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না। এর একটা বিশেষত্ব আছে যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোন ছন্দে বলতে পারতুম না।"[৫] রবীন্দ্র-কাব্যে এই বলার কথা ও বলার ভঙ্গীর বিরোধ শেষ হলো শেষ পর্যায়ে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন ঐতিহ্য রচনা করলেন যার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিস্ময়কর। কিন্তু সেকথা আলোচনার আগে দেখা দরকার ইতিমধ্যে এই স্তরভাঙা, খাপছাড়া, কূল-খোয়ানো কাব্য আর কোন্ দিকে অগ্রসর হলো। সাহিত্যে এই নতুন প্রেরণা রবীন্দ্র-কাব্যে 'প্রান্তিক' হতে আর একটা মোড় নিলো। রবীন্দ্রনাথ সে সময় হতে গদ্যকাব্য, অর্থাৎ মার্কামারা গদ্যকাব্য, ছেড়ে দিলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ে যে একটী নৈর্ব্যক্তিকতা দেখা দিয়েছিলো তার পূর্ব্বাভাস 'প্রান্তিক'-এ। দেহ হতে মন যেন বিচ্ছিন্ন, কবি নিজের জীবনলীলায় নিজেই দর্শক।

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্রবেদনা,
চিত্রকরা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।

—প্রান্তিক, ৯নং কবিতা

৫। 'আমার কাব্যের গতি', প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৩

কবি সামাজিক বিরোধে ও মানবধর্মের অপমানে স্পষ্টতঃই পীড়িত ; শুধু পীড়িত নয় উদ্বোধিতও, সেইজন্যে কবি যেমন একদিকে শক্তি প্রার্থনা করছেন,

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল র'বে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে ॥

—প্রান্তিক, ১৭নং কবিতা

অন্যদিকে তিনি শক্তি সঞ্চার করছেন,—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ॥

প্রান্তিক, ১৮নং কবিতা

আবার সেই "নির্মম সাহিত্যের" অভিযান, কেন না সমাজই আজ নির্মম হয়ে উঠেছে, সেখানে শান্তির বাণী ব্যর্থ পরিহাস। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে—আধুনিক সমাজের যা মূল সমস্যা সেগুলি এই কাব্যে এমন প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়লো আর গদ্যকাব্যে ধরা পড়লো না কেন? গদ্যকাব্য যেহেতু এযুগের মানস পরিমণ্ডলেরই বিশেষ সৃষ্টি তখন গদ্যছন্দেই এযুগের মনের স্পন্দন সহজে ধরা পড়বে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এটা যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঘটলো না তার একমাত্র কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার গঠন-বৈশিষ্ট্য। উদ্ধৃত কবিতাটী গদ্যছন্দে

রচিত নয়, ১৭নং কবিতার মতো মিলহীনও নয়; পদান্তমিল আছে, ঝংকার আছে, ক্রিয়াপদগুলিও চলতি নয় বরং পলাতকার তুলনাতেও বেশী সাধুভাষা-ধর্মী, 'সাথে' প্রভৃতি নিছক পদ্য ঘেঁষা কথা আছে,—অর্থাৎ রোমান্টিক কাব্যের, পলায়নী কাব্যের, যে কটী বড়ো চিহ্ন সে সব-কটী-ই আছে। কিন্তু তবুও কি অস্বীকার করা চলে যে এই কবিতাটীতে একালের মনের এমন একটী সুন্দর ছবি মিল্‌ছে যে ছবি তথাকথিত 'আধুনিক' আঙ্গিকেও প্রায় মেলে না। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, এযুগের রবীন্দ্র-কাব্য আর একবার প্রমাণ করলো প্রকৃত কাব্য আঙ্গিকের জোরেও হয় না, বক্তব্যের জোরেও হয় না, অথচ কোনোটীকে বাদ দিয়েও চলে না, কেন না কোন্ কবি এগুলিকে কি ভাবে ব্যবহার করলেন এবং ফলে সার্থক কাব্য রচনা করতে পারলেন সেইটেই সাহিত্য সমালোচনার প্রধান দ্রষ্টব্য। "প্রান্তিক"-এ কবির চৈতন্য গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত যে নাড়া খেলো তার ফলে নতুন নতুন দিকে তাঁর কাব্যের অভিযান। আমার ধারণায় এগুলি তাঁর গদ্যকাব্য, অন্ততঃ পত্রপুট, শ্যামলীর চেয়ে সার্থকতর—এমন কি, মিল ঝংকার থাকা সত্ত্বেও। 'আকাশ-প্রদীপ'-এর প্রথম কবিতাটী উল্লেখযোগ্য—

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।

—আকাশ-প্রদীপ, ভূমিকা

কোমর বেঁধে কাব্য লেখার দায় হতে কবি মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জগতের সঙ্গে তাঁর আরো একটা সহজ কিন্তু আরো নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ এলো, সেই পরিচয়েরই স্বীকৃতি কবিতাগুলিতে। পাঠ্য পুস্তকে লেখে রোমান্টিক কাব্যের একটা লক্ষণ—কবিরা স্বকীয় বিষয় সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং চিন্তান্বিত, অন্যদিকে ভাবার অবসর থাকে না। এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। তাই নানা টুকরো কাহিনী, জীবনের নানা বিচিত্র ভঙ্গিমার চলচ্ছবি তাঁর কাব্যে।

কুল গাছ দক্ষিণে কুওর ধারে,
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে,
বাকি সব জঙ্গল আগাছা।
একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্ন ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে।
বিশীর্ণ গোলকচাঁপা গাছে
পাতাশূন্য ডাল
অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো। বাঁধানো চাতাল;
ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরীব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে।
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনী-টানা নানামতো ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গীতে।

—স্কুল-পালানে (আকাশ-প্রদীপ)

সেইজন্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের জন্য শিপ্রাতটে উজ্জয়িনীপুরে যেতে হয় না, বাঁশবাগানই যথেষ্ট—

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলাম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।
হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিইনি ফিরে তুলে।
দিনের শেষে দীঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল।

এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই ॥

—প্রশ্ন (আকাশ-প্রদীপ)

ছোট ছোট কথা, কাটা কাটা বুলি, টুক্‌টাক্ ছন্দ আর সোজাসুজি বলা। রবীন্দ্র-কাব্যে এ নতুন ভঙ্গী। কোথায় গেলো সেই ভীড়-করে-আসা শব্দসমারোহ, তীব্র উচ্ছ্বাস, কাব্যের কল্পপুরী, উপমা অনুপ্রাস অলংকারের জমকালো ঘনঘটা ? এমন কি কোথায়ই বা গেলো শ্যামলী-পত্রপুটের দীর্ঘ সমাস, চড়া সুর আর ভাসা ভাসা বর্ণনা যা আমাদের ভোলাতে চায় কিন্তু চমকিত করে না, যা আমাদের অন্যজগতে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু দৈনন্দিন সুখদুঃখকে কাব্যে পরিণত করে না ?

কাব্যের এই তত্ত্বের প্রমাণ রবীন্দ্র-কাব্যে বারবার মেলে। 'নবজাতক'-এ কবি সজ্ঞানে 'আধুনিক' হতে চেয়েছেন, তার মধ্যে যে কবিতাগুলি গ্রথিত হয়েছে সেগুলিতে মননজাত অভিজ্ঞতার প্রাধান্য। তার মধ্যে নানা নতুন সুর লেগেছে, নানা নতুন দৃশ্যপট কবি এঁকেছেন যা হয়তো ইতিপূর্বে ঠিক এইভাবে তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে নি। কবি অনুভব করছেন,

উপরে আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

কিন্তু তাঁর বিশ্বাস,

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে ॥

—নবজাতক (প্রায়শ্চিত্ত)

সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন এক নতুন জগৎ ও নতুন দিনের, যেখানে মানবধর্মের মহিমময় প্রতিষ্ঠা সম্ভব,—

প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশ-পিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নবসৃষ্টির কবি
নব-জাগরণ যুগ-প্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির-স্নানের কালে,
আলো আঁধারের আনন্দবিপ্লবে ॥

—নবজাতক (উদ্বোধন)

এর মধ্যে কবি যে ছবি আঁকলেন সেটী হচ্ছে,

অস্তরবির দেহলি দুয়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মূলতানরাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি ॥

—নবজাতক (শেষ দৃষ্টি)

তবু এর মধ্যে কতকগুলি দুর্বল কবিতা আছে, সেগুলি সজ্ঞানে 'আধুনিক' বলেই বোধ হয় দুর্বল। যেমন 'পক্ষীমানব'। দুয়ের

তুলনা প্রত্যেক দিকে টানা হলো, যেন সাদৃশ্য ও পার্থক্যের প্রত্যেকটা দিক্ দেখাতেই হবে। বা 'ইস্‌টেশন'। সামান্য আধারে বেশী ভার চাপানো, আধারে ভার সইছে না, তাই ভাষাকে চেষ্টা করে সহজ হতে হয়েছে, সহজ হয় নি। 'সানাই' এই দোষ হতে অনেক বেশী মুক্ত, কিন্তু তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আরও এগোলেন, তাই কবিতাগুলিতে একটা নতুন সুর লাগলো। আরও সহজ সুর, জীবনের সঙ্গে আরও সহজ পরিচয়, চারপাশের হাওয়ার ছাপটাও স্পষ্টতর। অপ্রত্যাশিত উপমা।

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে থাকা,
টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে। —বাসাবদল

সেইজন্যেই তো আজ তাঁর প্রিয়ার নতুন রূপ—

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম ভাঙা।

—মুক্তপথে

ভদ্রতা থাকাই সম্ভব নয়, প্রাণ যখন শুকিয়ে আসে তখনও কি ভদ্রতার কাষ্ঠহাসি হাসা সম্ভব?

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষ্যে
পড়ত ব'সে "ওড্‌স্ টু নাইটিঙ্গেল,"
না-দেখা কোন্ বিদেশবাসী বিহঙ্গমের
না-শোনা সংগীতে
বক্ষে তাদের মোচড় দিত,

ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়,
উজাড় পরীস্থানে।
বরষ কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকায় পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির,
চা-পান সভায় হাঁটুজলের সখ্যসাধনার।

—পরিচয়

সেইজন্যে প্রাণখোলা হাসির পরিবর্তে দেখা গেলো ব্যঙ্গহাসি।

সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখিনি
তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিনী
ছবির মতো ;—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতরদিকের
সন্ধানটুকু পাইনে।

—সম্পূর্ণ

এই ব্যঙ্গহাসি যখন সুদূরপ্রসারী তখনই বিপদ, কারণ যে যুগে শুধু এই ব্যঙ্গহাসিই থাকে সেযুগে কবিধর্মের ক্রমিক অবনতি অনিবার্য। সে সময়,

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।
কল্পনা-ভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য অলংকার।

—অত্যুক্তি

ধার-করা বাক্য অলংকারে আর তর্কের নৈপুণ্যে কিভাবে মানসিক দারিদ্র্য ঢাকবার চেষ্টা করা হয় তার পরিচয় আধুনিক তরুণ কবিদের

রচনায় কিছু কিছু মিলবে। কিন্তু সে কথা পরে আলোচ্য। রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে তাহলে মোট কথাটা এই : সমাজে যে এলোমেলো হাওয়া বইলো, কবির মনে যে নতুন সুর জাগলো, তার ফলে এ যুগে রবীন্দ্র-কাব্যে একটা নতুন যুগ দেখা দিলো যে যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমিক বন্ধনমুক্তি। 'বলাকা'য় ছন্দের কঠোর বন্ধন খসেছিলো, 'পলাতকা'য় মহোচ্ছ্বাসের চাপ কাটলো, গদ্যকাব্যে কবিশিক্ষার নির্দেশ টুটলো কিন্তু কবি তৃপ্ত হলেন না, ফলে আবার ছন্দ ফিরলো কিন্তু পুরনো চেহারায় আর ফিরলো না, তার তীব্রতা লুপ্তপ্রায়, দীর্ঘায়িত ভঙ্গীও আর নেই। এইদিকে এগোতে এগোতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছলেন, সেখানে তিনি আধুনিকতার একটী নতুন ঐতিহ্য রচনা করলেন, আমরা দেখলাম এ কালের সমস্যায় স্পন্দিত হয়েও শুধু গদ্যছন্দ, ব্যঙ্গহাসি এবং বক্রোক্তি ছাড়াও কাব্যরচনা সম্ভব, তার মধ্যে এ যুগের সমস্যার ছাপও থাকে, সে আধুনিক নিশ্চয়ই কিন্তু প্রচলিত অর্থে আধুনিক নয়। আধুনিক কাব্যের এ একটী নতুন দিক্, এই দিগ্‌নির্দেশ সম্ভব হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই। কথাটা ফাঁকা স্তুতি নয়, যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত। আর কোন্ কবির মন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এতো সজীব থাকে যে তিনি শেষ পর্যন্ত সার্থক কাব্য রচনার চেষ্টাতেই ব্যস্ত রইলেন, সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, কালান্তরের ভয়ে ধর্ম, মিষ্টিসিজম, উদারনীতি ইত্যাদি নানারকম প্রচলিত অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন না? আর যদি-ই বা এমন আরও দুই-একজন কবি থাকেন যাঁরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রগতিশীল, এমন কবি সত্যই দুর্লভ যাঁরা প্রচলিত ভঙ্গীর মধ্যেই তলিয়ে যান নি, নব নব স্বকীয় খাত রচনা করতে পেরেছেন এবং সেই খাতে সার্থক কাব্যপ্রবাহ বহিয়েছেন?

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছবার আগে আরও দুটী বই-এর উল্লেখ প্রয়োজন। সে দুটী 'ছড়া' ও 'ছেলেবেলা'য়। কিছুদিন হতে রবীন্দ্র-কাব্যে,—শুধু রবীন্দ্র-কাব্যে কেন, সকল আধুনিক কাব্যেই,—

একটী লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো যে কবিরা একটী সংহতির পরিবর্তে শুধু টুক্‌রো টুক্‌রো জীবনকাহিনী, এলোমেলো দৃশ্যপট কথার সুতোয় গাঁথছিলেন। পর পর সাজিয়ে একটী সম্পূর্ণ চিত্র দেবার চেষ্টা নেই, যেমন পাওয়া গেলো তেমনি ভাবেই স্তরগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া গেলো। এ চেষ্টা শুধু কাব্যে নয় ছবিতেও দেখা দিয়েছে। এমন কি বলা চলে, আধুনিক ছবির সূত্রপাতই এইখানে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: এতে কাব্যধর্ম বজায় থাকা সম্ভব কি? আমাদের প্রচলিত ধারণা কাব্যের জগৎ লৌকিক জগৎ হতে তফাৎ হলেও সে একটী জগৎ, নানা জিনিষের গুদোমঘর নয়। অর্থাৎ তারও একটী যথাযথ সংস্থান এবং ক্রমিক সংগঠন আছে, এলোমেলো স্তরভাঙায় যার ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। যে কাব্যে শুধুই এলোমেলো স্তরবিন্যাস তার কাব্যত্ব হানি হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তাতে সেই প্রাণবস্তুটার অভাব যেটাতে নানাসুরের নানাভঙ্গীর পরিণাম আশ্রয়, যেটা নানা বৈচিত্র্যকে ধারণ করে, বন্ধনের মধ্যে অবন্ধনের লীলা সম্ভব করে। কিন্তু উপায় নেই। যে যুগে আমাদের জীবনে এই প্রাণবস্তুর অভাব ঘটে সে যুগে আমাদের জীবনেরও তো কোনো সর্বাঙ্গীণ অর্থ থাকে না, আজকের বিপদই আজকের পক্ষে যথেষ্ট। কোনক্রমে দিন কাট্‌লেই হলো, যেমন তেমন করে প্রাণ বাঁচানো, তাও প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত। জীবনের পরে ঘৃণা ধরে, আজকের চিন্তাই দুঃসহ, দূর ভবিষ্যতের চিন্তা দূরের কথা। কাজেই এ যুগে কাব্যের মধ্যে সে প্রাণবস্তুর সন্ধান না পেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ যুগের কাব্য তাই বর্ণনাতেই পর্যবসিত, যদি কিছু কাব্যত্ব থাকে সে কেবল বর্ণনার সজীবতায়। কিন্তু বর্ণনাই সজীব, বর্ণিত বিষয় নয়। অবশ্য 'সজীব' কথাটার অর্থ, এখানে, প্রাণবান্ নয়, চমৎকারই। অর্থাৎ যা বর্ণনা করছি তারই উপযুক্ত। সেইজন্যেই আমরা কবিতায় পাই পদ্যের ফিল্‌ম্। ফোটোগ্রাফি হয়তো চমৎকার, কিন্তু গল্প নেই, আছে কতগুলি ছড়ানো ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ছোটো ছোটো ঘটনা 'ছড়ার' মধ্যে

ইতস্ততঃ ছড়ানো, অনেক সময় ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধই খুঁজে পাওয়া দায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন—

এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ,

* * * *

পষ্ট আলোর দৃষ্টি পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।

* * * *

বাঁধনটাকেই অর্থ বলি
বাঁধন ছিঁড়লে তা'রা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা॥ —ছড়া, (ভূমিকা)

কাব্যরাজ্যের শূন্যের পালাতেই এই পাগল বস্তুদলের মিছিল জমে।

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে-বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।

হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা-বাঁকা রকমে
পায়রা জমায় সভা বকবকবকমে। —ছড়া, (৩নং ছড়া)

বা

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে' কালু মুলো নিল উপ্‌ড়ি।
নদীর পাড়ে কিচির-মিচির লাগালো গাঙ্‌শালিখ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলাখেতের মালিক যে।
কাঁকুড় খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা। —ছড়া, (৬নং ছড়া)

আমরা বিস্ময়ে ভাবি, বালুর চরে আলুহাটা কেমন করে সম্ভব, সেখান হতে মুলো উপড়ানোই বা কি করে সম্ভব, পিলেওয়ালা ছোকরার সঙ্গে মুচিপাড়ার লোকদেরই বা সম্বন্ধ কি। কিন্তু এর প্রত্যেকটাই একটা স্বতন্ত্র ছবি হিসেবে সুন্দর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, পর পর ভেসে চলেছে, সমগ্রভাবে না-ই বা অর্থ থাকলো। বলা বাহুল্য, এ নতুন ঐতিহ্যের কাব্য নয়, ভাঙনের কাব্যের একটা দিক্।

এইখানে আরও একটা প্রশ্ন ওঠে ঃ ভাঙনের কাব্য এটা তা স্বীকার করা গেলো, কিন্তু এই 'ছড়ার' রূপ ধরেই ভাঙন প্রকাশ লাভ করলো কেন? অন্য আধুনিক কবিদের কাব্যে দেখি এই ভাঙন তো অনেক প্রত্যক্ষ ভাবেই তার ছায়া ফেলেছে, এখানে শিশুমনের আড়ালে দাঁড়াতে হলো কেন, ছড়ারই বা আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো কেন? কেন বয়স্ক মনের অবরুদ্ধ চেতনার প্রলাপ দেখা গেলো না?

রবীন্দ্রকাব্য কেন এই পথে গেলো না তার প্রধানতম কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিধর্ম এতো প্রচুর যে নিছক ধ্বংসের কবি হতে কখনই তাঁর মন মানে নি। তাই নানা বিচিত্র ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে তিনি এগোলেন, নানা ভঙ্গী দেখা গেলো, শেষ পর্যন্ত তিনি এমন একটা পর্যায় রচনা করলেন যার মধ্যে তাঁর ভারসাম্য ঘটেছে। কিন্তু কোথায়ও নিছক ভাঙনের চিত্র তিনি

সুস্থমনে আঁকতে পারেন নি। ভবিষ্যতে যাঁর দুর্মর বিশ্বাস তাঁকে কালক্রমে কাটাছেঁড়া কাব্য লিখতে হলে তিনি ফ্রয়েডের পরিবর্তে ছড়া লিখবেন এ তো স্বাভাবিক। বালভাষিত অসঙ্গতিসত্ত্বেও অমৃত, কিন্তু বয়স্কদের প্রলাপ মানে আর কোনও আশা নেই। 'ছড়া'র অন্যতম কারণ এইখানে। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ কারণ সম্ভবতঃ নয়। এ যুগের পরিণতপ্রজ্ঞ মনের বিকাশের সঙ্গে শিশুর ভাবের রূপায়নের একটা সাদৃশ্য আছে, সেটাকে বার্দ্ধক্যে শৈশব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শিশুমনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা পূর্ব-পর সম্বন্ধ নির্দেশ করে কোনও জিনিষের সমগ্রতাকেই দেখতে শেখে না, যে সামাজিক-ঐতিহাসিক সংস্কারের ফলে ভাববোধের উপকরণগুলির প্রতীকধর্মিতার পূর্ণতম প্রকাশ সম্ভব হয় সে সামাজিক-ঐতিহাসিক সংস্কার তার সম্পূর্ণ নয়। সেইজন্যে তারা যেটা দেখে সেটার একটা সম্পূর্ণ ভাবরূপ গড়তে হয়তো পারে না কিন্তু যেটুকু দেখে সেটাকে অত্যন্ত সজীবভাবে দেখে। বয়স্ক মনের অনুধাবনের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ বিপরীত, সেখানে অনুভবের শুরু সমগ্রতার দিক্ থেকেই। কিন্তু যে যুগের বক্তব্যই হচ্ছে এই সমগ্রতার খাতিরে আমরা আসল দেখা ভুলতে বসেছি, সুতরাং সেই সমগ্রতাকে ভেঙে তার পিছনের প্রাণের লীলাকে তীব্রতর করে ধরতে হবে সে যুগের পরিণত মনও বিপরীত দিক্ থেকে চলতে চলতে এমন স্থানে পৌঁছয় যেখানে শিশুমনের সঙ্গে তার একটা আপাতসাদৃশ্য মেলে। কিন্তু সেটা ঐ আপাত্সাদৃশ্য, তার বেশী নয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ছড়া রবীন্দ্রনাথেরই ছড়া, তা কোনো শিশু কোনোকালেই রচনা করতে পারে না। দালির ছবি দালিরই ছবি, কোনো শিশু তা আঁকতে পারবে না। যামিনী রায়ের পটের অনুকরণ শিশুর পক্ষে দূরে থাক্ হাত-দুরস্ত সাধারণ শিল্পীর পক্ষেও অসাধ্য। কিন্তু তবু যে খানিকটা মিল থাকে তা ঐ কারণে, যদিও শিশুর ভাবনা আর শিল্পীর ভাবনা একেবারেই বিপরীতদিকে চলে। আর্টেও তো এই সমস্যা। রোজার ফ্রাই এই কথাটা ভাল করে ধরেছেন,—

The sense of sight supplies prophetic knowledge of what may affect the inner fortifications, the more intimate senses of taste and touch, where it may already be too late to avert disaster. So we learn to read the prophetic message, and for the sake of economy, to neglect all else. ... The subtlest differences of appearance that have a utility value still continue to be appreciated, while lage and important visual characters, provided they are useless for life, will pass unnoticed. We have learned the meaning-for-life of appearances so well that we understand them, as it were, in short-hand ... children have not learned it fully, and so they look at things with some passion. ... In the practical vision we have no more concern after we have read the label on the object; vision ceases the moment it has served its biological function. (*Vision & Design*)। কিন্তু বর্তমান আর্টের ধর্ম হচ্ছে দৃষ্টির সার্থকতা বজায় রাখা, সুতরাং তার সঙ্গে আদিম চিত্রপদ্ধতি বা শিশুদের চিত্রের একটা আপাতসাদৃশ্য আশ্চর্য নয়। The primitive drawing of our own race is singularly like that of children. ... Impressionists have made an attempt to get back to that ultra-primitive directness of vision. Indeed they deliberately sought to deconceptualise art. The artist of today has therefore to some extent a choice before him of whether he will *think* form like the early artists of European races or merely *see* it like the

Bushmen. বর্ত্তমান আঁকিয়েদের উদ্দেশ্য নতুন; They do not seek to give what can, after all, be but a pale reflex of actual appearance, but to arouse the conviction of a new and definite reality . . . in fact, they aim not at illusion but at reality . . . they do not rely for their effect on associated ideas, as Romantic and Realistic artists invariably do.

রবীন্দ্রনাথ যে এই যুগে এই ধরণের ছড়া রচনা করলেন তার পিছনে যে এ ধরণের কথা ছিলো না এমন কথা জোর করে বলা চলে না। বলা যে চলে না তারই অন্যতম প্রমাণ, তিনি এই সময়েই 'ছেলেবেলা' লিখলেন এবং সেটী এমন ভাষায় এমন ভঙ্গীতে লিখলেন যে তার মধ্যে বয়স্ক-মানুষের পিছনে-তাকানো দৃষ্টি রইলো না, জীবন-'স্মৃতি' এ নয়, এর মধ্যে পাওয়া গেলো সংস্কার-বর্জিত চোখে (এইটেই খানিকটা ছেলেদের মতো) আদিম বিস্ময়গুলি আবার অনুভবের চেষ্টা। তা না হলে 'ছেলেবেলা'র ভাষা ওরকম সরল ও বাহুল্যবর্জিত হতো না; একই সময়ে প্রকাশিত 'তিন সঙ্গী'র ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখন রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য কি, তার মধ্যে কি ধরণের ভারসাম্য ঘটলো, একালের চাপে রবীন্দ্র-প্রতিভা শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়ালো সে কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আধুনিক কবিরা এ ঐতিহ্যে এগোন নি, সুতরাং সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কি ঐতিহ্য রচনা করলেন সেটী বিশেষভাবে আলোচনীয়।

নবযুগের কাব্য—রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের নানা পর্যায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে 'শেষলেখা' পর্যন্ত আশ্চর্য পটপরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। কোনো কোনো মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রং হয় রাঙা ; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র ; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।" তাই বারে বারে নতুন নতুন পথে রবীন্দ্রকাব্যের অভিযান। 'গীতাঞ্জলি'র পর 'বলাকা,' 'পূরবীর' পর 'পরিশেষ,' 'শেষসপ্তক' 'পুনশ্চ'-এর পর আবার পালাবদল। এর প্রত্যেকটিই আশ্চর্যজনক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থগুলি আবার যে একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে তার শিল্পকার্য রবীন্দ্র-সাহিত্যেও অনন্য। এদের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল ; বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।" এই হাওয়াবদলের পূর্বাভাস রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনেকদিন হতেই পাওয়া যাচ্ছিল ; শুধু কাব্যে নয়, তাঁর গদ্য রচনাতেও। কিন্তু এদের পরিণতি বিশেষ করে তাঁর শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থে—'রোগশয্যায়,' 'আরোগ্য,' 'জন্মদিনে,' 'শেষলেখা'।

রবীন্দ্রকাব্যের এই পর্যায়ের প্রত্যেক দিকেই যে নতুনত্ব সুস্পষ্ট সে নতুনত্ব শুধু যে রবীন্দ্র-সাহিত্যেই অভূতপূর্ব তাই নয়, বাংলাসাহিত্যের বর্তমান আদর্শ ও ভবিষ্যৎ বিকাশের দিক দিয়ে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রকাব্যে ইতিপূর্বে যে পালাবদল দেখা গেছে তার মধ্যে ভাষা ভঙ্গী ও আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলেও সে পরিবর্তনও সম্ভবতঃ এত সুদূরপ্রসারী নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন সুর বেজেছে, সে সুরের ভঙ্গীও নানাপ্রকারের ; কিন্তু তবু হয়তো তাদের মধ্যে কোনো না কোনো আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। কিন্তু শেষের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যা লিখলেন তার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ; মনে হয় এ একেবারেই নতুন সুর, তার ভঙ্গীটাই বদলে গেছে। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে যে নতুন লক্ষণ পাওয়া যায় তার কোনো-কোনোটি হয়তো এককভাবে পূর্বে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু এগুলির একত্র সমাবেশ সেখানে ছিল না। সেইজন্য পূর্বে তাদের একক প্রকাশের সার্থকতা যাই কিছু থাক, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তাঁদের এই সর্বাঙ্গীণ যোগ ছিল না। কিন্তু এখানে সবই নতুন, কেন না গোড়ার কথাটাই স্বতন্ত্র। সেইজন্য এবারের পালাবদল সম্পূর্ণ, যার ফলে ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, ভঙ্গী, সবই নবরূপ ধারণ করেছে।

এই পালাবদলের দুটো দিক্ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হোতে থাকে অন্যমনে।" প্রথমেই চোখে পড়ে সৃষ্টিবদল —ভাষা, ভাব, আঙ্গিকের কথা। কিন্তু সেইটেই সব কথা নয়। তার পিছনে আছে হাওয়াবদল, কবির চারপাশের ও কবির মনের হাওয়া-বদল, যার থেকে সৃষ্টিবদল সম্ভব হল। হাওয়াবদলের সঙ্গে সৃষ্টিবদলের এই বিচিত্র সম্বন্ধই একহিসেবে সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কী এইখানে তার পরিচয় মেলে। এই গ্রন্থগুলির হাওয়াবদল এবং সৃষ্টিবদল বাংলাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় বিস্ময়কর। প্রথমেই বাহ্য লক্ষণগুলির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আঙ্গিকের পরিবর্তন আশ্চর্য। ছন্দের মহোচ্ছ্বাস ঝংকার একেবারেই তিরোহিত। স্বল্পভাষিতায়, বন্ধনে, মিলহীনতায় এদের কাঠিন্য অদ্ভুত। কিন্তু এই আঙ্গিক নানা রসপ্রকাশের উপযুক্ত, এদের ভারবহনের ক্ষমতা অসীম। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র ফুটে উঠেছে বর্ণবিহীন রেখার টানে। যেমন 'রোগশয্যায়'-এর আট-সংখ্যক কবিতা। হেমন্তের সকালবেলার বর্ণনায় কোয়াসার বর্ণহীন পাণ্ডুতা ভাষায় ছোঁয়াচ লাগিয়েছে, এতই তার

নিরাভরণতা। তেমনি যতিচিহ্ন স্বল্পতম, প্রত্যেক অনাবশ্যক যতি সযত্নে পরিহার করা হয়েছে—

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়
হিমসিক্ত অরণ্যচ্ছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

এ যেন কবিতার সূত্ররূপ, একেবারেই বাহুল্যবর্জিত। প্রথমে ঘটনাটির বিবরণ, পরে কেবলমাত্র দুটী বর্ণনা, তাতেও কবির নিজের মনের খবর নেই, আছে যেন শুধু দুটী সংবাদ। কিন্তু এই নিরাভরণতার উৎপত্তি অনুভূতির অভাব থেকে নয়, তার মূল অনুভূতির তীব্রতাতেই। বরং অনুভব এখানে এতই তীব্র যে এই বাহ্য নিরাভরণতা ছাড়া তার অন্য কোনো আঙ্গিক সম্ভব নয়। এই অনুভূতির মধ্যে গভীরতা আছে, কিন্তু মহোচ্ছ্বাস-সমারোহ নেই। সেইজন্য তার প্রকাশভঙ্গীও এখানে সপ্তস্বরে ঝংকৃত নয়, একটী গভীর সুরে অনুরণিত। এই গ্রন্থগুলির নিরাভরণতার প্রকৃত রহস্য এইখানে। পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যেন সূর্যোদয় পাণ্ডুবর্ণ হল এইটুকুই যথেষ্ট, আর কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? এই শান্ত সমাহিত ভাবের পিছনে কী তীব্রতা, কী প্রকাশভঙ্গী, কী উপমা। সত্যি কথা বলতে কি, 'চিত্রা'র যে-কোনো কবিতার অনুরূপ বিষয়ের কুড়ি লাইন বর্ণনার চেয়ে এর যে কোনো একটি লাইনের ব্যঞ্জনা ঢের বেশী, উপমার কঠিন দীপ্তি যেন চোখ ঝলসায়, তার চিত্ররূপ যেন বর্ণবিরলতা সত্ত্বেও উজ্জ্বলতর, চোখের চেয়েও মনের উপর প্রভাব বেশী। এই বিস্ময়কর সংক্ষিপ্তি পদে পদে। কিন্তু এই চিত্র-অঙ্কনেই এদের প্রকাশক্ষমতা শেষ

হয়ে যায় নি। আরও গভীর বিষয় বর্ণনার ক্ষমতাও কম নয়, এ আঙ্গিকেই যেন সেগুলি বেশী ফুটেছে। 'শেষলেখা'র তের-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন তাঁর জীবনের ইতিহাস—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

জীবনের চিরন্তন রহস্যের কথা এতো ভালো করে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথও সম্ভবতঃ আগে করেন নি। ক্ষণে ক্ষণে যেখানে রং বদলায়, যেখানে বর্ণ গন্ধ গান, সুখ দুঃখ ও কষ্টের বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছে, তার বর্ণনার রংও ক্ষণে ক্ষণে বদলায়—আমরা এই দেখে এসেছি যে, তার গভীর রহস্য কাব্যকেও রহস্যময় করে তোলে, তার সুরের ওঠানামা ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকে। কিন্তু এখানকার রহস্য সেরকম স্বতঃপ্রকাশ নয়, সে বাইরে একরঙা। এ যেন মহাসমুদ্রের গম্ভীরতা, তার বিরাট্ স্তব্ধতার তলায় অতল রহস্য। ঝরনার উচ্ছলতার, তার রামধনু রঙের সন্ধান এ কাব্যে নেই।

সেই সঙ্গে ছন্দের ভঙ্গীও রবীন্দ্রকাব্যে নতুন। অক্ষর বা মাত্রা গুণে সমান ওজনের লাইন গড়ার বন্ধন থেকে ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছিলেন প্রধানতঃ 'বলাকা'য়। তারপর হতে এই বন্ধনমুক্ত ছন্দ কখনও ধীরগতিতে কখনও দ্রুততালে চলেছে। তারপর এল গদ্য কাব্যের যুগ। কিন্তু সে কাব্যে মিল না থাকলেও মীড় ছিল, প্রচলি

অর্থে কবিতার ছন্দ না থাকলেও সে ছন্দের দোলা কখনোই থামে নি। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর গদ্যকাব্যগুলিতে বহু সময় মিল না থাকলেও ঝংকারের প্রাচুর্য ; গদ্যকাব্যে সাধারণতঃ যে নির্মোহ নিরুচ্ছ্বাস আশা করা হয়ে থাকে, তার সন্ধান অনেক সময়েই মেলে না। কবি যা লিখেছেন সবসময়ে সে যে তাঁর মনের সঙ্গে মেলে নি তার প্রমাণ গদ্য-কবিতাগুলির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে, সমাসবদ্ধ শব্দের বাহুল্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেটরিকের প্রাদুর্ভাবে। অথচ যখন কবি গদ্য-কাব্য লিখছেন না তখন তার মধ্যে এমন ছন্দের এমন বলার ভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যা কেবল আজকের দিনের পীড়িত সমাজের বেদনা-ব্যথিত কবির পক্ষেই রচনা করা সম্ভব ; তার মধ্যে ছন্দদোলা (এবং অন্যান্য লক্ষণও) তিরোহিত হয়ে এমন একটি নিরাভরণ শুভ্রতা এনে দিয়েছে যে-শুভ্রতার মধ্যে নানা বর্ণের সমাবেশ নেই কিন্তু তার প্রাখর্যে চোখ ঝলসায়। ছান্দসিকের মতে এই কাব্যগ্রন্থগুলির ছন্দের চাল হয়তো সমমাত্রার কি বিষমমাত্রার। দুইমাত্রা বা তিনমাত্রার চাল এখানেও আছে। কিন্তু সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এদের গতি, যা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পয়ার বা তিনমাত্রার চাল কোনোটিরই সমধর্মা নয়। যেমন এই লাইন ক'টি—

> দুঃখরাতের স্বপনতলে
> প্রভাতী তোর কী যে বলে
> নবীন প্রাণের গীতা,
> জানিস নে তুই কি তা॥ —শেষ লেখা (৩নং কবিতা)

যখন রবীন্দ্রনাথ তিনমাত্রার চাল উদ্ভাবন করেন তখন বলেছিলেন এই তিনমাত্রার চালের একটা বড় সুবিধা সে গড়িয়ে চলে, তার মধ্যে ভাব স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হতে চায়। কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তিনমাত্রার চালেও উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই ; যেন অদৃশ্য যতি আছে, একটানা প্রবাহ নেই ; তার গতি অবিরাম নয়। এর চেয়েও স্থিরগম্ভীর যেগুলি দুইমাত্রার চাল—

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝা করে
জনহীন বেলা দু-পহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা-লেশ নাহি। —শেষ লেখা (৪নং কবিতা)

ছোট ছোট বাক্যাংশ, যেন সংবাদ-শিরোনামার ভঙ্গীতে লেখা। কিন্তু এই শিরোনামার তলায় অনেক সংবাদ, অনেক কথা প্রকাশ হবার জন্য ভিড় করছে। সে কথাগুলি ভাষার পোশাকে আত্মপ্রকাশ করে নি, আপাততঃ তারা উহ্য ; কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত লাইনগুলিকে ভর করে তারা আমাদের বুকে লাগে। এদিক দিয়ে দুইমাত্রার চাল সার্থকতর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার উপরেও দুটি জিনিস সংযোজন করলেন। প্রথম, মিলবর্জন ; দ্বিতীয়, অসম পংক্তি ব্যবহার। শেষলেখার তের-সংখ্যক যে কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অসম পংক্তি ব্যবহারেও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, কোনো পংক্তিই বিশেষ দীর্ঘ নয়। সেইজন্য শেষসপ্তক, পুনশ্চের লাইনগুলি যখন দীর্ঘায়িত ভঙ্গীতে তাদের চড়া স্বরের পরিচয় দেয়, এ লাইনগুলির ক্ষুদ্রতা কবিতার ভাষা ও ছন্দের নিরুচ্ছ্বাস সংক্ষিপ্তিকে ফুটিয়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় কি বলাকা-পলাতকায়, কি শেষসপ্তক-পুনশ্চে একটি ছোট লাইনের পরই একটি বড় লাইন,—অন্তত দুই বা কয়েকটি লাইন মিলে একটি পরিপূর্ণ তরঙ্গ। কিন্তু এখানে সব লাইনগুলিই প্রায় ছোট,—সে তরঙ্গ নেই, ওঠাপড়ার সন্ধান এখানে মেলে না। এরকম নিরাভরণতায় ও বাহুল্য- বর্জনে কাব্যের মহিমা কতটা বাড়ে তার পরিচয় এর পূর্বে এমন পাওয়া যায় নি। কাব্যের প্রাণধর্মই যদি তার মাধুর্য তবে সেই প্রাণধর্মই তার একমাত্র মণ্ডন, তার অন্য অলংকারের প্রয়োজন হয়তো নেই-ই।

সেই সঙ্গে এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভাষা লক্ষ্য করার মতো। কিছুদিন পূর্বে 'ছেলেবেলা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, এতদিনে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি ভাষা সৃষ্টি করলেন যাকে বলা চলে basic বাংলা। সেই basic বাংলার ছাপ এই কবিতাগুলিতেও। বরং

সংক্ষিপ্তি আরও বেশী, প্রবাহ আরও কম। ভাষার যে উচ্ছ্বলতা, উপমার যে প্রাচুর্য রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, সে উচ্ছ্বলতা বা সে প্রাচুর্যের কোনো সন্ধানই এখানে মিলবে না। এই অমণ্ডিত পটভূমিকায় উপমাগুলির রূপ স্পষ্টতর। তাদের উজ্জ্বলতা উদ্ভাসিত আলোর উজ্জ্বলতা নয়, অন্ধকার রাতে তারার সূচীমুখ দীপ্তির মতো। "মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে।" প্রতিদিনের ঘরকন্নার কথা হতে সংগৃহীত, কিন্তু উপমাটির নূতনত্ব অসাধারণ।

> গাছে গাছে জোনাকির দল
> করে ঝলমল
> সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে—
> টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।
>
> ...
>
> রূপ-নারানের কূলে
> জেগে উঠিলাম,
> জানিলাম এ-জগৎ
> স্বপ্ন নয়। —শেষ লেখা (১১নং কবিতা)

উপমায় সমারোহ নেই, প্রতিদিনের চলতি পথের বাঁকে বাঁকে যে ঘরোয়া কথা ঘরোয়া দৃশ্য নজরে পড়ে তাদেরই তির্যক্ ব্যবহার। ফলে তাদের এই বিশেষত্ব। উপমার জন্য চাঁদ চকোরে যাবার প্রয়োজন নেই, এ আমাদের চারপাশের দৃশ্য হতে আহরিত ছবি, কিন্তু তা শিল্পীর রেখার টানে নব রূপ ধারণ করে। পুকুরপাড়ে বেতের ঝোপ দেখালো "সবুজের আলপনায় রং দিয়ে লেপে।" এদের অসাধারণত্ব আরও বাড়িয়েছে এদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। অতি সংক্ষিপ্ত অতি সহজ ভাষা ও বর্ণনার মধ্যে ঐ এক-একটি বিস্ময়কর শব্দ ও উপমা। "ওঙ্কারিয়া যায়।" ভাষা যতই সহজ বা সংক্ষিপ্ত হোক, ঐ একটি শব্দের ব্যঞ্জনাই যথেষ্ট, আপাতসংক্ষিপ্তির পিছনে যে তীব্রতা ও যে অনুভূতি আছে হঠাৎ তার সন্ধান মেলে। তেমনি উপমাগুলিতে। তারা অপ্রত্যাশিত-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেইজন্য তাদের এমন সার্থকতা। তির্যক্

ভঙ্গীর জন্য অর্থের ঠোকাঠুকির প্রয়োজন হয় নি, সাধারণ ছবির অসাধারণ ব্যবহারই এ কাব্যরীতির অন্যতম লক্ষণ।

কবির বক্তব্যকে নানা অলংকারে সাজিয়ে তোলাই প্রচলিত কাব্যরীতি। এই অলংকার কখনও সরল কখনও তির্যক্। সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে কখনও সরল কখনও বা তির্যক্ ভঙ্গীর প্রাধান্য। এক-হিসেবে সরল হতে তির্যক্ ভঙ্গীতে যাত্রার ইতিহাসই কাব্যের বিবর্তনের ইতিহাস, এমন কি রবীন্দ্রকাব্যেরও ইতিহাস। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে সেই মূল রীতি সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগল। শব্দের ব্যঞ্জনা, ভাষার তির্যক্ ব্যবহার, নতুনতরো উপমা প্রভৃতি যে অলংকরণগুলি সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রায় প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন পাওয়া গেল এই কাব্যে। আশঙ্কা ছিল সাম্প্রতিক অলংকরণের ভঙ্গীর পরিণামে আসবে শুধুই একটা কথা বলার ভঙ্গী, যা প্রায় মুদ্রাদোষের মতোও শোনাতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক সাহিত্যকে এই অপঘাতমৃত্যুর হাত হতে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করলেন। এই উদ্ধার সম্ভব হল নতুনতরো অলংকারের মধ্য দিয়ে নয়, একেবারে অলংকার বাদ দেবার চেষ্টায়,—সাহিত্যে প্রাণের কথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, শুধু বলার ভঙ্গীটাই প্রধানতম রইল না। আঙ্গিক বক্তব্যের অনুযায়ী, কিন্তু আঙ্গিকের খাতিরে বক্তব্য গড়তে হয় নি। যাঁরা বাংলার আধুনিক কবি তাঁদের পক্ষে বোধ হয় এই দিকটি বিশেষ ভাবে আলোচ্য, কেননা রবীন্দ্রনাথ আর-একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—আঙ্গিকের পরিবর্তনেই কাব্য সফল বা আধুনিক হয় না, তার জন্য মৌলিক পরিবর্তন দরকার।

২

আজকাল বাংলা কবিতায় যে নব ভঙ্গী প্রচলিত হচ্ছে তাকে 'সাম্প্রতিক কাব্য' 'আধুনিক কাব্য' প্রভৃতি নানা আখ্যা দেওয়া হয়। সে কাব্যের গোড়ার কথাটা এই যে চারপাশে যে হাওয়াবদল হচ্ছে তার

জন্য সৃষ্টিবদল অবশ্যম্ভাবী, তা না হলে কাব্য স্বধর্মচ্যুত হল। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়েও এই মতবাদের স্বপক্ষে স্বাক্ষর আছে। তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কেননা কাব্যের স্বাধর্ম্য চিরকালই এই। অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি প্রকৃত কাব্যমাত্রই আধুনিক, কেননা তা বর্তমান মানুষেরই মনের অভিব্যক্তি। যে কাব্য আধুনিক নয় সে কাব্য অনাধুনিকও নয়, সে অকাব্য। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবাস্তর। তার আগে দেখা প্রয়োজন কবির রচনায় যে সৃষ্টিবদলের কথা উপরে আলোচনা করলুম তার পিছনে কী হাওয়াবদল আছে।

এই শেষপর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচনা করলে প্রথমেই মনে হয় এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছেন যা আনন্দ-উচ্ছল কবির স্বত-উৎসারিত গান নয়, যা জগতের বেদনা-ব্যথিত কবির বাণী। পীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এর বহু কবিতা লেখা। তার প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ কবি বহু কবিতায় সভ্যতার এই অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ,' কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সভ্যতার সংকট আমাদের সম্মুখীন সে সম্বন্ধে কবির উদাসীন থাকার উপায় নেই, সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস না হারানো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। কবি চোখের সামনে দেখছেন—"রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের, শত শত নগর-গ্রামের অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;" এই লোভের বিরুদ্ধে কবির তীব্র ধিক্কার—"সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো, দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত।" তাঁর আশঙ্কা—"আদিম বন্যতা তার উদ্বারিয়া উদ্দাম নখর, পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে, ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।" যে কবি চিরদিন মানবের জয়গান করেছেন তাঁর পক্ষে এই অবস্থা দুর্বিষহ। এ কথা অস্বীকার করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে যে মানুষ তার জীবনের সার্থকতার দিকে অচেতন, সে আজ "আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে, বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়, ইতিহাসময়।" কাজেই

কালান্তরের ঘোষণা আজ আকাশে বাতাসে মুখর হয়ে উঠল, কবি অনুভব করছেন—"জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা সুতীব্র অক্ষমা।" এ কথা আজ প্রায় নিশ্চিত যে এই শ্মশানতাণ্ডবের মধ্যেই এ যুগের অবসান ঘটবে, কেন না মানুষ আপন সত্তার বিপর্যয় ঘটাতে ঘটাতে যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখান হতে তার সহজে উদ্ধার নেই ; চিতাভস্মের ভিতর দিয়ে ছাড়া নবযুগের আগমন সম্ভব নয়—

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান। —জন্মদিনে, (২১নং কবিতা

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী হতে রচিত কবিতাগুলির রীতি ও প্রকৃতিও সেইজন্য নতুন। পূর্বে এ কবিতাগুলির ছন্দ, ভাষা ও কথনভঙ্গীর যে বিশেষত্বের কথা আলোচনা করেছি তার মূল এইখানে। গোড়ার দৃষ্টিভঙ্গীটাই পৃথক্, সেইজন্য তার প্রকাশের ভঙ্গীও অন্যরকম। গীতাঞ্জলির ভাষা ও ছন্দের নিবিড় মৃদু মাধুর্যে এই সুতীব্র অক্ষমা অসন্তোষ এরকম ভাবে প্রকাশ করা চলতো না, এর জন্য চাই স্ফুলিঙ্গ। পূর্বে ভাষার সংক্ষিপ্তি ও তীব্রতা, উপমার দীপ্তি সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছি তা এই স্ফুলিঙ্গের কাজ করে—সংক্ষিপ্ত পরিধিতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যে গভীর অনুভূতি, তীব্র রোষ, পুঞ্জীভূত অসন্তোষ স্ফুরিত হয়ে উঠেছে তা কেবলমাত্র এই আঙ্গিকেই সম্ভব এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই সম্ভব। কিন্তু শুধু তাই নয়, এমন এমন দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে যা সাধারণত তাঁর কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং যা কোনো আনন্দ-উচ্ছল কবির গানেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সমাজজীবনের নানা

অন্তরঙ্গ এবং এ-পর্যন্ত-অনাদৃত চিত্র এ কবিতায় সম্মান পেলে। গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ দূরদেশে চলেছে, প্রাচীন অশথতলায় খেয়ার আশায় লোক বসে থাকে, গঞ্জের টিনের চালাঘরে সারি সারি গুড়ের কলস, সেখানে কুকুর আর মাছির প্রাদুর্ভাব, বলদের পিঠে স্তূপাকার শর্ষে, কাঠি হাতে কৃষাণবালক তরমুজ-লতা হতে ছাগল তাড়ায়, ইঁদারার টানা জল ভুট্টার ফসলে প্রাণ দিতে নালা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে, পিতল-কাঁকন-পরা হাতে ভজিয়া একটানা সুরে জাঁতায় গম ভেঙে চলেছে। আজ জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা কবির মনে এই সব উপেক্ষিত ছবি এনে দিচ্ছে, এগুলি তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে। তিনি অনুভব করছেন বিশ্বরাষ্ট্রচক্রে যে নয়নস্তম্ভন পরিবর্তন চলেছে তার আড়ম্বর যতই থাক সে সবই অন্তঃসারশূন্য, তার পিছনে আছে প্রকৃত মানুষের দল যারা এই মনুষ্যত্বের অপমান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যারা এই আড়ম্বরের পিছনে নিজেদের কাজ নিঃশব্দে করে চলেছে।

আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।

মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কল কলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥

যে সাম্রাজ্যগুলির উত্থানপতনের কথায় আমাদের ইতিহাস মুখর মানব-সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাসে তাদের স্থান নেই। সেখানে প্রয়োজন অনাদৃত উপেক্ষিত সমাজের ছবি, পদদলিত অপমানিতের ইতিহাস। কিন্তু এই ছবি আঁকতে বা এই ইতিহাসরচনায় অনুকম্পার সুর নেই, কারণ দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পার মূলে থাকে ঘৃণা, আত্মম্ভরিতা ও স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্বে অবিচল বিশ্বাস। তাদের এই সম্মান তাদের স্বকীয় অধিকারেই প্রাপ্য। মনুষ্যত্বের এই অপমান যতদিন চলবে ততদিন সাহিত্য সার্থক হয়ে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর নিজের কৃতিত্বেও সন্দেহ করেছেন—

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
...
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

খ্যাতি-অখ্যাতির সীমানার পারে এসে কবি নিজের ত্রুটি স্বীকার করছেন কেবল মানবমহিমার প্রকৃত মূল্য দেবার জন্য,—যে গৌরব অত্যাচারিত-দের প্রাপ্য সে গৌরবের যথোচিত গান তাঁর পক্ষে গাওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে না এই আশঙ্কায়। "তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা, আমার সুরের অপূর্ণতা।" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে অপূর্ণতা কবির সুরের নয়, প্রকৃত কথা এই যে, মানুষকে কবি যে মহৎ সম্মান

দিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখনীও যথেষ্ট নয়। এই সম্মাননার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের শ্রেণীবিভাগ, মানুষে মানুষে পার্থক্য-রচনা। কবিকে বাধা পেতে হয়েছে তাঁর বিচিত্র অনুভূতির পথে, সম্মানের চিরনির্বাসনে তিনি সমাজের উচ্চমঞ্চে বন্দী। কিন্তু এই ভেদরচনা চিরকাল সম্ভব নয়—

আসিবে বিধির কাছে হিসেব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে॥

৩

এই হলো হাওয়াবদলের সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু এ ছাড়াও এই হাওয়াবদলের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে যার সুস্পষ্ট ছাপ এই কবিতাগুলিতে। তার বহু বৈচিত্র্যের সব দিক আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু তার দু-একটি দিকের নবীনতা অনস্বীকার্য।

কিছুদিন হতেই রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুর যে ছায়া পড়েছিল তার প্রথম পরিচয় সম্ভবত 'প্রান্তিক'-এ। সে ছায়া কালো ছায়া, তার মধ্যে যন্ত্রণা আছে কিন্তু সমারোহ নেই। সেইজন্য এ মরণ তাঁর 'শ্যাম-সমান মরণ' হতে পৃথক, এর মধ্যে কবির নবজাতক-এর দৃশ্যপট উন্মীলিত হচ্ছে না। এই করাল ছায়া প্রসারিত হয়েছে তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থগুলিতে। নানা কবিতায় তার আভাস। "পীড়নের যন্ত্রশালে চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত, কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।" রও বিস্ময় মানুষের যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতায়। "মানুষের ক্ষুদ্রদেহ, ন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।" কিন্তু এই যন্ত্রণায় তাঁর অন্তরাত্মা বিচলিত হয় নি; সেই অন্তরাত্মার একটি দেহবিচ্ছিন্ন আত্মস্বরূপ আছে যাতে দেহের যন্ত্রণা তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি।

"এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয়যাত্রা—

বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—

এই উপেক্ষা সম্ভব হয়েছে কেন না তাঁর মন সত্তার আবরণমুক্ত।

আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম মোর খ্যাতি
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা কিছু হারাল মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।

আমিশূন্য আমির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে মৃত্যুর করাল ছায়া সত্ত্বেও নিজের তরী নিজের হাতে সাজানো। কেন না,—

অন্তহীন কালে
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।

আর,

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদ দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,

সেথায় নিশান্ত-যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

সেইজন্য এখনও তাঁর বিস্ময়, এখনও তিনি বলেন "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি," এখনও "মোর চেতনায়, আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়," তিনি যে অপরিমিত দান পেয়েছেন তার জন্য তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। পৃথিবীর বর্ণসমারোহ ঐশ্বর্য এখনও নিঃশেষ নয়, তাঁর এখনও আক্ষেপ তাঁর "স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক।" বিরাট্ মানবচিত্তের অকথিত বাণীপুঞ্জের প্রকাশ করার দায় হতে কোনোকালেই তাঁর মুক্তি নেই। কিন্তু এই দায়ভারেও কবি কেন্দ্রচ্যুত হন নি। 'আমিশূন্য আমি' কুহেলিকামুক্ত চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই সম্ভব হয়েছে চরম মুহূর্তে নিজের জীবনতরী নিজের হাতে সাজানো। তাঁর এই 'আমিশূন্য আমি' তাঁর জীবনবেদের একটি নব পর্যায়। পূর্বে দেখেছি তাঁর জীবনদেবতার নানারূপ, কিন্তু সবসময়েই সেই জীবন-দেবতার সঙ্গে তাঁর একটি নিবিড় যোগ বর্তমান। কিন্তু শেষ পর্যায়ের জীবনবেদ সম্পূর্ণ পৃথক্, তার মধ্যে জীবনদেবতা নেই, আছে শুধু চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি। মান-অভিমান, দেওয়া-নেওয়া, মিলন-বিরহের পালা নেই, আছে নির্মোহ স্বরূপবোধ, নিশ্চিন্তে বোঝাপড়া, সশ্রদ্ধ আনন্দস্বীকৃতি। রসের লীলার পরিবর্তে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ। নিজের জীবনের লীলায় কবি নিজেই দর্শক, সেখানে "আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস", সেখানে "লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে, ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।" তিনি অনুভব করছেন,—

পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু মাঝে।

এই নৈর্ব্যক্তিকতার ফল সুদূরপ্রসারী। এমন কি এই কবিতাগুলির

যে বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি তাদের মানস-ইতিহাসে এই নৈর্ব্যক্তিকতার একটা বড়ো স্থান আছে, এ কথা বলা সম্ভবতঃ অত্যুক্তি নয়।

৪

রবীন্দ্র-কাব্যে জীবনবেদ একটি বিস্ময়কর বস্তু। ক্ষুদ্র পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও এই শেষ-পর্যায়ের নব জীবনবেদের কথা যে সংক্ষেপে উল্লেখ করলুম তার একটি কারণ আছে। সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে দুটি জিনিসের ঘাতপ্রতিঘাত থাকে। পূর্বে বলেছি, যেখানে সাহিত্যসৃষ্টি চলছে সেখানে শিল্পী একা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন।" এই হলো সাহিত্যরচনার ক্রিয়া। কিন্তু এর পিছনে আরও একটি ইতিহাস আছে। "সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না।" এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে। সেইজন্য যখন সমাজে হাওয়াবদল হলো তখন তার অনুভব প্রথম সাড়া তোলে কবির সংবেদনশীল মনে, তাঁর ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটা তখন বিচিত্র নয়। সেইজন্য হাওয়াবদলের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির উপকরণও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে হাওয়াবদলের সঙ্গে সৃষ্টি-বদলও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই উপকরণগুলি কবিকে তৈরি করে না, কবিই সেই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করেন। সেইজন্য যখন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে কবির মনের মিল নেই তখন তাঁর শিল্পকার্যে রুচি থাকে না, কেন না তাঁর সৃষ্টির উপকরণ তাঁর মনের মতো নয়। এখানেই সমাজ সাহিত্যের উপর ছায়া ফেলে। যে কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের মিল হলো না তাঁর কাব্যে অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিকতা, দুর্বোধ্য ভাষা ও উপমা দেখতে

পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় নয়, সেখানে কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবির পরিবেশের সংঘাত চল্‌ছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা কোনও সচেতন কবিরই মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, কেন না মনুষ্যত্বের যে জয়গান কবির প্রাণধর্ম সেই প্রাণধর্ম পালনের পথে একালের সমাজব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীতে সব চেয়ে বেশি কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক, কারণ তাঁর চেয়ে স্বাধর্ম্যসচেতন কবি দেখা যায় নি। কিন্তু তাঁর কাব্যের শেষ-পর্যায়ে তিনি কবিধর্মের যে জয়গান গাইলেন তার মূলে আছে এই নৈর্ব্যক্তিকতা। মনে হয় কবি সকল সমস্যা সকল ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে থেকেও বিচলিত হন নি, তাঁর আপাতঃ-নির্লিপ্তির মধ্যেই এই ঘাতপ্রতিঘাতের সমন্বয় ঘটেছে। একদিকে অপমানিত উপেক্ষিতের মানবিক দাবীর সম্পূর্ণ স্বীকার অথচ অন্যদিকে এই নৈর্ব্যক্তিকতা—এই দুয়ের ফলেই এই কবিতাগুলিতে তাঁর পক্ষে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে এই কবিতাগুলিতে এই পরিবর্তন। তারা সকল বাহুল্য ছেঁটে ফেলে দৃঢ় ঋজুতায় প্রতিষ্ঠিত হলো। এ কবিতা খাঁটি কবিতা, অর্থাৎ তার মধ্যে কেবল কবিতার প্রাণবস্তুটি আছে, কোনও আবর্জনা নেই। এই আদর্শ শুধু যে কাব্যরচনায় নব রীতির নিদর্শক তাই নয়, সমাজে যেমন কাব্যেও তেমন সকল বন্ধন ভেঙে ফেলার ফলেই সম্ভব হলো অনাদৃত অপমানিতের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া, কবিধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন এই কারণে কবির পরিবেশের সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঘটে নি, অন্যদিকেও তেমনি বক্তব্যের সঙ্গে আঙ্গিকের অদ্ভুত মিল দেখা গেল। এর প্রত্যেকটিই সার্থক, একটি ছাড়া অপরটির অন্য কোনো উপায়ে সুন্দরতর প্রকাশ সম্ভব হত না।

বাংলার আধুনিক কবিরা যখন রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্যায়ের কবিতাগুলির সমালোচনা করেন তখন তাঁদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে প্রায়শঃই

ইঙ্গিত থাকে এইবার তাহলে রবীন্দ্রনাথও বাংলার আধুনিক কবিদের দলে, তাঁর পক্ষেও আর এসব এড়িয়ে থাকা চলছে না। 'নবজাতক'-এর সমালোচনায় কোনো আধুনিক কবি বলছেন, "মানি, কাব্যসমালোচনায় এ-সব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এ-সব প্রশ্ন এড়িয়ে কাব্য যে আর চলতে পারছে না, এই 'নবজাতক' গ্রন্থই তার একটি প্রমাণ।" 'কবিতা' পত্রিকায় 'সানাই'-এর যে সমালোচনা হয়েছিল তাতে 'বাদুড়' 'অন্ধকার' প্রভৃতি 'আধুনিক' রূপক রবীন্দ্রনাথ ক'বার ব্যবহার করেছেন সমালোচক উৎসাহসহকারে তার বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা ও হাস্যকর। আধুনিকতা রূপকের দ্বারা সৃষ্ট হয় না। তার জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর—এবং স্বতন্ত্র আঙ্গিকেরও। কিন্তু যাঁরা মনে করেন সোনালি চাঁদের পরিবর্তে সবুজ চাঁদ বললেই চরম আধুনিকতা হলো তাঁরা কাব্যের মূল প্রকৃতির অবমাননা করেন। পরিবর্তনটা ভিতরের তাগিদে, বাইরের ফ্যাশানে নয়। সেইজন্য যদি মনুষ্যত্বের অমর্যাদার ফলেই বর্তমান সমাজ ও বর্তমান সাহিত্যের অস্বাস্থ্য তা হলে সে রোগের প্রতিবিধান হচ্ছে মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া। সেটা কি ভাবে সম্ভব এ যুগে তার আধুনিকতম এবং অতি চমৎকার নিদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের শেষ-পর্যায়ে। কিন্তু যাঁরা আধুনিকতার নামে পূর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কিন্তু ক্ষুদ্রতর গণ্ডী রচনা করে জনসাধারণ হতে নিজেদের আরও দূরে সরিয়ে রাখবেন, সমাজবোধের নামে উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতাকে চালাতে সংকুচিত হবেন না, সামাজিক কারণে তাঁদের উৎপত্তিতে বিস্মিত না হলেও এ কথা নিশ্চিত যে তথাকথিত আধুনিকতার আবরণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক কবিদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন পুরাতনের পুরাতন এবং নূতনের নূতন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পিঠচাপড়ানি সমালোচনা না করেন, কেন না সেটা স্বকীয় ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর খ্যাতির বোঝা নিঃসংকোচে নামিয়ে রেখে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন সেই আধুনিক কবিকে যে কবি এই কৃত্রিমতার আবরণ থেকে

কাব্যকে মুক্তি দেবেন, মানুষ আজ স্বকৃত গণ্ডীর বন্ধনে তার যে সহজ মহিমাকে বিস্মৃত হতে চলেছে সেই মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি বলেছেন—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

রবীন্দ্রনাথের এই মহা-উত্তরাধিকারের দায় কার জানি না, কিন্তু তাঁর সাবধানবাণী আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়,

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।

নবযুগের কাব্য—'আধুনিক' কবিতা

বর্তমান কাল রবীন্দ্রনাথের চিত্তক্ষেত্রে যে ফসল ফলালো সে ফসল অন্যত্র খুঁজতে যাওয়া বৃথা। সোনার ধান ফলাবার জন্যে তেমনি জমি চাই। কিন্তু আমার বক্তব্য তা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পর শুধু যে সোনার ধানই ফললো না তাই নয়, ধানই ফললো না, ফললো 'ক্যাকটাস ফুল' আর 'ফণিমনসার বন'। কথাগুলি আমার মনগড়া নয়, সাম্প্রতিক কবিতায় ঐ নাম দুটীর ছড়াছড়ি। দুই-ই ফসল, কিন্তু বিভিন্ন জাতের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সরস জমি হঠাৎ মরুভূমি হলো কি ভাবে ? তার কারণ কি ? এই কথাটা না বুঝলে বর্তমান বাংলা কাব্যের ধারা বোঝা সম্ভব নয়।

তা হলে 'আধুনিক' কবিতা কি ? প্রকৃত সাহিত্যবিচারে ওরকম 'আধুনিক' খুঁজবার চেষ্টা হাস্যকর, কেন না চিহ্ন মিলিয়ে 'আধুনিক' কবিতা খোঁজা সাহিত্যবিচারে সবচেয়ে বড়ো মূর্খতার পরিচয়। বস্তি সাহিত্য, ছন্দহীনতা, অসংলগ্নতা, সংক্ষিপ্তকরণ, এগুলিই যদি আধুনিক কবিতার পরিচয় হয় তা হলে রবীন্দ্রনাথেরও অনেক বই বাদ যাবে। সুতরাং এগুলিই যে আধুনিকতার সম্পূর্ণ চিহ্ন নয় সে কথা বোঝাতে অন্য প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়। জীবনানন্দ দাশ যে অর্থে আধুনিক, বুদ্ধদেব বসু সে অর্থে আধুনিক ন'ন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ও ন'ন, এমন কি কোনো একজন কবিও চিরকাল এক ধরণের কবিতা লেখেন না, তাঁরও মনের বিবর্তন আছে, তা না হলে তিনি তো কবি-ই ন'ন। সে হিসেবে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেও 'আধুনিকতা'র মাত্রার তারতম্য ঘটে। কিন্তু যেহেতু তিনি মার্কামারা 'আধুনিক' সাহিত্য লিখলেন না সেহেতু তিনি কবি ন'ন, এ কথা কোনোক্রমেই বলা চলে না। একটী উদাহরণ নেওয়া যাক্। অনেকেই একমত হবেন বিষ্ণু দে'র কবিতা ক্রমিক উন্নতির পথে। কিন্তু তাঁর 'চোরাবালি'তে যে বৈহাসিক রূপ এবং যে কাটাছেঁড়া

উক্তি, 'পূর্বলেখ'-এ তা নেই। তবুও 'পূর্বলেখ'-এ তাঁর 'আধুনিকতা' ঠিকই আছে, বরং আরো ফুটেছে। সুতরাং 'আধুনিক' কবিতা বলে আলাদা জাতি-নির্দেশ করার চেষ্টা এক হিসেবে সম্পূর্ণ নিরর্থক। একালের সহৃদয়দের হৃদয়সংবেদ্য হলেই তো সে কাব্য আধুনিক হলো, সে কালিদাস-রবীন্দ্রনাথও হতে পারেন, চসার-শেক্‌স্‌পীয়র হতে পারেন, এলিয়ট-স্পেণ্ডার হতে পারেন, বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে'ও হতে পারেন। মানবমনের বৈচিত্র্য স্বীকার করলে আনন্দ জন্মানোর ব্যাপারে কারো একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করা চলে না। আর কাব্য সার্থক হয় বিষয়বস্তুর জোরে নয়, কবিধর্ম ও কবিকর্মের গুণে। অবশ্য প্রশ্ন ওঠে সহৃদয়তার সংজ্ঞা কি। এর উত্তরে বলা চলে ও প্রশ্নটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই সম্ভব এবং কবি ও পাঠকের বৃহত্তম এবং গভীরতম সংযোগ নিঃশ্রেণীক সমাজ ছাড়া অন্যত্র ঘটে ওঠে না।

তবুও 'আধুনিক' কথাটা ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ সম্ভবতঃ আছে। কাব্যে যুগে যুগে নানা রূপবদল হয়েছে, তবু তার মধ্যে কতকগুলি মূলসূত্র বজায় ছিলো। যেমন ছন্দের প্রাধান্য। কিন্তু সম্প্রতি এমন এক জাতের কাব্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যেগুলির মধ্যে শুধু যে রোমান্টিক কাব্যের লক্ষণগুলিই সযত্নে পরিহার করা হয়েছে তাই নয়, চিরাচরিত মূলসূত্রগুলিও বহুপরিমাণে অস্বীকৃত হচ্ছে। ছন্দ-বর্জনের কথাটাই বলা চলে। গদ্যের যে কাব্যক্ষমতা আছে এ সত্যটা এতদিন ঠিক এভাবে স্বীকৃত হয়নি। অবশ্য আঙ্গিকই যে কাব্যের সর্বস্ব এমন কথা বলছি না। কিন্তু তবু কিছু কিছু মৌলিক পরিবর্তন যেন দেখা দিতে শুরু করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শুধু আঙ্গিকের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে ওঠে নি', সেখানে কাব্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আর অস্বীকার করা চলে না যে কোনো কোনো তরুণ প্রতিভাবান্ কবি এই সমস্ত নতুন আঙ্গিকে এমন কাব্য রচনা করেছেন যেগুলি মনগড়া তত্ত্বের চাপে বিকৃত নয়, কাব্য হিসেবেই সার্থক। একালের মন যদি গদ্যে কাব্যরস পায়, অসংলগ্ন উক্তি, প্রতীক-ব্যবহার প্রভৃতি

যদি তার রসবোধের উদ্রেক করে তা হলে একালের কাব্যে ঐ লক্ষণগুলি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, বরং দেখা না দিলেই সন্দেহ হয় কবিরা উজান ঠেলছেন। আসলে পরিবর্তনটা আঙ্গিকের নয়, বিষয়বস্তুর নয়, বলার ভঙ্গীরও নয়, আসল পরিবর্তন মনের, রুচির ও রসবোধের সংস্কারের। আধুনিক বলতে এই রকম কতকগুলি জিনিসকে বুঝি, বুঝি ওটা এই পরিবর্তনেরই একটা লাগসই নাম। তার বেশী চাপ দিলে ভার সইবে না।

এই পরিবর্তন এদেশ ও বিদেশের মনে সম্প্রতি এসেছে, কেন না আমাদের চারপাশের হাওয়া অন্য। পূর্বে বলবার চেষ্টা করেছি, সমরোত্তর যুগের দোহাইটা আমাদের পক্ষেও একেবারে নকল, সুতরাং বাজে নয়। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসে যে সংকট ক্রমবর্ধমান এবং বর্তমান সামাজিক বিবর্তন সেই ক্রমবর্ধমান সংকটকে যে ভাবে গভীরতর করে তুলছে তাতে কাব্যে নতুন ভঙ্গী আসা একান্ত স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত যে শ্রেণী আমাদের সমাজ-বিবর্তনের পুরোভাগে চলেছে তার মধ্যে ফাটল ধরলো, সম্প্রসারণের পরিবর্তে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই সঙ্গে প্রতিদিন যে নিরাশা ও হতাশ্বাস জনমানসে ঘনীভূত হচ্ছে তার মধ্যে কবিরা আশার বাণী শোনালে আনন্দিত হবো সন্দেহ নেই, কিন্তু না শোনালেও বিস্মিত হবো না। রবীন্দ্রনাথের পর বহু কবিই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নির্ভয়ে না হলেও ভয়ে ভয়ে বলা চলে সম্ভবতঃ এঁদের কেউ-ই স্থায়ী কবি-খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ সম্ভব নয়। তাঁর মনে স্বদেশের প্রাণধারা ও বৈদেশিক সভ্যতার রসের যে চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল সে রকম ভারসাম্য না থাকলে ওরকম সংবেদনাশীল মন বজায় রাখা এবং ঐ ধরণের কাব্য লেখা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ দু-এক ক্ষেত্র ছাড়া কখনও ভারসাম্য হতে বিচ্যুত ন'ন বলেই তাঁকে নানা সামাজিক উপচার ঢুকিয়ে কাব্যকে জোর গলায় আধুনিক করবার চেষ্টা করতে হয় নি, তাঁর আধুনিকতা অন্য পর্যায়ের।

কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের উত্তরাধিকারী না হয়ে তাঁর অনুকরণ করেছিলেন তাঁদের দুই-চারটী কবিতা অচল না হলেও কবি হিসেবে তাঁদের কোনও স্থায়ী আসন প্রায়ই নেই। এমন কি তাঁদের কোনও কোনও কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চেয়ে ভালো হলেও বলবো সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের চেয়ে বড়ো কবি, কেন না সত্যেন্দ্রনাথের একটী নিজস্ব মানসিক গঠন ছিলো, যা এঁদের নেই।

এই সময়েই দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার ছায়া পড়লো। ভাঙন আরো বাড়লো, সংঘাত তীব্রতর হলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর যেমন প্রথম অসহযোগ আন্দোলন একটী নতুন ভঙ্গীর সূচনা করেছিলো এই যুগের পর আর একটী নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, কতকগুলি জিনিষ খুব বড়ো হয়ে দেখা দিলো যা পূর্বে এ আকারে দেখা যায় নি। একদিকে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার এবং অন্যদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্ম হতে প্রমাণ হয় বর্তমান সমাজব্যবস্থা এদেশেও যেমন একদিকে অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি এই মৃত্যু-তরঙ্গিনীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে নতুন তটভূমি জেগে উঠছে, সেখানে নতুন ফসল ফলে—এই প্রদোষ-অন্ধকারের পিছনে নতুন উষার অরুণিমার সন্ধান মিলছে। কবিতার পক্ষে এর গুরুত্ব অসাধারণ। আমাদের সমাজে এখন এই দ্বিধারা প্রবাহিত। যাঁরা নবযুগের আশায় উল্লসিত তাঁরা ভাগ্যবান্, তাঁদের কবিতায় অনেক পরিমাণে সুস্থতা ও ভারসাম্যের সন্ধান মেলে। কিন্তু অধিকাংশ তরুণ কবিরই সে সৌভাগ্য হয় নি, তাঁরা বাহ্যতঃ নতুন যুগ নতুন উষার কথা আওড়ালেও আসলে তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে তাঁদের কাব্যে একটী অসুস্থ মনোবৃত্তির সন্ধান মেলে। চারপাশে একটী sense of glittering decay-ও নেই, সবই ধূলি-ধূসর, সন্ধ্যা-অন্ধকারে বিলীয়মান। সে মৃত্যু মহৎ মৃত্যু নয়, সে হচ্ছে দুর্বলের দীর্ঘায়িত রুগ্ন মৃত্যু, যার মধ্যে শ্রদ্ধা বিস্ময়ের কোন কারণই নেই, বরং জুগুপ্সার কারণ আছে।

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রামিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

যে সমালোচকেরা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের নিন্দায় মুখর তাঁদের স্মরণ রাখা ভালো এ কাব্য আর যাই হোক্ সামাজিক কারণেই এসেছে, সে হিসেবে তারা যুগধর্মের পরিচায়ক এবং সার্থক। যদি এ কাব্য সুস্থ কাব্য নয় এই অজুহাতে কেউ এঁদের নিন্দা করতে চান তাহলে তাঁদের উচিত হচ্ছে অভিযোগ আনা কবির বিরুদ্ধে নয়, (অক্ষম কবিদের কথা অবশ্য বলছি না) কবির পরিবেশের বিরুদ্ধে, কবির চারপাশের হাওয়ার বিরুদ্ধে—যার ফলে সাধারণভাবে কবির এবং কাব্যের এই দুর্দশা ঘটলো। যাঁরা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের নিন্দা করেন তাঁরা একহিসেবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বাংলার সাম্প্রতিক সমাজব্যবস্থার নিন্দা করেন। তাঁরা বাহ্যতঃ সমাজবোধের উপর খড়্গহস্ত, কিন্তু তাঁরা যে উদাসীন ন'ন, বরং খড়্গহস্ত এই কথা হতেই প্রমাণ হয় তাঁরাও সমাজবোধে চঞ্চল, এবং চঞ্চল বলেই খড়্গহস্ত। কথাটা চক্রিক ন্যায়ের মতো শোনায়, কিন্তু তা নয়। তাঁদের পক্ষে সমাজবোধের ইঙ্গিত নেতিমূলক, সেই জন্যে ভয়ংকর ভবিষ্যৎকে স্বীকার করা তাঁদের সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের অবিমিশ্র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত তাঁদেরও বিচারশক্তি প্রশংসনীয় নয়। এ কাব্য নবযুগের কাব্য নয়, অন্ততঃ সমগ্রতার দিক্ থেকে নয়। এ হচ্ছে ভাঙনের যুগের কাব্য, যেসময় ভোরের আলোর অস্পষ্ট আভাসের চেয়ে রাত্রির অন্ধকারটাই বৃহত্তর সত্য। এতে কতকগুলি বাঁধন ভাঙবে, নতুন আঙ্গিক দেখা দেবে, কিন্তু সেকারণে সুস্থ কাব্য দেখা দেবেই একথা বলা চলে না। কবিতাভবন হতে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র একজন সম্পাদক এই কথাটাকে ধরেছেন। "এই আশুবিলীয়মান সভ্যতার ধূলিধূসরিত পটভূমিকায় কিন্তু ফুটে উঠছে

নতুন এক সমাজের অরুণ রেখা। সে-সমাজের সংস্কৃতি কী রূপ ধারণ করবে, তার সাহিত্য তার শিল্প কী আদর্শ বরণ করবে, তা এখনো নিশ্চিত করে বলবার সময় আসেনি। ইতিমধ্যে শিল্পীর কাজ পুরাতনের ভগ্নাবশেষ ঝেঁটিয়ে ফেলে নূতনের পথ পরিষ্কার করা।"

এইখানে একটা কথা আলোচনা করা দরকার। আমাদের এ কথাটা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে বর্তমান বাংলাকাব্য নবযুগের কাব্য নয়, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মানসেরই কাব্য। সে হিসেবে সে এখনও অতীতেরই জের টেনে চলেছে, ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের বাঁধন তার দৃঢ়তর। বর্তমান কাব্যের দুরূহতা, কঠিনতা, কষ্টকল্পনা—এগুলির কারণ এইখানে। সুজলা মাটী মরুভূমি হবার কারণও এইখানে। এর অর্থনৈতিক কারণ পূর্বেই বলেছি। বর্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের মানসগঠন আলোচনা করলে এ কথাটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকালকার কবিতার যেমন একটী লাগসই নাম 'আধুনিক' কাব্য, তেমনি এই বর্তমান মধ্যবিত্ত সভ্যতার নাম দেওয়া যেতে পারে 'বালীগঞ্জ' সভ্যতা। অবশ্য এই নামকরণকে শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু অস্বীকার করেছেন; বলেছেন, "অতি-আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে কতগুলো প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে তরুণ-তরুণী, ঢাকুরিয়া লেক, ইভনিং-ইন-প্যারিস, বেবি-অষ্টিন, চা-পার্টি, মেট্রো সিনেমা ইত্যাদি বাক্য ও বস্তুর ছড়াছড়ি, এবং এগুলোই আবার আজকালকার এক ধরণের সাহিত্যের উপজীব্য। লেকের কাছাকাছি ব'লেই হোক, কিংবা অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত পূর্ববঙ্গীয়দের বাসভূমি ব'লেই হোক, হতভাগ্য বালিগঞ্জই এই 'অতি আধুনিক' সমাজের লীলাভূমি বলে কল্পিত হয়। কিন্তু আমরা যারা দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা, আমরা পথে ঘাটে রোমান্স ছড়ানো দেখতে পাইনে, কিংবা আজকালকার ছেলেমেয়েরা নীতিধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে উদ্দামতার স্রোতে ভেসে চলেছে তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ-সব বেশির ভাগই তরুণ যশোলিপ্সুদের রুদ্ধরতিপ্রসূত

কল্পনামাত্র।"[১] কিন্তু শ্রীযুত বসুর এই অস্বীকৃতি মানা চলে না। বর্তমান মধ্যবিত্ত মানসের স্বরূপ কি? শ্রীযুত হুমায়ুন কবিরের কথায় "জনসাধারণের সঙ্গে শিথিল-সম্বন্ধ যে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী, দেশের গ্রাম-সভ্যতার সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়ে গেল।...ইয়োরোপকে গ্রহণ করেও ভারতবর্ষকে ভোলেননি বলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী। কিন্তু শিক্ষাবিভ্রাটের ফলে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিকদের অবচেতনায় ইয়োরোপ ক্রমে ভারতীয় ঐতিহ্যকে ছাপিয়ে উঠল বলে দেশের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ শিথিল হয়ে এল। বাঙলার কাব্য-আদর্শে যে সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব ও লক্ষ্য-বিভ্রান্তি, তার প্রধানতম কারণ দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবধান ও হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাশ্রয়চ্যুত পর-মুখাপেক্ষিতা।"[২] আমাদের দেশের সমাজ-বিবর্তনের যে বৈশিষ্ট্যের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে সমাজনেতৃত্ব এসে পড়েছিলো, এই ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসংকটে সেই মধ্যবিত্তসমাজ ক্রমেই আত্ম-সর্বস্ব এবং দেশের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন হতে চলেছে। 'বালীগঞ্জ' কথাটার অর্থই এই। মধ্যবিত্ত-সমাজ এখন শুধু যে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিই দুর্দম ঘৃণা পোষণ করেন তাই নয়, পূর্বে তথাকথিত-নিম্নশ্রেণীগুলির প্রতি যে মধ্যযুগীয় স্নেহ প্রীতির বন্ধন ছিলো সে বন্ধন-ছেদনেও তৎপর। অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে মুটে মজুর কাব্যের বিষয়বস্তু পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখা চলে না। আধুনিক কবিরা বালীগঞ্জে মানসিক শান্তি পাবেন সে তো স্বাভাবিক, কেন না এ পরিবেশে সুদূর-প্রসারী দায়িত্ব দূরে থাক্ পথচলতি জীবনে নিকট-প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধও গড়ে ওঠে না। 'বাসা'-জীবনে পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব বন্ধনের দায়ও নেই, একেবারে হঠাৎ-জেগে-ওঠা প্রবালদ্বীপের মতো।

১। কবিতা, পৌষ, ১৩৪৮

২। হুমায়ুন কবির: বাঙলার কাব্য, ৯০ পৃষ্ঠা।

এই 'বাসা' প্রচলনের ফলে বাঙালী সমাজের কি পরিবর্তন ঘটলো তা যে-কোনও সমাজতাত্ত্বিকের আলোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু 'বুর্জোয়া' সংস্কার অস্বীকারের চেষ্টা আছে বলেই যে মধ্যবিত্ত মানসে সর্ববিধ সংস্কার অস্বীকার করার চেষ্টা আছে তা নয়। বরং তথাকথিত 'নিম্ন'শ্রেণীর প্রতি ঘৃণাও ক্রমবর্ধমান। ফলে এদিক্ ওদিক্ দুদিকই অস্বীকৃত হলো, বাকী রইলো আত্ম-সর্বস্ব অহঙ্কার। বড়লোকদেরও ঘৃণ্য জীব বলবো, কিন্তু গরীবদের সঙ্গে মেশাও সম্ভব নয়, হলোই বা তারা কাব্যের বিষয়বস্তু। অবক্ষয়ের ধারা চলেছেই। অবনীন্দ্রনাথ কথিত[৩] কাপড়-মোড়া গয়না পরার নম্রতা বহুদিন নেই, লোক-দেখানোর ইচ্ছা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রবল। তবে পূর্বে দেখান হতো মোতির সাতনর, আর এখন দেখানো হয় রূপোর দুল। মহাকাব্যের বদলে গদ্যকাব্য, বস্তুসর্বস্ব নয়, ভঙ্গীসর্বস্ব—ভারের বদলে শুধুই চটক! না-দেখানোর মনোবৃত্তি কারোরই নেই; বুর্জোয়া সমাজের এ মনোবৃত্তি সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু এদেশে এযুগে মধ্যবিত্ত সমাজের এই মনোবৃত্তি বোঝাও কঠিন নয়। আমাদের সমাজ-বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই যে অনেকাংশে বুর্জোয়া শ্রেণীর আসন গ্রহণ করেছে তাই নয়, ভাঙনের তীব্রতার সঙ্গে আকাশস্পর্শী অহঙ্কার এবং উট-পাখার আত্ম-প্রবঞ্চনাই এ শ্রেণীর একমাত্র সম্বল হওয়া স্বাভাবিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসন্ন বিনাশের এই লক্ষণগুলিতে ব্যথিত হবার কোনো কারণই নেই যদি এই লক্ষণগুলি হতে বোঝা যায় যে আমাদের সমাজ-নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণীর আসন্ন বিনাশ আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গীণ এবং মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা ছাড়া কিছু নয়। ঠিক এই কারণেই বর্তমান কাব্য সম্বন্ধে ব্যথিত হবার কোনো কারণই নেই, কেন না সে বর্তমান মানস-পরিমণ্ডলেরই সৃষ্টি। দুরূহতা, অন্তর্মুখীনতা, প্রতীকিতা সুস্থ কাব্যের লক্ষণ না হলেও যুগমানসেরই পরিচায়ক। সভ্যতার পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ জিনিস যেমন জন-

৩। ঘরোয়া।

সাধারণের অধিকতর অধিগম্য হচ্ছে তেমনি সংস্কৃতিও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল উপভোগের সুযোগ সংখ্যালঘু শ্রেণীর হাতেই পুঞ্জীভূত হচ্ছে—এ ট্র্যাজিডি বর্তমানে শুধু আর্থিক জগতে নয় সাংস্কৃতিক জগতেও সত্য।

বাংলা আধুনিক কাব্যে ক্রমিক বন্ধনমুক্তির ইতিহাস যে বিভিন্ন ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে উঠ্‌ছিলো, এই 'আধুনিক' কবিদের মধ্যে সেটা আরও একটী নতুন রূপ গ্রহণ করলো। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজ একদিকে যেমন বন্ধনমুক্তির চেষ্টায় তৎপর, অন্যদিকে তেমনি আত্মরক্ষার জন্যও উৎসুক। একদিকে বুর্জোয়া, অপর দিকে শ্রমিক সম্প্রদায়—এই উভয় সংগ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার গতিবৃদ্ধি হয়ে চলেছে। অবশ্য ব্যাপারটী এত সহজ নয়, এর মধ্যে নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘাতপ্রতিঘাত আছে—কিন্তু ব্যাপারটী ক্রমশঃ এইদিকে এগিয়ে চলেছে। সেইজন্যে একধারে বাহ্য বন্ধন মোচন এবং স্বকীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে পাঠকসমাজকে অস্বীকার করার চেষ্টা—বাংলা 'আধুনিক' কাব্যে এই দুটী ধারা পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে। রবীন্দ্রনাথ এই ক্রমিক বন্ধনমুক্তির ইতিহাসেও ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এবং তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁর ভারসাম্য বজায় ছিলো বলেই একদিকে যেমন তাঁকে সজ্ঞানে 'আধুনিক' হবার চেষ্টা করতে হয়নি, বরং একটী নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের শরিক হওয়া তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছিলো। কিন্তু যাঁরা পরের যুগের কবি তাঁদের পক্ষে এ ভারসাম্য বজায় রাখা প্রায়শঃই সম্ভব হয় নি। এর কারণগুলি পূর্বেই বলবার চেষ্টা করেছি, এখন কি ভঙ্গীতে তাঁদের ভাবধারা রূপায়িত হলো সেটাই আলোচনীয়। এ কবিরা যে প্রথমেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেছিলেন সেটী গভীর অর্থবহ। এটী ঘটেছিলো শুধু মহৎ-কে আক্রমণ যশ পাবার সহজতম উপায় বলে নয়, রবীন্দ্র-

নাথ তাঁর যুগমানসের স্রষ্টা এবং সব চেয়ে বড়ো প্রতিভূ বলেও। আর রবীন্দ্রনাথ কখনও দেশের সঙ্গে যোগচ্যুত হ'ন নি, তাও এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

এই ক্রমিক বন্ধনমুক্তির ইতিহাসে এখানে প্রশ্ন ওঠে, আমরা বাঁধন ভাঙার পথে কতদূর এগোতে পারি। পূর্বে বলেছি, বাহ্যজগতের মতো কাব্যজগতেরও একটা আপাতন্যায় আছে, বৈচিত্র্যের মধ্যেও বন্ধন আছে। মানবশরীরের সমগ্রতা ছেড়ে দিয়ে তার চোখ নাকের বৈশিষ্ট্যকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলাও চলে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শরীরবিচ্ছিন্ন ভাবে শুধু চোখ-নাকের বৈচিত্র্য অঙ্কনই ছবির পরমার্থ হতে পারে কি না। হাড়-মাস আলাদা করে সাজালে প্রাণবস্তু শরীর হয় কি না। যদি ওরকম সাজালে প্রাণের নানা নতুন দিক্ দেখতে পাই তাহলে সে সাজানোকে সাদরে গ্রহণ করবো, কিন্তু ওরকম সাজানোর ফলে যদি প্রাণরহস্যটাই উড়ে যায়, তা হলেও কি ওরকম সাজানো সার্থক? আধুনিক কাব্য-আলোচনায় এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার, বাঁধন ভাঙার পথে সাম্প্রতিক কবিরা কোন্ পথে কত দূর এগোলেন।

এ কালের কবিদের রচনা আলোচনা করলে এইরকম বাঁধন ভাঙার দুটী প্রধান ভাগ করা যেতে পারে—(১) ভাবগত (২) কৌশলগত। অবশ্য এ দুটী প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরস্পর জড়িত, কিন্তু বিশ্লেষণের মুখে এ দুটী ভাগ করা চলতে পারে। ভাবগত দিকে প্রথম যুগে দেখি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুযায়ী মৃদু 'আমি'-ময় কাব্যের পরিবর্তে এঁরা একটী উদ্দামতা ও সরব বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা করছেন, ফলে তাঁরা আর শুধু অন্তরলোক-নিবাসী ন'ন, তাঁদের দৃষ্টি বহির্মুখীন হতে শুরু করেছে। তারুণ্যের এই বিদ্রোহের কলরব সেকালের অনেক কবিতাতে মেলে। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাটী—

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্য্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম।

লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্য্যেরে অবিরাম।
তারি সন্ততি আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি।
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।
মাটি ও পাথর কাটি' আর কুঁদি দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ।
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
দেবতার অপমান!
লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ।

—প্রথমা

জীবনদেবতার সঙ্গে নিভৃত পরিচয় এ কবির ধাতে সইলো না, দেবতার নামে এই হীনতায় এ কবি পীড়িত। মানবতার অপমান লোক-দেখানো পূজায় কাটে না। আর আমাদের জীবন যে স্বতঃই উন্নতির পথে এগোয় না বরং আমাদের আদিম পশুবৃত্তি এই শ্রেণীসংঘাতের যুগে প্রবল হয়ে উঠছে তাতে কবি বর্তমান পরিবেশে সুস্থ বোধ করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে এই ধরণের সবল দাবী জানানো স্বাভাবিক। অবশ্য এ কবিতায় সে দাবী সুস্থ নয়, 'ভাই ভাই' ভাবও মোহোচ্ছ্বাসের নামান্তর আর, রবীন্দ্রনাথের কথায়, এই ধরণের 'তারুণ্যের' ঘোষণার আড়ালে মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে এ রকম একটা সন্দেহও জাগে।[৪] তবু যেন নতুন অভাববোধের আভাস আছে। সেই দাবীই কবি জানালেন পরবর্তী কবিতায়—

৪। সাহিত্যের স্বরূপ, ৩২ পৃষ্ঠা।

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই!
তুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই!

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা!
—প্রথমা

কিন্তু সে ঘোড়ায় সওয়ার হতে হলে দুঃসাহস চাই, পিছনে বাঁধন থাকলে চলে না। নিশ্চিন্তে সামনে এগোতে পারা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের নতুন করে হারাবার কিছু নেই, কিন্তু পাবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। অবশ্য এত বড়ো কথার সম্পূর্ণ অনুভূতি এবং কাব্যে তার রূপান্তরণ এ কবিতায় নেই। তবু বাঁকা বুলি শুরু হয়েছে। এ ঘোড়সওয়ারদের লগ্নে বৃহস্পতির সন্ধান নেই—

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু!
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু!
—প্রথমা

সেইজন্যে এ কবির দৃষ্টি বহির্মুখী—

আমি কবি ভাই কর্ম্মের আর ঘর্ম্মের,
বিলাস-বিবশ মর্ম্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নেই!

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়!
—প্রথমা

কবি কৃত্রিম বন্ধন কাটিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করছেন। তাঁর ছন্দ তীব্র ঝংকৃত নয়, আদি পঙ্কের ঋণ বহন করতে হলে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এ কবির মানসিক দ্বিধা কম, তাই তাঁর বক্তব্যও ঋজু ও স্পষ্ট এবং কবিতাও সার্থক। এই কথাই অন্য কবির রচনায় পৃথক্ চেহারায় দেখা দিয়েছে। আমাদের স্বকৃত নিয়মের কারাগারে আমরা বন্দী, কিন্তু আমরা তাকে বিধাতা-নির্দিষ্ট ভাগ্য বলে নিশ্চিন্তে বসে থাকি—কবি সেই বন্দীদশা ভাঙতে চান, বিধাতাকে অস্বীকার করতে চান—

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।
মনে করি, মুক্ত হবো; মনে ভাবি রহিতে দেবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত;
... ...
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।

সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিঃশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত সম নীল হ'য়ে গেছে সে-বন্ধনে।

—বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা

দুই কবির মধ্যেই বন্ধন মুক্তির চেষ্টা, কিন্তু দুজনে এক ধরণের কবি ন'ন। প্রথম কবির মানসিক দ্বিধা নেই, সমাজব্যবস্থা তাঁর মধ্যে দ্বৈমাত্রিক চালে বিভক্ত, এটা না হলে ওটা হবেই। এই সারল্যের ফলেই তাঁর সংশয় কম, কবিতা সরল—ভারাক্রান্ত নয়। কিন্তু দ্বিতীয় কবির মন আরো দ্বিধাগ্রস্ত, অনুভূতির জাল তাঁর আরও সূক্ষ্ম, নানা ছোট ছোট বিচিত্র কথা তাঁর মনে ধরা পড়েছে যা প্রথম কবির মনে ধরা পড়ে নি। এই জন্যেই দ্বিতীয় কবির ভাষা সম্ভবতঃ আরও ঝংকৃত এবং এই কারণেই সম্ভবতঃ তিনি স্পষ্টতঃ বলতে পারেন নি—"আমি কবি যত ইতরের।" ধনতন্ত্রের শেষ পর্ব হতে শ্রমিকতন্ত্রের প্রথম পর্বে যাত্রা সহজ নয়। অনুভূতির সূক্ষ্ম পীড়ন থাকলে পরম নিশ্চিন্তে হঠাৎ ঐ কথা বলা চলে না। সেইজন্যে যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিকে বন্ধনহীন ব্যক্তিক উদ্দামতার জয়গান গেয়েছেন এবং অন্যদিকে একই নিঃশ্বাসে মুটে মজুরের জয়গান গেয়েছেন,—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কাছে বিরোধী ঠেকে নি, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সেইজন্যে তিনি শুধু নিজের বিদ্রোহ জানাতেই তৎপর, মোহ-মাধুর্যকে অস্বীকার করতেই ব্যস্ত, কিন্তু নতুন কোনও ভিত্তি সংস্থাপনের চেষ্টা তাঁর নেই। বন্দনার নামে এ কারণেই তিনি তাঁর বিধাতাকে উপহাস করছেন—

আমি কবি, এ-সঙ্গীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটীরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।

লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

—বন্দীর বন্দনা

সেইজন্যে দেহের বিলাসে কবির লজ্জা নেই ঘৃণা আছে, প্রবৃত্তিকে মুখে অস্বীকার কিন্তু ভিতরে স্বীকার করার ভণ্ডামি নেই, বরং স্পষ্ট স্বীকার করেও তার মধ্য হতে কবি-আত্মার বন্ধন মোচনের চেষ্টা আছে—

উজ্জ্বল বসনবর্ণ, বিষবাষ্প, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
কৃত্রিম-রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
আমারে ডাকিয়া নিলো তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীরে।
সেখানে আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না,
কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

বাহিরিয়া এনু পথে। কণ্ঠ ঠেলি' জঘন্য ন্যক্কার
উঠিছে ব্যাকুল বেগে মর্মান্তিক আত্ম-অপমানে;
... ...
আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা—
মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন;
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ-বীভৎস ইন্দ্রিয়-মিলন—
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।
মোর তিক্ত চিত্ত ঠেলি' উঠিছে যে-ব্যাকুল প্রার্থনা
স্বপন-সঞ্জাত সেই সুন্দরের, সুদূরের তরে—
বিধাতা শোনে নি তাহা।
... ...
আমি যে রচিবো কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম; এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

—বন্দীর বন্দনা, মানুষ

কবি আত্মস্থ হতে পারেন নি, কেবল চঞ্চল,—বিরোধী ভাবধারায় বিখণ্ডিত। এর অপর দিক্‌টা হচ্ছে মায়া, মাধুর্য, শালীনতা প্রভৃতি যে

সমস্ত কাব্যিক আবরণে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম সেগুলিকে নির্মম ভাবে ধ্বংস করা। কবির চোখ মোহমুক্ত, কিন্তু অসুস্থ আকাঙ্ক্ষার পীড়নও স্পষ্ট।

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল—

(ওগো কঙ্কাবতী)

মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—

জানি, সে কিসের মূর্তি।

... ...

তবু ভালবাসি।

—বন্দীর বন্দনা, প্রেমিক

এইকারণে প্রেমের উচ্ছ্বাস নেই, ব্যঙ্গও দেখা দিলো।

বরং প্রেমের ভাণ করিয়ো না—সেই হবে ভালো :

কেন না,

ক্ষণিকের উত্তেজনা—সেই জীর্ণ, পুরাতন চুম্বন-আশ্লেষ—

তা-ই, তা-ই দাও মোরে, আপনারে করিয়া নিঃশেষ।

জানি, তব আর-কিছু নাই ;

শরীর সর্বস্ব তব—দাও তবে, দাও মোরে তা-ই—

বুঝিয়াছি, কিছুই থাকে না।

—বন্দীর বন্দনা, মোহমুক্ত

'বুঝিয়াছি, কিছুই থাকে না'—এই কথাটাই এ কবিতার প্রধান কথা। স্থায়ী মূল্যবোধ যে কালে সম্ভব নয় সেকালে প্রেমও মহৎ সুন্দর নয়, কেন না সে যুগে মনুষ্যত্ব অবমানিত। সে জারজ যুগে প্রেম দেহপণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেম তাই নিছক শোষণ—

অপর্ণা, আমারে তুমি ভালোবাসো বুঝি !

ভালোবাসো, আর ভাবো মনে,

আমিও তোমারে ভালোবাসি !

এতো কথা বোঝো তুমি, অপর্ণা, বোঝো নি এই কথা,
আমি চিরশত্রু যে তোমার !

... .

হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে ক্ষণে করিবো শোষণ
কায়াহীন বুভুক্ষু অধরে।
অতৃপ্ত আত্মার মতো অজানিত অন্ধকার হ'তে
শত-শত অমঙ্গল বীজ বহি' আনি'
সঞ্চারিয়া দিব তব বসন্ত-ভুবনে।

... ...

তিলে-তিলে আমি তব মৃত্যু হবো,
নিঃশেষ করিবো তোমা নির্মম আশ্লেষ-নিপীড়নে—

... ...

তবু তুমি চেয়ে থাকো মোর পথ পানে
প্রতি সন্ধ্যাবেলা—

—বন্দীর বন্দনা, অপর্ণার শত্রু

নিঃসন্দেহে বলা যায় কাব্যে এই ভঙ্গীটা নতুন। বাস্তবিকই আমরা যারা এই ভাঙনের যুগে জন্মেছি তাদের পক্ষে বৃহত্তর মূল্যবোধ কতখানি সত্য ? দৈনন্দিন হীনতা ক্ষুদ্রতাই কি সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে নি ? মানুষের মন যখন এইভাবে স্পন্দিত তখনও তাকে চাপা দিয়ে সুন্দরের গান গাইতে হবে, মনের অন্দর-মহলে যে মারামারি চলছে তার আওয়াজ সদর-মহল অবধি পৌঁছতে দেওয়া চলবে না—একথা কাব্যে অচল। প্রশ্ন হচ্ছে, যে কথাটা কবি বলছেন সেইটে কাব্যপদবীতে পৌঁছলো কি না। কবির মন যদি এই নতুন আঘাতে যথোচিতভাবে স্পন্দিত হয় আর তিনি সেইটাকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন তা হলে সে কবিকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করতে কোনো সাধু পাঠকেরই দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। যে কবিতা-অংশগুলি উদ্ধৃত করা হলো সেগুলি হতে অন্ততঃ এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা যায় এ কবিদের মেজাজ আলাদা এবং কাব্যের মেজাজও আলাদা। শুধু

মেজাজই আলাদা নয়, হাওয়াও আলাদা। তা না হলে সজ্ঞানে জীর্ণ আশ্লেষের কথা কবিতার উপজীব্য হওয়া সম্ভব নয়। এতদিন কাব্যে একটা 'শালীনতা' ছিলো, এঁরা সেই 'শালীনতা'-বোধকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন। তার কারণ হচ্ছে সেই ইতিহাস-বোধ এবং তার অকপট প্রকাশ, যা স্বীকার করা আগে সম্ভব ছিলো না,—এলিয়টের কথায়, that peculiar honesty, which, in a world too frightened to be honest, is peculiarly terrifying. It is an honesty against which the whole world conspires because it is unpleasant.

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচনা করলে একটী জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বিদ্রোহের আভাস আছে সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহ সামাজিক হয়ে ওঠে নি। বিদ্রোহটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। এখনও শুধু প্রবৃত্তির কারাগার থেকে বন্দীর বন্ধন মোচনের চেষ্টা। সমস্যার সম্পূর্ণ স্বরূপ চোখে পড়ে নি। তাই শুধু প্রেমের কৈশোরক উচ্ছ্বাসকে উপহাস, নতুন ননীর মতো তনুর ভিতরে যে কঙ্কাল ঢাকা আছে সেই কঙ্কালকে সামনে আনার চেষ্টা। মনটা এখনও অত্যন্ত বেশী পীড়িত হয়ে ওঠে নি, বিশ্বাস এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, তাই বিদ্রোহ এত স্পষ্ট। অবিশ্বাস বেশী হলে বিদ্রোহও সম্ভব হতো না, কেন না বর্তমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাধারণতঃ অর্থই হচ্ছে একটী নতুন ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় বিশ্বাস, সেখানে শুধুই বক্রহাসি, ব্যঙ্গ, ছোটো ছোটো চিত্র আর অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ছাড়া আরো কিছুর সন্ধান মেলে। কিন্তু এখানে সুর চড়া, বিদ্রোহের ঘোষণাও স্পষ্ট, ভাষা ও ছন্দের তীব্রতা আছে—অর্থাৎ কৈশোরক মোহের বিরুদ্ধে বিপ্লবও কৈশোরক। যুগ-পীড়িত কিশোর রুগ্নতার বীজে চঞ্চল, কিন্তু বাইরের দিকে তার নজর পড়ে নি।

এই রুগ্ন সমাজের পরিচয় আরো দু-একজন কবির কাব্যে মেলে যাঁদের মন অত্যন্ত যুগ-সচেতন হলেও যাঁদের কাছে ভবিষ্যতের দ্বার

একেবারেই রুদ্ধ। ব্যঙ্গহাসি হাসলেও বর্তমান যুগকে তাঁরা অতিক্রম করে যেতে পারেন নি, তাই মৃত্যুই তাঁদের ভবিষ্যতের সম্বল। নানা উপকরণের সংযোগ ও সম্মিলন সত্ত্বেও এবং নানা কলা-বৈকল্য থাকা সত্ত্বেও এ কবিতাগুলি সে কারণে দুরূহতার দিকে ঝুঁকেছে, তাঁদের কাব্য নানা টুকরো কাটা-ছেঁড়া ছবি দিলেও কোনও ভবিষ্যৎ আশায় সঞ্জীবিত নয়। বিদ্রোহটা সেই কারণে স্পষ্ট নয়—ব্যঞ্জিত। কবিতার মেজাজের মধ্যে সে বিদ্রোহ নিগূঢ়, কিন্তু তারা কোনো হাঁ-ধর্মী ঐতিহ্য গড়তে পারে নি। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে এরকম মনোভাবের সন্ধান মেলে। যেমন, 'অর্কেষ্ট্রা'র একটী কবিতা—

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসঙ্গত চির প্রেম ; সম্বরণ অসাধ্য অন্যায় ;
বদ্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়॥

এ মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্ব্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা ; দিবো না স্মারক অঙ্গুরীয় ;
ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ॥

তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি ;
তোমারি অকায় প্রশ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
মূল্যহীন ক'রে দিবে আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি॥

প্রেমের সে উচ্ছ্বাস সম্ভব নয়, কবি ক্ষণিক আত্ম-বিস্মৃতির হিতবুদ্ধি-হন্তারক রূপ জেনেও তার প্রতি বিমুখ নন। আজকের দিনের আবহাওয়াটা স্বতন্ত্র, মানুষের জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে,
সামনে মরু অস্থি-সমাকুল ;
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিলো আজকে মোরে,
অস্তমিত বিধির আমি ভুল।

এ কারণে কবির চিত্ত উদ্বুদ্ধ নয়, মলিনতায় হীন এবং অবিশ্বাসে অস্থির—

আজিকে আমার চিত্তে পুঞ্জিত যে-উদ্বিগ্ন বিষাদ
ভবিতব্যভারাতুর স্তব্ধ মূক মেঘের সমান,

তার চাপে এই ঘর-ছাড়া পথ-চলার খেয়াল খুসীর কাব্য ছাড়া অন্য কাব্য সম্ভব নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একালের মানুষের এই ধ্বংসের পরিবেশে জীবনের আবহাওয়াটা ফুটিয়েছেন উটপাখীর রূপকে। কবিতাটী ভাব-কৌশলে এবং কলা-কৌশলে অতি চমৎকার—

আমার কথা কি শুনতে পাওনা তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
... ...
কোথায় পালাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

যে কালান্তরের ঘোষণা আমরা বৃথা অস্বীকার করার চেষ্টা করছি তা আর সম্ভব নয়, এই মরুভূমিতে আমাদের বর্ণ চোরাবার উপায় নেই। তাই আজ মানুষের ঐতিহ্যে কেবলই নেতিবাদ বড় হয়ে উঠল—

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

কিন্তু কেবল শূদ্রের বদলে ক্ষমতাশালীরা আজ যে আদর্শ গড়তে চাইছে সে আদর্শ মানবতার আদর্শ নয়, স্বার্থসিদ্ধির কৌশল মাত্র। শ্রেণীস্বার্থ নির্মূল হবার ঠিক পূর্বেই তার তীব্রতা চরম।

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।

এই দেনা শোধবার ভার যাদের উপর পড়লো তাদের আত্ম-কলহে স্বার্থ নষ্ট হবার সম্ভাবনা—

তাই অসহ্য লাগে ও আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরি ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

এই দৈনিক স্বার্থ-সাধনায় কোনো মানবতার দায় পালন সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যৎ শূন্য, 'সম্মুখে নিখিল নাস্তি'—

আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি—
সাধিলাম কী সুকৃতি, হবো যার প্রসাদে অমর ?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি ;
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর ॥

অন্য উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু এইখানে কয়েকটা প্রশ্ন জাগে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযোগ তাঁর কাব্যের দুরূহতা। তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। ফলে শুধু যে দুরূহতাই বাড়ে তাই নয়, অর্থ কঠিন এবং নির্মাণকৌশল ঘন-সংশ্লিষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যের দুরূহতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার

স্থান অন্যত্র, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে, শ্রীযুত দত্তের ভাবগত ঐতিহ্যের সঙ্গে এই কলা-কৌশলের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। বরং বলা চলে ও দুটী পরস্পরের পরিপূরক বলেই শ্রীযুত দত্তের কাব্যে ও দুটী-ই আছে, তা না হলে স্পষ্ট নেতিবাদের উপর কাব্যগড়া তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। সুদূর যুগের চিত্রবাহী শব্দগুলিকে বর্তমানের ছবি-আঁকার কাজে লাগানোতে দুটী যুগই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দেয়। দুটী বিভিন্ন রসের চিত্র একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে যে তৃতীয় রস জন্মায় সে রস এ কাব্যে আছে—এ কৌশলটী আধুনিক কাব্যে প্রচুর ব্যবহৃত। তা ছাড়া কঠিনতার আবরণে এবং ঘনসংশ্লেষে পলায়নের আর এক নতুন ধরণের সুযোগ মেলে। বিপরীতভাবে বলা যায়, ইতিহাস-সচেতন এবং সংস্কৃতিসমৃদ্ধ অথচ ভবিষ্যতে আস্থাহীন মনের পলায়নের সুযোগ এ পথেই বোধ হয় সহজতর।

এ পর্যন্ত যে কবিদের কথা উল্লেখ করলুম তাঁদের মধ্যে ভাবগত ও কৌশলগত বিপ্লব যথেষ্ট। শুধু যে তাঁদের মন আর কৈশোরক উচ্ছ্বাসে স্পন্দিত হতে পারে না তাই নয়, যে যুগব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার ফলে সেই সহজ প্রেরণা এবং উচ্ছ্বসিত হবার ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব এঁরা সেই যুগব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থাকেও অস্বীকার করেছেন। বিভিন্ন কবির মন অবশ্য এতে বিভিন্নভাবে স্পন্দিত। কেউ একমুখীন বিদ্রোহের পক্ষপাতী, কারো মধ্যে বিপ্লব সরব এবং স্পষ্ট, কেউ বা বিপ্লব অনুভব করেছেন কিন্তু তাঁর কাব্য বিপ্লবী না হয়ে পলায়নী হয়ে দাঁড়ালো। কলাকৌশলের দিক্ হতে শুধু তাঁদের আঙ্গিক-বৈচিত্র্যই লক্ষ্য করার মতো তাই নয়, আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত প্রত্যেক কবির মেজাজের সঙ্গে, দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর আঙ্গিক তাল রেখে চলেছে কি না—ভাব আর আঙ্গিক পরস্পরের পরিপূরক ও পরিমাপ হয়ে উঠলো কি না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহজ ছন্দ, 'ভাই'-সম্বোধনের প্রাচুর্য আর মৃদু লয়, বুদ্ধদেব বসুর 'হে বিধাতা'-র সুর থেকে নিশ্চয়ই পৃথক্, আর বুদ্ধদেব

বস্তুর মধ্যে অনুভূতির যেটুকু তীব্রতা আছে এবং সেটা প্রকাশের সাহস আছে সেগুলি সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলবে না সে কথাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু অস্বীকার করা চলে না এঁরা নানাভাবে যে রসটীকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সে রসটী নিশ্চয়ই অন্য ভঙ্গীর। আমরা কবিতা বলতে যে একটী ধারণায় অভ্যস্ত ছিলাম এগুলি তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এমন কি বিরোধী হয়েও বহুসময়ে-ই কাব্যপদবী লাভ করেছে। শুধু কালান্তরের সাক্ষী বলে এগুলির জয়গান অনুচিত। আমাদের একটা সাম্প্রতিক ধারণা, আমরা কাব্য পড়ি তার বক্তব্য কি জানবার জন্য, কিন্তু তাতে কাব্যধর্মের স্খলন অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যিক মানদণ্ড ছাড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের অন্য কোনও মানদণ্ডই নেই। এলিয়টের কথায়, the criticism of our time seems to demand of poetry, not that it should be well-written, but that it shall be 'representative of its age'. কিন্তু যেহেতু এলিয়টের মতেও এযুগের কবি কাব্যরচনাই করবেন, অন্য কিছু করবেন না (he should do anything but write poetry, poetry not defined in terms of anything else), এবং যেহেতু কবি হিসেবেই উল্লিখিত কবিদের বিচার প্রয়োজন, সেইজন্য দেখা দরকার তাঁদের কাব্য এই নতুন পটভূমিকায় সার্থক হলো কি না। এই কবিদের কাব্য আলোচনা করলে একথা নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয় এঁরা অনেকসময়ই কবি হিসেবেই সার্থক, কেন না প্রথমতঃ এঁদের মন চারপাশের হাওয়ায় সাড়া দিয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁরা সেই স্পন্দনকে কাব্যেই, নবরসের কাব্যেই, রূপায়িত করেছেন—অন্য কিছুতে নয়। 'আধুনিক' কথাটার অন্যতম সার্থকতা এইখানে, কারণ আধুনিক পাঠক এই কাব্যপাঠে একটী নতুন রস ও নতুন ভঙ্গীতে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়, এ কাব্যে তাদের মর্মকথা প্রতিফলিত থাকায় আনন্দ সম্ভব হয়, কাব্যপাঠের জন্য 'আর কোনও কাজ নয়' বলে ছুটীর সন্ধান করতে হয় না।

২

উপরোক্ত স্তুতিবাদে অবশ্য বহু আধুনিক পাঠকের মনই সায় দেবে না। তার কারণ আছে। গতযুগের কাবিশিক্ষার বাঁধন ভেঙে নতুন ঔচিত্যবিচারের জন্য যে সাহস দরকার সে সাহস বৈপ্লবিক নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রথম পথ-কাটার পর আমরা সে পথে এতদূর এগিয়েছি যে পথ-কাটার বৈপ্লবিক কাহিনীকে আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি। বাংলা কাব্যের অভিনবতম নিদর্শন হতে প্রমাণ হয় বাঙালী লেখক ও পাঠকের মন আরো বদলেছে, এতই বদলেছে যে উল্লিখিত ভঙ্গীর কাব্য-ও আমাদের রসোদ্রেকে প্রায় অক্ষম হয়ে এলো। তার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ঐ কবিরা কেবল ভাঙার কাজই করে এসেছেন, নানা পরীক্ষা করেছেন কিন্তু কোনো স্থায়ী ঐতিহ্য রচনা করতে পারেন নি। সেই কারণেই তাঁদের কাব্য স্থায়ী হয় নি, তার রস জন্মানোর ক্ষমতা বেশী দিন থাকতে পারে না। কিন্তু এঁদের কয়েকটী আবিষ্কারের স্থায়ী গুরুত্ব আছে। শুধু ভাবগত বিদ্রোহ করে এঁরা পরবর্তী কবিদের পথ সুগম করে দিলেন তাই নয় (এঁরা বলতে ঐ কবিত্রয়ী ছাড়াও আরো অনেকে আছেন, কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেয়ে পরিবর্তনের ভঙ্গীটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য) এঁরা ঘোষণা করলেন কাব্যরচনা নিছক 'ঐশী প্রেরণা'তে হয় না, তার জন্যে সচেতন পরিশ্রমের-ও প্রয়োজন। নির্মাণ কৌশল ও গঠনভঙ্গী ইতিহাসজ্ঞান এবং মানসিক সংস্কৃতির উপরেও নির্ভর করে। তা ছাড়া কবিরাও সামাজিক জীব, সেজন্য শুধু চাঁদ মলয় নিয়েই কাব্যের কারবার নয়, যা কবিচিত্তে সাড়া তুলতে পারে সেইটীই কাব্যের উপকরণ হতে পারে। আরও দেখা গেলো স্পষ্ট বিদ্রোহ যেখানে সম্ভব নয় সেখানে শুধু উপহাস এবং অপ্রত্যাশিত উক্তিতেও কিছু রস জমে, মহৎ বলে যার লোক-প্রসিদ্ধি তাকে উপহাস করায় একালের মন উৎসাহী। আর দেখা গেলো একালের কবিরা শিথিল বা

তরল রচনার পক্ষপাতী নন, এঁদের অবিশ্বাসী এবং নিরুচ্ছ্বাস মনে জমাট জমকালো গঠনভঙ্গী বা প্রতীকী কৌশল জমে ভালো। সেইজন্যে এঁরা মিতব্যয়িতার সন্ধানী—শব্দের, অর্থের বা প্রতীকের যতোটা রস আদায় করা যায় ততোটা আদায় করে নিতে চান। একটা কথাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারে বারে বলার পরিবর্তে তাঁরা একটা কথার মধ্য দিয়ে নানা রস জমাতে চান। জটিল প্রতীক বা কোনো সুস্পষ্ট-স্মৃতি-জড়িত কোনও লাইনের নতুন ভাবে ব্যবহার সাম্প্রতিক কবিতায় যথেষ্ট। নানা বিরোধী বা আপাতবিরোধী চিত্রের একসঙ্গে সমন্বয় প্রায়ই দেখা যায়। এক একটা শব্দ উপমা বা ব্যঞ্জনার উপর অনেক ভার চাপানো। এতে অস্পষ্টতা হয়তো বাড়ে, তির্যক ভঙ্গী বাড়ে, ব্যক্তিগত উপকরণ বাড়ে কিন্তু একটা নতুন রস-ও দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তেমন কাঠামোর বাঁধন নেই, এলোমেলো চিত্র—কিন্তু এ যুগেরই চিত্র, বিভিন্ন স্তরের নতুন খাপছাড়া সমাবেশ। সেইসঙ্গে এঁরা ছন্দের বন্ধন আরো কাটিয়ে উঠলেন, 'বন্দীর বন্দনা'য় তার একধরণের প্রমাণ যথেষ্ট। এই আঙ্গিক তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার চেহারাও পরিবর্তিত হলো। কাব্যে যে চড়া সুর এবং উচ্ছ্বাসে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম তার পরিবর্তে ঘরোয়া টুংটাং সুর বাজলো, এমন সুরও বাজলো যাকে বলা চলে low-brow art. আর কবিরা তাঁদের এই নব-লব্ধ স্বাধীনতায় এমন জিনিষ কবিতায় আমদানি সুরু করলেন কাব্যরাজ্যে যাদের ছাড়পত্র পূর্বে মেলেনি। বস্তি-সাহিত্য কথাটা অতিশয়-ধর্মী এবং শুধু উপহাসের কাজে লাগে তাই নয়, আর সেটা যে নবযুগের কাব্যের জন্য অপরিহার্য এমনও নয়—কিন্তু কেবল অকুলীন বলে তার অমর্যাদা ঘটতে দিতেও এযুগের কবিরা নারাজ।

প্রথম যুগের এই কাব্যভঙ্গীর পর একালের মন কতোটা পরিবর্তিত হয়েছে তার স্পষ্ট সন্ধান মেলে বিষ্ণু দে'র কাব্যে। বিষ্ণু দে'র কাব্য নানা দিক্ দিয়ে বিস্ময়কর। তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং মন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সচেতন তাই নয়, তাঁর কলাকৌশল অদ্ভুত এবং কারিগরি

অত্যন্ত বেশী। বিষ্ণু দে'র কাব্য হয়তো 'আধুনিকতম' নয়, তার মধ্যে গদ্যছন্দ নেই এবং 'আধুনিক' কাব্যের অনেকগুলি চিহ্নই নেই। তবু বলতে হয় এ পর্যায়ের কবিদের মধ্যে তিনি-ই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ, কেননা শুধু কবিকর্মেই তাঁর উচিত অধিকার নেই, কবিধর্মও তাঁর মধ্যে সম্ভবত বর্ধমান। ব্যঙ্গের পর্যায় কাটিয়ে তাঁর কাব্যে গভীর স্বর বাজতে সুরু করেছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও তাঁর মন বাংলা কাব্যের অগ্রগতির সহায় হয়ে থাকবে। তাঁর 'চোরাবালির' মধ্যে তিনি যে কৌশল দেখিয়েছেন এদিক হতে সেটার বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয় নয়।

'চোরাবালিতে' বিভিন্ন ধরণের কবিতা আছে। এক ধরণের কবিতায় প্রাচীন শাস্তি ও রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের প্রতি সুনিপুণ ব্যঙ্গ দেখা যায়। সেকালের জীবনের পাশাপাশি একালের জীবনের চিত্রাঙ্কণ তার অন্যতম কৌশল। কথাটা তির্যক্ ভঙ্গীতে বলা, আড়াঠেকা তালে। যেমন, 'বেকারবিহঙ্গ' কবিতাটা—

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা?
এ মরা সহরে নীড়সন্ধানী মন
হারাল চতুর উভচর দিশা তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা!
কোন্ প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাভক্ত ত্রিশঙ্কু তার ভার।

এই মরা সহরের পরিবেশেও তো যৌবন আসে, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে দেশোদ্ধারের চিন্তা জাগে, একটা মহৎ কিছুর নামে আত্ম-পীড়ন যৌবনের ধর্ম। কিন্তু তার সম্বল স্বল্প, সুতরাং অকাল-বার্ধক্যেই পঙ্গু যৌবনের অবসান, বন্ধন আরো কঠিনতর আর জীবন দৈনন্দিন হীনতা ও মলিনতায় অর্থহীন। সুনিপুণ ব্যঙ্গে এই ছবি ফুটলো—

কৈশোরে ছিল ধর্ম্মঘটের সখ,
যৌবনে নয় মাষ্টার, কেরাণীও।

বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংসসার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য সে উমেদার।
এদিকে শরীর মন হল বরণীয়,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে কেউ হোক্।

পাত্রী যে কেউ হোক্—এই কথা ক'টার ব্যঞ্জনা অসাধারণ।

অতএব, মেসে কাটাও তক্তাপোষে,
দৈনিকে দেখো কাজ খালি কোথা কষে',
খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চষে',
আর দেখো রসে' সিনেমার পোষ্টার,
এলবর্ট হলে তারপরে শোনো বসে'
ইতিহাস ঘেঁসে নানা ঘাটে উদ্ধার।

অল্প সময়ে অনেক উপভোগের ব্যর্থ চেষ্টা এবং ক্রমিক অবক্ষয়ের মধ্যে যৌবনস্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পঙ্গু যৌবনের ব্যস্ততা ছন্দে ধরা পড়লো—ছন্দের মধ্যে এমন একটা ঊর্দ্ধশ্বাস গতি আছে যেটা সহজে পড়া যায় কিন্তু তাড়াতাড়িই পড়তে হয়। এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী অনায়াস মিলগুলি। শুধু পদান্ত মিল নয়, 'মেসে'র সঙ্গে 'তক্তাপোষে' 'চষে'-র সঙ্গে 'রসে' 'বসে'-র সঙ্গে 'ঘেঁষে' ইত্যাদি পদমধ্য মিলের আভাস এবং 'দৈনিকে দেখো' 'ভিড় ভাঙো' প্রভৃতি আশ্চর্যরকম স্বাভাবিক কিন্তু আশ্চর্যরকম ফলবান্ অনুপ্রাস। শব্দের ধ্বনি, ছন্দের লয় আর ব্যঙ্গের সুর একেবারে চমৎকার মিলিত—কোন্‌টা কার সহায়ক তা বিশ্লেষণ করা কঠিন।

তারপরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা
রেডিওসচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা,
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নব আশা—
তবু হে কুমার, খেলো না শকুনি-পাশা।
ইতিহ-ভাগ্য জড়াক্ না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।

শেষের লাইন দুটীতে যে ব্যঙ্গ আছে তার জন্যে বোধ হয় এর চেয়ে সুষ্ঠু প্রকাশ-ভঙ্গী খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। 'তবু বিহঙ্গ' বলতে যে চিত্র বা যে সুর আমাদের মনে উদ্দীপ্ত হয় বেকারজীবনে সে সুর কতোটা মিথ্যা এবং শান্তির সে ললিত বাণী কি ব্যর্থ পরিহাস তা বোঝাবার জন্যে কবিকে অন্য কিছুই বলবার প্রয়োজন হয় নি—শুধু বেকারজীবনের চিত্রের মধ্যে ঐ লাইনটী থাকলেই যথেষ্ট। কথার মিতব্যয়িতা চরম—শুধু ইঙ্গিতেই সব কথা বলা হলো, স্পষ্ট ভঙ্গীর চেয়ে অনেক কিছু বেশী বলা হলো। সেই সঙ্গে এই রসের উপযোগী শব্দগঠন ও পরিবেশ-রচনাও লক্ষ্যণীয়। বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংসসার—কঠিন সমাসবদ্ধতা এবং চমৎকার গুরুচণ্ডালী সংমিশ্রণের ফলেই সেকালের গৌরবের পাশাপাশি এযুগের চণ্ডালী আবহাওয়া ফুটেছে। রেডিও-সচল ধোঁয়া আর পাণ্ডুর চাঁদ প্রভৃতি কথাগুলি সুন্দর বসেছে। প্রত্যেক পদেই মনে হয় কবি তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসে ভেসে যান নি'—সব সময়েই আত্মস্থ ও আত্ম-সচেতন এবং যুগ-সচেতন। কবি 'মহতে'র প্রতি ব্যঙ্গহাসি হেসে চলেছেন কারণ আমাদের জীবনে এখন সজীব জীবনের চেয়ে মরা সহরই অধিকতর সত্য, পরীর দেশের রাজকন্যার অপেক্ষায় বা শতজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে বসে থাকার চেয়ে যে কোনও পাত্রীর সাহায্যে শরীর মনের প্রয়োজন সমাপন করতে এ কালের লোক হয়তো বেশী উৎসুক। 'বরণীয়' কথাটার জটিল রস ও উপহাস উপভোগ্য। যে কোনো পাত্রীর সাহায্যে বরণীয়তা মহনীয়তা এবং প্রেমের কঠিন কোমলতা, যুগে যুগে শতজন্মে একজনকেই অনিবার ভালোবাসা ইত্যাদি আদর্শ বজায় রাখাই সম্ভব বটে!

আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতাগুচ্ছ 'কবি-কিশোর'। কৈশোরক মনোবৃত্তিকে কবি বিভিন্ন দিক্ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার বিভিন্ন ভঙ্গীর নির্মম বিচার কবির উদ্দেশ্য। প্রথমেই প্রেমিকদের মিলনস্বর্গের চিত্র—

> সহরের বুকে পাঁচতলায়
> নেব সখী এক ছোট ফ্ল্যাট্!

ট্রাম বাস্ ভিড় নিত্য যায়—
উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায় !

* * *

ঘুঘুনি ও ঘুঘু রইব তায়—
আর্কেডিয়া কি, বুঝবে তাই।

একে কেউ উপহাস বলতে চান ক্ষতি নেই, কিন্তু এর বাস্তবতা কম নয়। আধুনিক জীবনের নিখুঁত চিত্র। সে হিসেবে একালের মানবজীবন তো মানবতার আদর্শের প্রচণ্ড ব্যঙ্গ। প্রিরাফায়েলাইট্, হেলেনিষ্ট সকলেরই ঐ কথা। 'প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এলো শ্যামপত্র সাজে', সুতরাং

প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন।

খাপছাড়া জীবনের শোভাযাত্রা চলেছে, তার মধ্যে মোহের আবেশ নেই, অবিশ্বাসী মনের শ্লেষ-বিজড়িত উক্তি আছে। কবি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন 'দেহের নাগালই পাইনে—মন ত আরো দূরে।' প্রেমের ভঙ্গীটা বিপরীত, মন না পেলে দেহলাভ অসম্ভব প্রেমের এই প্রচলিত আদর্শ এখানে উলটালো। কবিকিশোর স্বপন-প্রিয়ার সন্ধানে ব্যস্ত, তার মুখ আবেগ-পাণ্ডু এবং অসুস্থ, কিন্তু তার মোনা-লিসা পার্ক-ষ্ট্রীটের রূপালি রাজবালা ছাড়া কেউ নয়। মোহের আবরণ তাই অর্থহীন, ন্যাকামি অসহ্য, প্রেমে ক্লান্তি, বেতাল জীবনের আসল কথাটা খুলে বলাই ভালো—

যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেণে
মিলব উভয়ে—কি বলো তুমি ?
মা-কে তো ভোলাবে বুলাকে এনে ?
যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেণে
বুলার টিকিট আমিই টেনে
বস্‌ব উভয়ে—কি বলো, তুমি ?

আধুনিক জীবনে এ ঘটনা মামুলিই, কেননা ডন জুয়ান অমর—

ডনের প্রেত শরীর-হীন ঘুরে বেড়ায় আজো
ড্রয়িং রুমে—হে অতনু! বীরতনুতে সাজো।

এ কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই, কারণ "সময় ও মন ও প্রেম করবার নেই আর হায়!"

বাসো নাকো ভালো? নাই বা বাসলে, অলকাবসু,
তোমার চোখের ধূসর চাওয়ায়, স্বল্প কেশে,
* * * *
—সবেতে তোমার—মানি, শেরি, মানি মুগ্ধই হই।
কিন্তু আমি যে শ্রান্ত বড়োই ক্লান্ত বড়ো,
কার্নিভাল এ জীবনে আমার ঘুম পায় আজ।
মন যে আমার জীবনের ট্রেণে দূরের দিকে,
দেয়ালিভ্রান্ত হাঁ করে দাঁড়াব, সময় কোথা?
সে শিখা অথবা শাব্লিমেশন্ দেওয়ালি প্রেমে,
সে খেলারি শুধু ছদ্মবেশ এ, তোমার শিখা
এ ফুলঝুরির স্তুতি করি, তার সময় কোথা?

কার্নিভাল জীবন, জীবনের ট্রেণ প্রভৃতি শব্দগঠন, এই মিলহীন কিন্তু কিন্তু লয় সংযুক্ত এবং শ্লেষ সংযুক্ত (শ্লেষ কথাটা উভয় অর্থেই বলা চলে) লাইনগুলি কাব্য কৌশলের দিক্ দিয়ে সার্থকভাবে নতুন।

কিন্তু এখানে তার্কিক প্রশ্ন তুলতে পারেন জীবনে এ অবসাদ যদি দেখা দেয়ই সেটাকে বড়ো করে ধরা কবিধর্ম কি না। যখন জীবনপটে ছিদ্র হয় তখন কবিদের কর্তব্য সেই ছিদ্রান্বেষণ, না ছিদ্রাবরণ? শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের কথায় "মনুষ্যজীবনে মানবাত্মার যাহা শ্রেষ্ঠ প্রয়াস—ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দুর্বলতার জন্য পীড়া, জগৎব্যাপারের অসীম রহস্যভেদের চেষ্টা, এই সকলের মধ্য দিয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের উদ্ভব ও তদ্দ্বারা আত্ম-পরিচয় সাধন—ইহাই সকল সাহিত্য-চেষ্টার অন্তর্গত নীতি। মানুষকে পশুর রূপে চিত্রিত করিলে, সে চিত্র মিথ্যা বলিয়াই কুৎসিৎ দেখায়। আবার মানুষকে দেবতা বানাইলে দুর্বলহৃদয় নীতিবিদ্ খুসী হন বটে, কিন্তু যাঁহার

মনুষ্যত্ব সহজ সুস্থ ও সজীব, তাঁহার রসপিপাসা তৃপ্ত হয় না। মানুষের আদর্শ—মানুষ নিজে, সে আদর্শ কোনও সূত্রধৃত সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিবার নয়।"[৪] কাব্যের আদর্শ নিশ্চয়ই এই ; এখানে বিচার্য, "মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ-সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে" কি না। এ কথা স্বীকার করতেই হয়, নানা অক্ষম কবি শুধু নতুনতার অজুহাতেই মসীপঙ্ককে কাব্য বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ মন্তব্যের ব্যতিক্রম অন্ততঃ কয়েকজনও আছেন। যে যুগে মানুষের আদর্শ পরিবর্তিত সে যুগের সার্থক কাব্যেও নানা 'অ-মহৎ' জিনিষ প্রবেশ লাভ করবে সেটাই স্বাভাবিক। তার জন্য দায়ী কবিরা ন'ন, তার জন্য দায়ী বর্তমান সমাজ। এ প্রসঙ্গে এলিয়টের একটা উক্তি স্মরণীয়। তাঁর একটী কবিতা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, If a poem of mine entitled *Ash-Wednesday* ever goes into a second edition, I have thought of prefixing to it the lines of Byron from *Don Juan* :

> 'Some have accused me of a strange design
> Against the creed and morals of this land,
> And trace it in this poem, every line.
> I don't pretend that I quite understand
> My own meaning when I would be *very* fine ;
> But the fact is that I have nothing planned
> Except perhaps to be a moment merry·· '

কবিরা কেন ক্ষণকালের খেয়ালখুসীতে নিজেদের নিঃশেষ করবেন কিন্তু জগতের অস্বীকৃত নিয়ামকের আসন গ্রহণ করবেন না এ প্রশ্ন এখানে নিরর্থক। এর উত্তর মেলে এ যুগের পটভূমিকায়, এযুগের জীবনে। সে হিসেবে সুস্থ কাব্য বলে একে ভুল করার কোনো কারণ নেই এবং

৪। সাহিত্যকথা, ৮ পৃঃ।

তা নেই বলেই কাব্যের প্রয়োজনেই সুস্থ সমাজের প্রয়োজন। বর্তমান সামাজিক পটভূমিকায় কাব্যাদর্শের পরিবর্তন এবং অবনতি ঘটেছে বলা চলে কিন্তু এ কথাও দৃঢ়ভাবে বলা প্রয়োজন কবিরা মিছে মহত্ত্বের জয়গানে ব্যস্ত থাকলেও তাঁদের ধর্মচ্যুতি হতো, কেননা এযুগের মন বা একালের জীবন সম্পূর্ণভাবে তা নয়। আর 'বাস্তবতার' অজুহাত যে শুধুই অক্ষমতার সাফাই নয় বিষ্ণু দে'র কাব্য তার নিঃসংশয় প্রমাণ। কেবল নতুন ভঙ্গী হিসেবে নয়, নতুন কাব্য হিসেবেই এর সার্থকতা অনস্বীকার্য।

'চোরাবালি'-র মধ্যে আরো কয়েকটী ধরণের কবিতা আছে। যেখানে এই ভাঙনের কথা কবি ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় বা ব্যঙ্গহাসিতে বলেন নি, স্পষ্টভাষায় বলতে চেয়েছেন সেখানে তিনি অপেক্ষাকৃত দুরূহ। বলার কথাটা একই, কিন্তু ভঙ্গীটা স্বতন্ত্র।

কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ
স্মরণের নীল পরপার!
হতোস্মি হবে জয়গান!
ডুববে অহম্ কশ্চিৎ!
দুর্গম দিন, ক্ষুরধার
রাত্রিও হবে ক্ষীয়মান!

* * *

হৃদয়ে তোমার জাগে ভয়?
মরণের ভয়, জীবনের
বিপুল বিদেশী বিশ্বের?
ব্যর্থ গ্লানির পরাজয়?
ধিক্কার জ্বালা দাহনের
ত্যক্ত সমাজনিঃস্বের?
কোনো গোরোচনা গোরী কি
বাঁধে নি চরণে পরাণে?
শোনো নি কি ঘুমপাড়ানি
জরৎকারীর শিথানে?

এই দুরূহতার কারণ কি? শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিবেচনায় "বিষ্ণু দের মতো এলিয়ট্-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন। এ অবস্থায় কালে-ভদ্রে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হতে তিনি বাধ্য।" কিন্তু ব্যক্তিক অক্ষমতার সাহায্যে বিশেষ করে এই কবিতাটীর দুরূহতার কৈফিয়ৎ যদি বা চলে সাধারণভাবে একথা অচল। সুধীন্দ্রনাথের কথাতেই "এতাদৃশ অপরিপাক বিষ্ণুদের পক্ষে অস্বাভাবিক; এবং যেখানে তিনি সত্য সত্যই সফল, সেখানে তাঁর চর্যা ও চর্চা একাগ্র, বোধি ও ব্যুৎপত্তি ঐকান্তিক, অন্তর ও বাহির অভিন্ন। তখন তাঁর পাণ্ডিত্যকে আর অবান্তর লাগে না, দর্শন-বিজ্ঞানের প্রত্যয়াদিতেও সুব্ধ উপমার উপলক্ষণ জাগে; এবং অনন্তর অনভিজ্ঞের জ্ঞানচক্ষু খুলুক বা না খুলুক, প্রজ্ঞাপারমিতের অনুষঙ্গের আহ্বানে অন্তত অনুকম্পায়ীরা নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দেয়।"

বিষ্ণু দে'র কাব্যের কৈফিয়ৎ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যের সার্থকতা যাই থাক্, এ মন্তব্যের ফলে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে। বিষ্ণু দে'র দুরূহ কবিতার একটী নিদর্শন এই—

> বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির।
> জড়কবন্ধ অন্ধ কর্ম্মে ফুৎকার মোর নর্ম্মাচার।
> প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগিনা। মন তুষার।

বিষ্ণু দে'র কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'এ বুঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা দেবো' (বুদ্ধদেব বসু: সব পেয়েছির দেশে; ৮ পৃষ্ঠা) এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। পাণ্ডিত্য এখানে অবান্তর কি না সে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞের সংশয় ঘুচবে না। 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির' কথাটা সম্ভবতঃ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী হতে সংগ্রহ করা—

> স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
> কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥
> —ঈশাবাস্যোপনিষৎ॥

কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক হতে বিভক্তি সমেত বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা বাংলা কাব্যে রসের সহায়ক হয়েছে কি না এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁরা 'অনুকম্পায়ী'র দলে নেই 'অনভিজ্ঞের'ই দলে তাঁদের মন এতে সাড়া দেবে না বলা বাহুল্য।[৫]

এই অনভিজ্ঞ আর অনুকম্পায়ীর মধ্যে বিভেদ রচনার চেষ্টা হতে আরও একটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে। কবি তা হলে নিশ্চয়ই অনভিজ্ঞদের জন্য কাব্য রচনা করছেন না, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের জন্যই কি তাঁর কাব্য উদ্দিষ্ট? লক্ষ্য করার বিষয়, এ ধরণের কবিতাগুলি কোনো বন্ধুর নামে উৎসর্গীকৃত, অর্থাৎ এ কবিতাগুলি কাব্যে পত্রালাপ, এর সম্পূর্ণ অর্থবোধ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পাঠক এখানে আকস্মিক দর্শকমাত্র। শ্রেণীবিবর্তনের ফলে শ্রেণীবৈষম্যের চরম অবস্থায় কাব্যের এ দুরবস্থা স্বাভাবিক। পূর্বে এলিয়টের যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি সে প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন—

৫। প্রসঙ্গতঃ একটী কথা আলোচনীয়। কবি যে অংশটী উদ্ধার করেছেন সেটি যে তাঁর কাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় নয় বরং তার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, মন্ত্রটির অর্থ আলোচনা করলে এ কথাটী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'স্নাবাঃ' কথাটীর অর্থ শিরা। 'অস্নাবিরং' অর্থে "শিরারহিতং"—শিরাহীন। 'অব্রণং' ও 'অস্নাবিরং'—ব্রণ ও শিরা যাহাতে নাই, অর্থাৎ ব্রণ ও শিরা দ্বারা উপলক্ষিত স্থূলদেহ রহিত—এই অর্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য করেছেন। 'পাপ' শব্দের অর্থ পাপ ও পুণ্য উভয়ই। "অপাপবিদ্ধম্" অর্থে পাপ-পুণ্যের সংস্পর্শরহিত। ঐ মন্ত্রে নির্গুণ আত্মাকে শুক্র (শুক্র—'র' ও 'ল' একই) অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রহিত, পাপ পুণ্যের অতীত, ক্রান্তদর্শী (বিদ্রূপ), অন্তঃকরণের অধিপতি, সর্বব্যাপী (পরিভূঃ) ও স্বয়ম্ভু বলা হয়েছে। তিনি সংবৎসর স্বরূপ প্রজাপতি-গণের কর্তব্য নির্দ্ধারণ যথাযথভাবে করেন। অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টির নিয়ন্তা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুটী বিশেষণ ব্যবহারের দ্বারা 'বুদ্ধি' কথাটার অর্থ কি কোনো নতুন ভাবে বা নতুন রসে দেখা দিয়েছে? বিশেষণগুলি সার্থক কি? 'অপাপবিদ্ধ' কথাটীর একটা সার্থকতা হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়। বোঝা যায় কবির বুদ্ধি এখানে পাপপুণ্যের অতীত। এলিয়টের মতে কবির মন নির্গুণ হওয়াই দরকার, বিষ্ণু দে না হয় সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু 'অস্নাবির' কথাটীর কি সার্থকতা থাকতে পারে? বুদ্ধি যে স্থূলদেহরহিত এ কথা বলবার প্রয়োজন হয় না। মনে হয় গালভরা কথা হিসেবে বা অপাপবিদ্ধ

In one sense the question implied by the phrase 'the use of poetry' is nonsense. But there is another meaning to the question. Apart from the variety of ways in which poets have used their art, with greater or less success, with designs of instruction and persuation, there is no doubt that a poet wishes to give pleasure, to entertain or divert people ; and he should normally be glad to be able to feel that the entertainment of diversion is enjoyed by as large and various a number of people as possible. When a poet deliberately restricts his public by his choice of style of writing or of subject-matter, this is a special situation demanding explanation and extenuation······the chief use of the 'meaning' of a poem, the ordinary sense, may be (for here again I am speaking of some kinds of poetry and not all) to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him : much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog.

কথাটার সঙ্গে ছন্দের টানে অম্বাবির কথাটা এসেছে, তা ছাড়া ওর অন্য কোনো প্রয়োজন ছিল না, বরং যাঁরা 'অনুকম্পায়ী' ও কথাটা তাঁদের অনেকখানি অনুকম্পারই দাবী করবে। কঠিন কবিতামাত্রই যে কাব্যের দুরবস্থার লক্ষণ এ কথা না স্বীকার করলেও অনাবশ্যক কঠিনতা কাব্যের উৎকর্ষ বাড়ায় না এই রকম কঠিন অথচ অসার্থক কথা ব্যবহার তার অন্যতম প্রমাণ। কোন্ অবস্থায় কবিদের মেজাজ এরকম হয় সে সম্বন্ধে স্পেণ্ডারের (Stephen Spender : *The Destructive Element*) একটা ভালো আলোচনা আছে।

This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way ; some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient of this 'meaning' which seems superfluous and perceive possibilities of intensity through its elimination. I am not asserting that this situation is ideal ; only that we must write our poetry as we can, and take it as we find it. ··· The most useful poetry, socially, would be one which could cut across all the present stratifications of public taste—stratifications which are perhaps a sign of social disintegration. যে কবিরা কেবল তাঁদের বন্ধুবান্ধবের জন্য কবিতা লেখেন তাঁরা শুধুই সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করবেন তার মধ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সে 'কোডে'-র অর্থ আবিষ্কার করা যদি সাধারণ পাঠকের অসাধ্য হয় তাতে এ কবিরা হয়তো ক্ষুব্ধ হবার পরিবর্তে সার্থক মন্ত্রগুপ্তির উল্লাসে উল্লসিতই হবেন, কেন না ইতরের কবি হলেও ইতর কবি এঁরা ন'ন, এঁদের উন্নাসিকতার বাহ্য আকার সাধারণ হলেও বাস্তবিক তা নয়, তা শেলীর স্বর্গ-দ্বীপের চেয়েও স্বাশ্রয়ী এবং উন্নাসিক। বিষ্ণু দে পরে এই মধ্যবিত্ত অহঙ্কার কাটিয়ে উঠে বলতে পেরেছেন,

> তোমাদের জানি। জানি উন্নাসিক ও উপত্যকায়
> নিত্য করি আনাগোনা।
>
> —বাংশে জুন

কিন্তু অন্যান্য বহু কবি এই ক্ষয়িষ্ণু অহঙ্কারের চোরাবালিতেই ক্রমবিলীয়মান, কবি হিসেবে তাঁদের সার্থকতা ক্রমশঃই কমতির দিকে। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি এঁদের মনোভঙ্গী আলোচ্য। 'এতো দিয়েছি, এখন যা লিখবো পাঠকসমাজ তাই গ্রহণ করুক,' এমন কথা

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চয়ই অশোভন হতো না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার পরিবর্তে পাঠকসমাজের প্রতি ক্রমেই অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ হয়েছেন, শেষ রোগশয্যায় বলেছেন,

> স্বরলোকে নৃত্যের উৎসবে
> যদি ক্ষণকাল তরে
> ক্লান্ত উর্বশীর
> তালভঙ্গ হয়
> দেবরাজ করে না মার্জনা।
> পূর্বার্জিত কীর্তি তার
> অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
> আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
> মানবের সভাঙ্গনে
> সেখানেও জেগে আছে স্বর্গের বিচার।
> তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
> অপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ;
> কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।
>
> —রোগশয্যায়, ১নং কবিতা

রবীন্দ্রনাথের এই বিনয়ে আমাদের অন্তর হাহাকার করে। কিন্তু এ বিনয়ের প্রয়োজন ছিলো, মানবসমাজকে অশ্রদ্ধা করে তাদের সুখ-দুঃখের বাণীমূর্তি দেওয়ার পরিবর্তে কাব্যের নামে পাণ্ডিত্যবিলাস এবং পাঠকসমাজকে অবজ্ঞা করা যে কবিধর্ম নয় সে কথা রবীন্দ্রনাথের কলম হতে এরকম মর্মবেঁধা ভাবে বার হবার প্রয়োজন ঘটেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বকীয় মস্তিষ্কগৌরবে সমাজনেতৃত্ব করে এসেছে, তাদের হাতে 'বর্বর ব্যবসায়ী' ও 'মেদাচ্ছন্ন জমিদার' (কথা দুটা 'সব-পেয়েছির-দেশে', ৫৩ পৃষ্ঠা হতে ধার করা) মার খেতে শুরু করেছে—কিন্তু এই সম্প্রদায়টীও যখন ক্ষয়িষ্ণুতার পথে অগ্রসর হলো তখন নতুন মুষলের জন্ম হয় প্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, কবিধর্মের পুনরাবিষ্কারে। এই কারণেই রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কবিরা

অবশ্য সে পথে যান নি। তাই বিষ্ণু দে যখন 'তোমাদের জানি' বলে ঐ উন্নাসিক উপত্যকায় আনাগোনা ত্যাগ করেন তখন তাঁর আশ্রয় মেলে নৈর্ব্যক্তিকতায় নয়, মানব-সাধারণ্যের মধ্যে, জনমানসের মধ্যে।

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য ॥

—বাইশে জুন, প্রতিরোধ

এ কবিতায় যে দুরূহতা নেই সেটা আকস্মিক নয়, কেননা যখন বলার কথাটা স্বতন্ত্র এবং কবির মেজাজটাও অন্য তখন কবিতার চেহারাও অন্য হয়ে দাঁড়ানো স্বাভাবিক। অবশ্য দুরূহতার অভাবই যে কবি-কীর্তির সোপান এমন কথা নয়। কিন্তু এটী কাব্য হিসেবেই সার্থক, যদিও একদিকে দুরূহতা নেই কিন্তু অপরদিকে জন-গণেশের নামে প্রচণ্ড কৌতুকও নেই আর জনমানস বলে অস্পষ্ট ভাবালু উচ্ছ্বাসও 'ভাই' সম্বোধনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। সমস্ত সমস্যাটার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি আছে অথচ কাব্যধর্মও অব্যাহত এবং ঐ অনুভূতির ফলেই উদ্বুদ্ধ,—এই কারণেই একে নতুন যুগের এবং নতুন পর্যায়ের কাব্য বলতে দ্বিধা হয় না।

৩

এইখানে আবার পিছনে ফেরা দরকার। 'চোরাবালি'-র মধ্যে আরো কয়েক ভঙ্গীর কবিতা আছে। পূর্বে যে কবিতাগুলির কথা বলেছি সেগুলিতে ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে। কিন্তু চোরাবালিতে কয়েকটী কবিতা আছে যার মধ্যে প্রচলিত ছন্দ বা প্রচলিত অর্থে ছন্দ নেই। একধরণের কবিতা মুক্ত ছন্দে লেখা, তার মধ্যে একটী প্রবহমানতা আছে, ফলে সংক্ষিপ্তিও কম—

শুধালাম, রবে এই ঘরে ?
এই ভিড়ে ? সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিশ্বাসে
ভারাক্রান্ত হাওয়া হেথা। কঠিন দেয়াল
কাঁপে দেখ অলকার অসুস্থ উচ্ছ্বাসে।

এর চেয়েও হাল্‌কা সুর পাওয়া যায় কতকগুলি হাল্‌কা ধরণের কবিতায়। 'মন-দেওয়া-নেওয়া' এই পর্যায়ে পড়ে। এই ছন্দোমুক্তির অভিনব নিদর্শন 'কথকতা'। গদ্যের মতো সাজানো হলেও পদ্যত্ব ঘোচে না তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু তার ঠিক বিপরীতটার পরিচয়ও আছে। 'টপ্পা-ঠুংরি' বাইরে গদ্য, কিন্তু তার ব্যঙ্গ ও জমাট ভাব কাব্যরসকেই জাগায়। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লাইনের উদ্ধৃতি ব্যঙ্গের সহায়তা করেছে। ঐ লাইনগুলি এক একটা মানসিক অবস্থার সূচক, তাই সেগুলিকে ব্যঙ্গ মানে এক অতীত যুগকে ব্যঙ্গ, এক একটা মানসিক সংস্থানকে পরিহাস।

বাসের একি শিংভাঙা গোঁ !
যন্ত্রের এই খামখেয়াল !
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।

বিহঙ্গ আর পলায়নের প্রতীক নয়, সে বন্ধনের ছবিই ফুটিয়ে তোলে। জীবনের মূল গভীরে প্রবেশ করে নি, শুধু যাযাবরতা। বিচিত্র চলচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়—

ট্র্যাফিক্ থম্‌কে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পন্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো

এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে সহর, হে সহর স্বপ্নভারাতুর !

'বাইশে জুনে' পৌঁছবার আগে বিষ্ণু দে'র আরও একটা পালা কেটেছে। সেটার মধ্যে তিনি নিজের ভারসাম্য খুঁজে না পেলেও ভারসাম্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। 'পূর্বলেখ'এর মধ্যে শুধুই খাপছাড়া ঘরছাড়াদের মিছিল নেই, অবিমিশ্র বক্রোক্তি নেই, সুরটা আরো গভীর ও বিষণ্ণ। পদধ্বনি এসে তাঁর কানে বাজে, প্রশ্ন জাগে কার পদধ্বনি। যে দস্যুরা আজ যাদব নারীদের হরণ করতে আসছে তাদের হাত হতে রক্ষা করবার ক্ষমতা অর্জুনের নেই, গাণ্ডীব আজ ব্যর্থ। শ্রেণীপ্রাধান্যের শেষ অবস্থা। বাইরের ঠাট সবই বজায় আছে কিন্তু আসল জোরটাই নেই, তাই ইতরের কাছে মার খাওয়া অনিবার্য। সুভদ্রা হরণের সময় কৃষ্ণ-বলরামের পদধ্বনি ভয় জাগায় নি, কিন্তু 'কালের ধারায় নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।' তাই দস্যুদলের পদধ্বনিতে অর্জুনের অন্তর কম্পিত—

কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
একি এল যুগান্তর ! নব অবতার !
এ যে দস্যুদল !
হে ভদ্রা আমার !

সমস্যাটা এখন তার স্বরূপ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সেইজন্য আর শুধু ব্যঙ্গ নেই, একটা হাঁ-ধর্মী ঐতিহ্যের সন্ধান চলেছে। 'চোরা-বালি'তে কবি প্রেমে ক্লান্ত এইটুকু বলেই নিশ্চিন্ত আর ভাবালুতাকে উপহাস করেই ক্ষান্ত। কিন্তু এখানে প্রেমে ক্লান্তি অতিক্রমণের

কি উপায় তার খোঁজ আছে। ভাবালুতাকে উপহাসই সেইজন্য আর কাব্যের একমাত্র উপজীব্য নয়, সেটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই পর্যবসিত। নিছক ঠাট্টাতে মন ভোলে না।

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্‌অপ্‌ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ!

'চোরাবালি'র কবি বিদ্যাসুন্দরের নব্য হৈচৈ-র মতো একটা লোভনীয় বিষয়কে নিশ্চয়ই এক লাইনে বিদায় দিতেন না, তা নিয়ে অন্ততঃ পাঁচ ছটা কবিতা লিখতেন-ই। কিন্তু এখানে মন আরও গভীর সুরে বেজেছে। নিছক বুদ্ধির স্তরে বাদ-প্রতিবাদ-সমন্বয়ে বিশ্বাস করা হোক্ বা বস্তুতান্ত্রিক বাদ-প্রতিবাদ-সমন্বয়েই বিশ্বাস করা হোক্ বা যাঁরা টয়েনবী-কথিত আরো জলীয় চ্যালেঞ্জ-রেস্‌পন্স তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন 'চোরাবালি'এর অবিশ্বাস হতে 'বাইশে জুনের' বিশ্বাসের যাত্রাপথে 'পূর্বলেখ'র এই গম্ভীর বিষণ্ণতার প্রয়োজন ছিলো। আর এ কথাও স্বীকার করতে হয়, 'বাইশে জুনে' ওরকম বিশ্বাস সম্ভব হয়েছে কবি একটা সমন্বয় খুঁজে পাওয়ার ফলেই, যে সমন্বয় যদি ইতিহাসের ধারাতে ব্যর্থও হয় কাব্যরচনার জন্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ নয়, সার্থকই। নিঃসংশয় না হলেও সংশয় ক্ষীয়মান, নবযুগের আভাস কানে আসে—

তোমার জীবনে নূতন কালের সূর্য
হাসি-কান্নার সুস্থ আলোয় হাসছে।
সে আলোর প্রাণ-মুক্তি-প্রবল তূর্য
তোমার কণ্ঠে হাসিকান্নায় ভাস্‌ছে।
তোমার জন্ম বরাভয়ে এল গ্রীষ্মে
পূবপশ্চিমে, প্রাসাদকুটীরে, বিশ্বে॥

৪

বিষ্ণু দে তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে কৃতী কবি বলে আমার ধারণা। তাঁর কাব্যে নির্মিতিকৌশলের ফলে সাম্প্রতিক কাব্যের বহু লক্ষণ এবং বহু ভঙ্গীই অঙ্গীকৃত ; সে হিসেবে তাঁর কবিতাগুলির বিশেষ বিচার করলে অনেকগুলি ভঙ্গীই একসঙ্গে ধরা পড়ে। কিন্তু একালের মনে যে ভাবতরঙ্গ ওঠে তার নানা ভঙ্গীকে একসঙ্গে আয়ত্ত এবং একসঙ্গে ব্যবহার করার মতো জটিল অনুভূতি ও প্রকাশপ্রতিভা সকলের না থাকলেও তার এক একটী দিক্ এক একটী আধুনিক কবিদের কাব্যে ফুটেছে। উদাহরণস্বরূপ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য, সম্ভবতঃ, চিত্ররূপ। ছোটো ছোটো আঁচড়ে ছোটো ছোটো ছবি আঁকা হয়েছে, হয়তো সব ক'টার মধ্যে যোগ নেই, শুধুই খাপছাড়া ছবি। শব্দগুণ প্রধান, চিত্র গড়ছে শব্দঝংকার এবং যমক-অনুপ্রাসের খেলায়। যেমন চায়ের বেলার চিত্র—

সিমেণ্ট্, চুনের ঢিপি আছে প'ড়ে
　　নতুন দালান সিঁড়ি-বাঁধা,
সাম্‌নের মাঠে ধূলো কাদা
বুড়ো গাছ, পাতা ধূলো-সাদা,
বাঁকা আলো, ভাঙা শূন্য, নীল হাওয়া
দুপুরের তেজক্লান্ত চোখের শিরায় মোর ছাওয়া,
　　—সব জোড়া এ বিকেল।
কাক-কুকুরের ডাক, টঙা-ঘণ্টা, লোক ঘোরে—
　　চায়ের সময় ওঠে ভ'রে।

—খসড়া : চায়ের বেলা

শুধু কথা জুড়ে জুড়ে ছবি আঁকা চলছে। যেন কোনো সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে নামা হয় নি, অসংলগ্ন ছবির মালা—

ভরা সকাল।
ঝাঁঝাঁ দুপুর ; ঝিঁ ঝিঁ সন্ধ্যে, ঘুঁটে পোড়ানো।
সংসারে জড়ানো
মাঠের কাজ, কাজের অনুবর্ত্তী
পূর্ণিমার চাঁদ, নিঃঝুম রাত, দূরে ডাকচে শেয়াল।

স্তর-ভাণ্ডার কাব্য হিসেবে এর সার্থকতা যাই হোক্, এর স্থায়ী মূল্য কতখানি সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এগুলি হয়তো একালের মানসিক আবহাওয়ার চমৎকার ছায়াচিত্র, কিন্তু একালের মনও তো আর শুধু অসংলগ্ন ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ানোতে নিঃশেষ হতে রাজি নয়, সে এমন একটী নবযুগ গড়বার চেষ্টায় উৎসুক যে নবযুগ ভাবালুতার উপর নির্ভরশীল নয়, ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনিবার্য ফলস্বরূপেই আসবে। সেইজন্য দেখা যায় অমিয় চক্রবর্ত্তীর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "অভিজ্ঞান বসন্ত"-এ একটু অন্য সুর বেজেছে,—তার মধ্যে সার্থক অথচ প্রকৃত নতুন কবিতার সন্ধান বেশী মেলে। কোনো কোনো কবি একালের এই কথাটীকে প্রতীকের সাহায্যে ফুটিয়েছেন এবং সার্থক ভাবেই ফুটিয়েছেন—তাঁদের কাব্যে এই ভাঙনের ইতিহাসটা আবার তত বড়ো নয়। যেমন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজকুমার' কবিতাটা। রাজকুমার সমাজ-নেতার প্রতীক, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীতে তার জন্ম এবং বিভিন্ন তার চেহারা। এমন একটা উগ্র সামাজিক বিষয়ও কাব্যে চমৎকার ফুটেছে—

হে রাজকুমার! উজ্জ্বল খর নভে
রাজ্যশাসন ও দিগ্বিজয়ের কালে
কেঁপেছে নগর অম্বুনিনাদী রবে।
মুণ্ডনিপাত করেছ তাল বেতালে।

মধ্যযুগের অবসানে ক্রমে বণিক্‌তন্ত্রের অভ্যুদয় হলো—

হাতবদলের ঘটা সে কি নির্মম!
নূতন পতাকা উড়েছে প্রাসাদ-চূড়ে!

ঝঞ্ঝাতাড়িত চ্যুতপত্রের সম
স্মরণ তোমার কখন গিয়েছে উড়ে।
তারপর একি! বিধির অপার ছলে
দেখি যে তোমার তরণী বোঝাই ঘাটে।
টাকার দাপটে হরেক রকম কলে
জনগণমনে উদ্বায়ু যত কাটে।

তারপরে সমাজ নেতৃত্বের আধুনিকতম রূপ দেখা দিলো—

আজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা!
এ্যাসেম্ব্লি হল্ জমাট কর কি সাধে?
ক্রেতা বিক্রেতা তুমিই তাদের সেথা।
রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

—বর্ষশেষ : রাজকুমার

বিষয়বস্তুর জোরে কাব্য সার্থক হয় না তার আর একটী প্রমাণ এই কবিতাটী। বিষ্ণু দে'র কবিকিশোর ব্যক্তিগত কাব্য হয়েও আধুনিক, আর এই কবিতাটী সমাজবিবর্তনের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস হয়েই আধুনিক—কিন্তু কাব্য হিসেবে দুটীই উৎরেছে। একালের মনের বিভিন্ন ভঙ্গী বিভিন্ন ভাবে ধরা পড়েছে।

সমর সেনের কবিতায় এই ভঙ্গীটী কিছু নতুন ভাবে ধরা পড়লো। সমর সেনের প্রথম যুগে ভবিষ্যতে আস্থা ছিলো না। সেইজন্য কাব্যোচিত শালীনতা এবং কাব্যোচিত নিয়ম ভাঙাতেই তাঁর প্রাথমিক কবিতাগুলি মুখর। তাঁর অন্যতম কীর্তি নিছক গদ্য ছন্দ রচনা। এ পর্যন্ত যে গদ্য ছন্দের নিদর্শন ছিলো তার মধ্যে ছন্দের দোলা ছিলো-ই। কিন্তু সমর সেনের কবিতায় এই দোলা নেই। সংক্রান্তির বিষণ্ণতা তাঁর ছন্দে ভালো ফুটেছে—সেই কারণেই তাঁর ছন্দ কখনোই দ্রুততালে স্পন্দিত নয়, একটী গম্ভীর চালে চলেছে। তাঁর ব্যঙ্গটা সূক্ষ্ম নয়, স্পষ্ট। সজ্ঞানে 'অশ্লীল' কথা আমদানি করে চমকে দেওয়ার চেষ্টাও তাঁর মধ্যে ছিলো।

অনেক রাত্রে
গহন অরণ্যের পিছনে চকিতে চাঁদ উঠে এলো,
কুয়াশায় স্তব্ধ সুদূর, সুকঠিন।
আর হাওয়া দিলো
উত্তরের বহুদূর দিগন্ত থেকে।

—কয়েকটি কবিতা : ক্লান্তি

একটী পরিপূর্ণ চিত্র। এর চেয়ে কম কথাতে এমন পরিপূর্ণ চিত্র দেওয়া চলতো না, এর চেয়ে বেশী কথাতেও নয়। কিন্তু এই আঙ্গিক ও কৌশলই সমর সেনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর কাব্যে এমন একটী অসুস্থতা-বোধ আছে যা ওরকম ভাবে পূর্বে কোনো কবির কবিতাতেই মেলে নি। কালান্তরের পূর্বে সমাজ রোগে জর্জর, সেই পঙ্গু রুগ্নতা সম্বন্ধে সমর সেন অত্যন্ত সচেতন। সেইজন্য তাঁর কাব্যে একটা অসুস্থ আবহাওয়ার পরিচয় বারে বারে মেলে।

(১) বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

(২) চিত্রার চোখের কোণের ক্লান্তি কি দূর হ'বে—
অনেক, অনেক দিনের
আর অনেক বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি?

(৩) চারদিকে আকাশ মেঘ-মদির
আর কিসের দীর্ঘশ্বাস—

(৪) ঘুম নেই,
শুধু ক্লান্ত কান্নার উচ্ছ্বাসে কোথায় কাদের চোখে
যেন ঘুম নেই।
মৃত মানুষের ভারে ক্লান্ত, কথা তুমি বলতে পারছ না।

(৫) বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।

ভাষার উপর দখল অসামান্য। নতুন উপমায়, নতুন শব্দবিন্যাসে এবং নতুন ছন্দে এই বিষণ্ণতা ও জীবনের অর্থহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই বিষাদভরা বিষিয়ে-ওঠা জীবনে সুস্থ বলিষ্ঠ কার্যক্রমের পরিবর্তে কোনোরকমে দিন-কাটানো, কোনোসময়ে ঝেঁকে-ওঠা প্রবৃত্তির বিকৃত পীড়ন এবং কোনো কিছুকেই মর্যাদা না দেওয়া ছাড়া অন্য কি আশা করা চলতে পারে? সেইজন্য তাঁর কাব্যে প্রেম অর্থহান, উর্বশী-ও কালহীন সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, শরীর ছাড়া হৃদয়ের কোনো মূল্য নেই। এর প্রতিবেশটাও লক্ষ্য করার মতো। সবল মানবতার পটভূমিকায় এ কাব্য রচিত হয় নি, এর পশ্চাৎপট রুগ্ন নাগরিক জীবন।

(৬) হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তানধারণে?

(৭) তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!
কিম্বা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্ব্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্নমুখে
উর্ব্বর মেয়েরা আসে:
কতো অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কতো দীর্ঘশ্বাস,
কতো সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতো দিন!

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, সমর সেনের অসুস্থতাবোধ অচেতন নয়। অর্থাৎ অসুস্থতা কেন সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। তিনি যখন লেখেন,

আর সহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।

তখন এই দুঃসাহসের জন্যই তাঁকে আধুনিক এবং সার্থক বলি না, ও দুঃসাহস অনেক সস্তা বাহাদুরীর প্রার্থীও করতে পারেন। কিন্তু একটী গভীর ক্ষোভ এবং বেদনাবোধ হতে যখন এই উপহাসের উদ্ভব, একটী সুস্থ জীবন নিষ্পিষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যখন এই রূপ ধারণ করে তখন ঐ দুঃসাহস সস্তা বাহাদুরীর স্তর কাটিয়ে ওঠে। সমর সেনের

মধ্যে এ বেদনাবোধ সুস্পষ্ট। সমস্যার স্বরূপ না বুঝে শুধু একালের মনের একটা বিশেষ ভঙ্গীর প্রতিলিপি রচনাতে-ই তাঁর কাব্য নিঃশেষ হয় নি। তাঁর বক্তব্য—

> মহান মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় নেই
> বিদ্যুতের আলোয়,
> তিলে তিলে মৃত্যু রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু আমাদের প্রাণ ;
> দিকে দিকে আজ হানা দেয় বর্ব্বর নগর,
> আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
> কতো শতাব্দীর শূন্য মরুভূমি !

যে পুরুষ ঘটনাচক্রে মহান্ মৃত্যুর সম্মুখীন হবার অভাবে নিউরটিক এবং যে কাপুরুষ সবসময়ে-ই নিউরটিক, নেহাৎ নীতিবাগীশ ছাড়া এ-দুয়ের পার্থক্য স্বীকার করতেই হয়, অন্ততঃ দুইয়ের সামাজিক গুরুত্ব এক নয়। দ্বিতীয়টা অদৃষ্টের পরিহাস, কিন্তু প্রথমটা তীব্র সমাজ-সমালোচনা। সুস্থ সমালোচনা নয়, ঋজু সমালোচনা নয়, কিন্তু তিক্ত তীব্র সমালোচনা। অসুস্থ বলে-ই তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কাব্যের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনেই এই 'কত শতাব্দীর শূন্য মরুভূমি' দূর করতে হবে, তা না হলে ক্যাক্‌টাস আর ফণিমনসাই ফলবে, সোনার ধানও নয়, ধানও নয়। বাংলা সাম্প্রতিক কাব্য সে হিসেবে একাধারে সার্থক ও অসার্থক। সার্থক, কেন না মরুভূমির চিত্র তার মধ্যে ভালোই ফুটেছে ; অসার্থক, কেন না মরুভূমি ছাড়া অন্য উপকরণ জোটা তার সম্ভব হয় নি। যাঁরা মরুভূমির মধ্যে থেকেও মরূদ্যানের সন্ধান পেয়েছেন, কি সুজলা সুফলা দেশের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা ভাগ্যবান্, কিন্তু সে কারণে যাঁরা সে সন্ধান পান নি তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না। রসসংগ্রহই যদি কবির কাজ হয় তা হলে মরুভূমির কবিরাও নিঃসন্দেহ কবি, তাঁদের রস যদি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যথেষ্ট না হয় তা হলে সে দোষ মরুভূমিরই, রস-সংগ্রাহকের নয়। অবশ্য সার্থক কবিদের কথাই বলছি ; অক্ষম কবিদের সাফাই হিসেবে কথাটা

প্রযোজ্য নয়। সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ যে অস্বীকার করা চলে না এটা তার অন্যতম প্রমাণ।

সমর সেনের কবিতাগুলি, তার প্রাথমিক বাহুল্য বাদ দিলে, বাস্তবিকই একটী নতুন ভঙ্গীর প্রবর্তক। তাঁর পরবর্তী কবিরা বহু সময়ে অন্য পথে একালের মনে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। তাঁদের ছন্দ ঝঙ্কারহীন ও মিলবর্জিত নয়, ঐ আঙ্গিকে নতুন বিষয়বস্তু—এমন কি, অনেক সময় অত্যন্ত প্রচারঘেঁসা বিষয়বস্তু—চালিয়ে তাঁরা একালের ভাবস্পন্দনকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাতে কেউ বুরিদানী গাধার রসিকতাতেই পর্যুদস্ত, কেউ বা সার্থক কবিতাও লিখতে পেরেছেন। কিন্তু সমর সেনের যেগুলি সফল কবিতা সেগুলি সস্তা নতুনত্বের কবিতা নয়, তার মধ্যে প্রকৃত কবিকর্ম ও সার্থক নতুনত্ব আছে। ছন্দ, ভাষা এবং কাঠিন্যে এগুলি অত্যন্ত সংহত কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর।

> অর্দ্ধরাত্রে
>
> দূর কোন্ অরণ্যে এলো করুণ মর্ম্মর,
> আর উতলা হাওয়া দিলো অন্তরের শূন্যতায়,
> আর রক্তের গভীর অন্ধকারে
> চঞ্চলতা এলো হরিণ শিশুর।
> দিগন্তের কুয়াসায় যেন স্বপ্নের আভাস
> কোথায় কোন্ পথের দুধারে নেমেছে গভীর অন্ধকার,
> হাওয়ায় দেবদারুর স্তব্ধ-ঘন সারি উঠছে কেঁপে,
> আর ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর একপ্রান্তে—
> সহসা এসেছে অরণ্যের হাহাকার
> পাষাণের দীর্ঘ রেখায়।

এরকম কবিতা পড়লেই একসঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে হয়। কবি "অন্ধ নাৎসি গুণ্ডা, অন্ধ জাপানী চোর" সম্বন্ধে কবিতা লিখছেন না, তাঁর কবিতা চলতি বুলি অনুসারে লিরিক্, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের

আশ্চর্য কলোচ্ছ্বসিত কবিতা আছে, কিন্তু সমর সেন সে সমস্ত ঐতিহ্য কাটিয়ে এমন একটা ভঙ্গীতে লিরিক লিখছেন যার সৌন্দর্যের উপকরণ কলোচ্ছ্বাস নয়, কঠিন সংহতি। মনে হয় রদ্যাঁর মর্মর কলোচ্ছ্বাসের পর এপ্‌স্টাইন, এরিক গিলের প্রাস্তরিক সৌন্দর্য। আদিম পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আদিম বন্ধনের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। গভীর সময়বোধ সুস্পষ্ট। কিছু দ্বিধাও আছে, নিজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে কবি লজ্জিত, আবার সম্পূর্ণ বহির্মুখীনও ন'ন, ফলে হাহাকার এবং অসুস্থতাবোধ। কিন্তু সেটাই কবিধর্মের কথা, তার জন্য সমর সেনের চেয়ে তাঁর সমাজই বেশী দায়ী। এই পারিপার্শ্বিকে সমর সেন যে ভঙ্গী প্রবর্তন করেছেন সেটা নিশ্চয়ই সার্থক, এমন কি, সমর সেনের নানা কবিতা অসার্থক এবং কাব্যাদর্শে অনুত্তীর্ণ হলেও।

সমর সেনের কবিতা হতে আমরা একটা বিষয়ে সাবধান হতে পারি। পূর্বের কবিদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় এঁর মধ্যে সমাজবোধ গভীরতর এবং বহু সময়েই সামাজিক দিক্‌টা আরো প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। কিন্তু এইখানেই নজর রাখার প্রয়োজন সমাজবোধের নামে কাব্যকে মনগড়া তত্ত্বের খাতে বহাবার চেষ্টা চলেছে, না কাব্যের স্রোত নতুন খাতে স্বাভাবিক পথেই বইছে। সমর সেন যে আঙ্গিক এবং যে ভঙ্গীর প্রবর্তন করলেন তার ফলে কাব্যরচনা দুরূহ হয়ে উঠলো। অর্থাৎ একদিকে যেমন অক্ষম কবিদের সুযোগ বাড়লো তেমনি কৃতী কবিদের দায়িত্ব বাড়লো। এ ভঙ্গীর প্রকৃত কাব্যরচনা বস্তুতঃ কঠিনতর, কেননা শুধু ব্যক্তিগত উপকরণের সাহায্যে কাব্যের অকালমৃত্যু ঘটানোর চেয়ে এই উপকরণে কাব্যের অকালমৃত্যু ঘটানো আরো সহজ। গদ্যকাব্য যে-কেউ লিখতে পারেন এরকম ধারণা কাব্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার চমৎকার উদাহরণ। গদ্যকাব্য লেখা সহজ নয় তার অন্যতম প্রমাণ সমর সেনের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই গদ্যকাব্য লিখেছেন কিন্তু সফল হন নি, আর যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের অনেকেই ও ছন্দে এবং ও ভঙ্গীতে কবিতা লেখেন নি।

এই শেষোক্ত দলের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। এঁর কাব্যে সমাজবোধ আরো স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ, কিন্তু রচনাগুণে এগুলির সমবায়েই তাঁর কবিতা কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচারপত্রে পর্যবসিত হয় নি। তা ছাড়া আরও লক্ষ্য করতে হয় এঁর নতুন ছন্দ উদ্ভাবন। যাঁরা এঁর কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা ছন্দের নতুন সম্ভাবনার কথা আলোচনা করতে চান তাঁরা এবিষয়ে শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৪৭) পড়বেন। কিন্তু অনভিজ্ঞের কাণেও এঁর ছন্দোবৈচিত্র্য ধরা পড়বে। রচনাভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ছন্দোভঙ্গী এঁর কবিতায় নতুন রূপ ধরছে। আরো লক্ষ্য করার কথা, এঁর দৃষ্টিভঙ্গী নতুন পরিবেশের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলেও কোনো বাঁধা তত্ত্বের চাপে মুমূর্ষু নয়,—প্রত্যক্ষতঃ সামাজিক বিষয় এবং প্রত্যক্ষতঃ ব্যক্তিগত বিষয়—কোনোটাই তাঁর কাব্যের বহির্ভূত নয়। ঘাস পাতা ফুল নিয়ে কবিতা লিখলেই অনাধুনিক হতে হবে এরকম দুর্বলতা তাঁর নেই, কারণ যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নতুন তাঁকে বিষয়বস্তুর জোরে আধুনিক হতে হয় না। তাঁর একটা কবিতা যেমন—

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখী আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

*   *   *

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয়, হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা ॥

—পদাতিক : যে-দিনের কবিতা

ধ্বংসের ফলে কবিকে অবিশ্বাসী-ই হতে হয় নি, নতুন বিশ্বাস তাঁর আছে। সেইজন্য এই স্পষ্ট ঘোষণা এবং স্পষ্ট প্রশ্ন—

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড আজ নবযুগ আনবে না ?

কবির ক্ষমতাগুণে এরকম প্রচার-ঘেঁষা ব্যাপারও কাব্যরূপ পেলো, কবিতার রস এতে আছে—

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জলে হাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পা'ক।

কিন্তু পদস্খলন নেই তা-ও নয়। জাপ-পুষ্পক, লালঝাণ্ডা থাকলেই একালেও সার্থক কবিতা হয় না। যেমন,

মাঝে মাঝে শোনা যায় ভবঘুরে কুকুরের ঠোঁটে
নতুন শিশুর টাটকা রক্তিম খবর !
(তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায় !)
চীনা লাল সৈনিকের শরীরে এখন
নিবিড় নির্বাণ বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেওনেট ?

'আধুনিক' হবার আগ্রহে নানা 'আধুনিক' উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে কুকুরের ঠোঁটে নতুন শিশুর রক্তিম খবর আছে, তন্বী চাঁদের লীলা আছে, চীনা লাল সৈনিকের বেয়নেট সহের কথা আছে —কিন্তু এগুলি শুধু আছে-ই, কাব্যের প্রয়োজনে আসে নি। বরং

এগুলির অকারণ সমাবেশে অজীর্ণ ঘটেছে, কোথাও কোথাও বীভৎস রসের পরিবর্তে জুগুপ্সাই বর্তমান, কোথাও বা 'আধুনিক' হবার লোভে কল্পনা উদ্ভট হয়েছে কিন্তু সার্থক হয় নি। উপরে উদ্ধৃত অংশের প্রথম দুটী লাইন জুগুপ্সার উদাহরণ, তৃতীয় লাইনে উদ্ভট কল্পনার সন্ধান মেলে। এই প্রসঙ্গে এরকম আচমকা অসঙ্গত কল্পনার আরো একটী উদাহরণ মনে এলো—

> আমার বসন্তে রঙ্ ধরেছে আর কোনো মেয়ে এশিয়ার সমস্ত আকাশ
> জয় করেছে।
>
> —কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ সোনার কপাটঃ
> একপয়সায় একটি সিরিজ, ১৬ পৃষ্ঠা।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন যাঁরা 'মার্কসপন্থা' 'গণশক্তি' 'আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল-মজুরদের ধর্মঘট' ইত্যাদি গরম বস্তু নিয়ে মেতে থাকেন কাব্যকৌশলের মত কবোষ্ণ বিষয়ের আলোচনা তাঁদের কাছে আশা করা অন্যায়। বলা বাহুল্য, এরকম অদ্ভুত আপত্তি আমার নয়, কেন না, সমাজ কি ভাবে সাহিত্যে ছায়া ফেলে তার আলোচনা পূর্বেই করেছি এবং কবির মানসিক গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে কি ভাবে একই বীজ বিভিন্ন ফসল ফলায় তার পরিচয়ও পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বসন্তে রং ধরার সঙ্গে কোনো মেয়ের এশিয়ার আকাশ জয় করার কাব্যগত সম্বন্ধ কি, প্রয়োজনই বা কি? তা না হলে এশিয়াবাসী হয়েও এশিয়ার খাতিরে এ কাব্যকে কাব্য বলাও চলবে না, আধুনিক বলাও চলবে না। এই সত্যটী সব কবি বুঝেছেন বলে মনে হয় না।

'পদাতিক-এর মধ্যে ব্যক্তিগত কবিতাও আছে। যেমন,

> সেই নাগরিক ধূসর জীবন
> পিছনে ফেলে'
> সব থেকে দ্রুত ট্রেনে করে আজ
> এখানে আসা
>
> —আসানসোলে।

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের গায় সারি সারি সব
চিমনি চূড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে,—
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শাণ
শুনছে নাকি
কামারশালে?
দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে
সূর্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো
পাহাড় থেকে
ক্লান্ত চোখে।

আধুনিক কবিতার নিদর্শন হিসেবে এটা 'জাপপুষ্পকে'র কবিতার চেয়ে একটুও কম 'আধুনিক' নয়, কবিতা হিসেবে তো নিশ্চয়ই সার্থক। ওয়েনের মধ্যমিল নিয়ে পশ্চিমী সমালোচকমহলে একদা উচ্ছ্বাস চলেছিলো, তাতে হঠাৎ-পতনের আভাস সুস্পষ্ট। এ কবিতার লাইনগুলির মধ্যেও হঠাৎ ভেঙে-পড়ার আভাস স্পষ্ট, ভাবের আপনহারা উচ্ছ্বাস বা রুদ্ধশ্বাস প্রবহমানতা নেই। আর যে মনটা এ কবিতার আকাশ পাহাড় ধান দেখছে সে মনটা যে দৈবী শান্তিতে নিশ্চিন্ত নয় তার ইঙ্গিত এর প্রতিপদেই মেলে, এমন কি চটকল-ধর্মঘটের উল্লেখ না থাকলেও মেলে। 'নাগরিক ধূসর জীবন', 'খাড়া করে কান কাস্তের শাণ শুনছে নাকি কামারশালে', 'অতিকায় তার ডানা মেলে কালো পাহাড় থেকে ক্লান্ত চোখে' প্রভৃতি শব্দ গঠনে, অর্থের ইঙ্গিতে, উপমার বৈশিষ্ট্যে, এই ধরণের শব্দ ও অর্থের ধ্বনিতে এবং ছন্দের গুণে যে চিত্র গড়ে ওঠে এবং যে রস জমে সে রস গজমোতিমিনারের নয় এ কথা অরসিক ছাড়া সকলেই বুঝবেন।

৫

কিছুদিন পূর্বে বাংলার কবিদের বৈদেশিক বিশেষণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো, বাংলার স্কট বাংলার বায়রণ বাংলার শেলী প্রভৃতি নাম শোনা যেতো। স্বদেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই আহরিত উপমানে আমরা লজ্জা পেতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি যে কাব্যকলা বাংলা সাহিত্যেও গড়ে উঠছে তার মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কেউ এলিয়ট্ কেউ বা অন্য কিছু এরকম ইঙ্গিত দেখা যায়। এ কথা সত্য যে পশ্চিমী সাহিত্যের ছায়া এই কাব্যকলায় অত্যন্ত বেশী, বৈদেশিক কবিদের সার্থক বা অসার্থক রচনাও এখানকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের অবিরত অনুকার্য হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এর কোনো সার্থকতা নেই এবং এ পন্থায় কবিরা আত্মস্থ হবার সুযোগ পাবেন না, কেন না স্বকীয় প্রতিভায় এদেশী রসের সঙ্গে বিদেশী রসের সার্থক সংমিশ্রণ আর নিছক অনুকরণ এক জিনিস নয়।

সেই কারণে এই কাব্যকলার আলোচনায় আমরা যে সমাজ-বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করেছি সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা মনে রাখা দরকার। বর্তমানে বিদেশী সভ্যতার সংঘাত ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ক্রমশঃ ভেঙে পড়ার ফলে বিদেশের দিকে মুখ-তাকানোর মাত্রা ক্রমবর্ধমান। সেইসঙ্গে যন্ত্রের প্রসারের ফলে আমাদের সামাজিক গঠনও ক্রমশঃই পরিবর্তিত হচ্ছে, বিদেশী চাপ তার মধ্যে ক্রমেই পরিস্ফুট। এই অবস্থায় ওদেশের সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে আমাদের একালের সামাজিক বিবর্তনের সাদৃশ্য টানার উৎসাহ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমাজ ছাড়াও, এ কবিদের মানস--তীর্থ বিদেশে। সেইজন্যে সামাজিক বিবর্তনে বিদেশের যেটুকু প্রভাব আশা স্বাভাবিক এঁদের কাব্যে বৈদেশিক প্রভাব তার চেয়ে বেশী। এইখানেই মেকি কাব্যের ভয় আছে।

সাহিত্যে যে ক্ষয়িষ্ণুতার হাওয়া একদল কবির মনে বন্ধ্যামাটী ও

ফণিমনসার স্বপ্ন জাগিয়েছিলো আর একদল কবি সেই নৈতিধর্ম হতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় সম্প্রতি ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, নবযুগের আশাই তাঁদের সঞ্জীবনী। কিন্তু সমাজে যেমন সেই নতুন ঐতিহ্যের দিকে এগোবার পথেও একমুখীন অগ্রগতি হয় না সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নেই। তার ফলে আমরা অন্ততঃ এমন দুই-একজন কবিরও সন্ধান পেয়েছি যাঁরা বর্তমানের সমস্যাটা অনুভব করেছেন, কিন্তু তার অনুভূতি সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণুতার পথেও এগোন নি, বা বিপ্লব-বিলাসীও হয়ে ওঠেন নি। যেমন মোহিতলাল মজুমদার। একালের কাব্যভঙ্গীর প্রবর্তকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার অন্যতম ; বর্তমান যুগের তপ্ত ঝড় তাঁর মনেও লেগেছিলো, কিন্তু তিনি তা হতে উদ্ধারের আশায় ভবিষ্যতের দিকেও মুখ ফেরান নি, মরুভূমিকেও সত্য বলে স্বীকার করেন নি। মরূদ্যানের কাব্যও তাঁর নয়, ভবিষ্যতের আশায় মরুভূমিকে আপাততঃ স্বীকার করাও তাঁর ধর্ম নয়। তাঁর প্রাণবত্তার প্রাচুর্য আছে এবং সেই প্রাচুর্যে তিনি মরুভূমিকেই সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কবিতায় তাঁর এই মতটা ধরা পড়ে—

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে তন্ত্রে শুকাইল শেষে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া ; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মূরতি !
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি আর আছে সতী—
দম্পতী নাহিক' কোথা ! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় উঠে, বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে !
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি।

* * * *

এমনই কাটিল যুগ, যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান ;

দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি কি বারতা বিতরিল প্রাণে।
উছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা-ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ!
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান!
দেবতা কহিল কথা চুপি চুপি মানুষের কানে!
স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা হৈমবতী।
সে নহে কিশোরী-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা ব্রততী—
নম্রমুখী-বদনী রাধা—যমুনায় গাগরী-ভরণে।
সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে!

—বঙ্কিম-প্রতিভা: বঙ্কিমচন্দ্র

আধুনিক কবিতা বলতে যদি আমরা গদ্যছন্দে লিখিত একটী বিশিষ্ট ভঙ্গীর কবিতাই বুঝি তা হলে এখানে থমকে দাঁড়াতে হবে। এ কবিতার রস অনস্বীকার্য, কিন্তু সে রস ও ভঙ্গীতে উদ্রিক্ত হয় নি। সেই কারণেই আধুনিক কবিতা মানে একটী বিশিষ্ট ভঙ্গীর কবিতা নয়, একালের ঐতিহ্যে কবিদের মন যে কাব্যভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ এবং পাঠকসমাজের রসোদ্রেকে সক্ষম সে সবই আধুনিক কাব্যের অন্তর্গত। যাঁর মন একালের ঐতিহ্যেও এইভাবে উদ্বুদ্ধ এবং তার ফলে পাঠকদের আনন্দ জাগাতে সক্ষম তাঁর পক্ষেই যে এরকম কবিতা লেখা স্বাভাবিক ও উচিত শুধু তাই নয়, এ হতে এ কথাটীও বোঝা যায় যে নতুন নিঃশ্রেণীক আদর্শ আমাদের একমাত্র সামাজিক সত্য নয়। যাঁরা নিঃশ্রেণীক সমাজে বিশ্বাসী এবং অনুভব করেন যে ভাঙন ছাড়া সে সমাজ আসা সম্ভব নয় তাঁরা হয়তো বলবেন এটী সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিবিপ্লবই। কিন্তু সমাজে প্রতিবিপ্লব যদি এখনও সত্য হয় তাহলে সেটীকে সামাজিক দুর্ঘটনা বলা চলে, কিন্তু তার ফলে যদি প্রাণবান্ সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হতে পারে তা হলে বলতে হবে প্রতিবিপ্লবেরও জোর

আছে। সেটা এখনও সামাজিক সত্যও। যাঁর মধ্যে ঐ আদর্শের চেয়ে এই আদর্শ ই অধিকতর সত্য তাঁকে জোর করে তাঁর আদর্শ ত্যাগ করতে বলায় বিপ্লবের উপকার হোক্ বা নাই হোক্ তাঁর কাব্যের উন্নতি আশা করা যায় না। সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলতে পারেন ভবিষ্যতে এ ধরণের কাব্য সম্ভব হবে কি না। আমাদের সমাজে যে ঐতিহ্যের ফলে এ ধরণের প্রাণোচ্ছ্বাস সম্ভব সে ঐতিহ্য বিলুপ্ত হলে ও ধরণের কবিতা হয়তো সম্ভব হবে না, অন্ততঃ ও ধরণের সার্থক কবিতা পাওয়া কঠিনতর হতে পারে। কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানের নয়।

আধুনিকতার এই মূল কথাটা না বুঝলে অনেক অকারণ তর্ক এবং ভ্রান্তির সম্ভাবনা। মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য আধুনিক এবং বিষ্ণু দে'র কাব্যও আধুনিক এ কথা বললেই আপত্তি তোলা যেতে পারে, দৃষ্টিকোণ ঘন ঘন পরিবর্তন না করলে কি ভাবে একথা বলা সম্ভব, কেন না দুজনে প্রায় বিপরীতধর্মী। কিন্তু একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীই যদি আধুনিকতার নামান্তর না হয় তা হলে বুঝতে হবে ও দু'জন কবিই আধুনিক কারণ দুটা ধর্মই সমাজে চলেছে। নানা সমালোচক 'চটকল-মজুর-ধর্মঘট'-কণ্টকিত কাব্যকেই আধুনিক বলে ভুল করেন, তার একটা কারণ আছে। সমাজ বিবর্তনের পথে আমাদের জীবনে যেগুলি ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠছে কবিতায় সেগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে সমালোচকেরা সহজেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে এর মধ্যে 'আধুনিক' মনের ছাপ নিঃসন্দেহ। কিন্তু চিহ্ন মিলিয়ে ছাপ দেওয়া প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা নয়। সমাজতন্ত্র ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রের যে সংযোগ ও বিপ্রয়োগের ফলে কাব্য গড়ে ওঠে সেই সংযোগ ও বিপ্রয়োগের জটিল ও গভীর ঘাতপ্রতিঘাত সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কেবল কতকগুলি নেহাৎ বাহ্য চিহ্ন মিলিয়ে আধুনিকত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া সমালোচনার নামে অপকর্ম। যাঁরা বলেন কাব্য সুলিখিত না হলেও চলে, যুগপ্রতিভু হলেই হলো তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক

হতে পারেন কিন্তু সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধনির্ণয়ে পারদর্শী ন'ন। যে সমাজতাত্ত্বিক অস্পষ্ট ভাষায় ক্ষীণ কণ্ঠেও নিঃশ্রেণীক সমাজের আগমনী গাইবেন সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর প্রশংসা হয়তো করা চলে, কিন্তু কোনো কবি কেবল মজুর কিষাণের কাব্য লিখছেন বলেই তাঁর সাত খুন মাপ এ কোনো কালেই কাব্যনীতি নয়।

আসলে, আধুনিকতা নির্ণয়ের মাপকাঠি ও ধরণের নয়। পরস্পর-বিরোধী রচনাশৈলীর মধ্যেও সার্থক আধুনিক কবিতা যেমন খুঁজে পাওয়া সম্ভব, বিপরীতধর্মী রচনাশৈলীর মধ্যেও তেমন কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে কোনো ভঙ্গীবৈশিষ্ট্য বা কোনো মুদ্রাদোষের জোরে কবিধর্মের অভাব এবং কবির অসাধুতা ঢাকা যায় নি। দুটী বিপরীত রচনাভঙ্গী হতে দুটী উদাহরণ আলোচনা করলে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
এদিক ওদিক চায় 'গুনগুনি গান গায়,
কভু বা চমকি চায় ফিরে'।
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরিপথ ঘিরে'।
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ !
টস্‌টস্‌ রসে ভরপূর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপূর
মেঘ ডাকে কড়্‌ কড়্‌ বুঝি বা আসিবে ঝড়
একটু নাহিক ডর তা'তে ;
উঘারি বুকের বাস পূরায় বিচিত্র আশ
উরশ পরশি' নিজ হাতে !
অজানা ব্যথায় সুমধুর—
সেথা বুঝি করে গুরুগুর !

স্পষ্ট বোঝা যায় কবির বলার কথা কিছু নেই, বা থাকলেও ক্ষীণ; দুর্বল ছন্দে দুর্বল ভাবের আরো দুর্গতি ঘটেছে। 'গতিতে ঝরে আনন্দ, উথলে নৃত্যের ছন্দ, আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে।' ছন্দের দুর্বলতা অসহ্য কিন্তু অকারণ নয়, আর গতিতে আনন্দ ঝরা এবং নৃত্যের ছন্দ উথলানো প্রভৃতি আরোপ অলংকারশাস্ত্রের পাতা হাতড়েই সংগ্রহ করা। 'উঘারি বুকের বাস' বলে যে রস ব্যঞ্জিত হয়েছে সে রস অবিমিশ্র আত্মরতির রস, কাব্যের স্তরে তা পৌঁছয় নি। সমিল ছন্দ আছে, আপেলের মত মুখ ও বুক আছে, চটকল-ধর্মঘট নেই—সুতরাং এ কাব্য চলতি অর্থে 'আধুনিক' নয় এবং সার্থক—এ কথা কোনো ক্রমেই বলা চলে না। আধুনিকতার যে বিশেষ সংজ্ঞা নিয়ে এ আলোচনার শুরু সে সংজ্ঞায় এ কবিতা অনাধুনিক এবং পরিত্যাজ্য, কেন না পূর্ব সংস্কারের অক্ষম এবং অবর ব্যবহার চিত্রকাব্যের মূল্যবৃদ্ধির অতি ক্ষীণ সহায় মাত্র। তাতে প্রকৃত রসিক পাঠক বিভ্রান্ত না হলেও কাব্যের ক্ষতি নিশ্চয়ই। সাধুতার অভাব সুস্পষ্ট।

এবার আর একটা অন্য ভঙ্গার উদাহরণ নিচ্ছি।

> আমি ঘুমোতে পারিনে, আমাকে ঘুম পাড়াও,
> মণি, মণি আমার, মণিমালা।
> বাড়াও, আমার দিকে তোমার পা বাড়াও,
> স্বপ্ন-ঝরানো তোমার হাত বাড়াও,
> ছড়াও, কালো চুলের ঠাণ্ডা ঘুম ছড়াও,
> তোমার কণ্ঠের নিশীথিনীতে আমাকে জড়াও—
> প্রিয়, প্রিয় আমার প্রিয়তম।

গদ্য-কবিতা, সুতরাং 'আধুনিক' বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে তাগিদে কবিতা ফোটে এবং তার যে চেহারা হলে গদ্যকবিতা ফোটে, রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে হয়, "এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোন ছন্দে বলতে পারতুম না," সে তাগিদ

এখানে নেই। আঙ্গিক নেহাত আকস্মিক, বলার কথার তাগিদে তা আসেনি। এসম্বন্ধে একালের কবির ভাষাতেই বলতে হয়,

আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,
মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি,
মনে রোমাণ্টিক বুলবুলের অবিরত গান,
তুমি ছিলে তারই একজন।

—সমর সেন : কয়েকটী মৃত্যু, নানা কথা।

বলা বাহুল্য, রোমাণ্টিক কাব্যকে উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ একালের মন রোমাণ্টিক ভঙ্গীতে উদ্দীপিত না হলেও সেকালে যাঁদের মন ঐ ভঙ্গীতেই উদ্দীপিত হয়েছিলো তাঁরা অন্য ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করলে কাব্যের ক্ষতি-ই হতো। আমার বক্তব্য এই যে, বাহ্য আকারের সুযোগ নিয়ে এক জিনিষকে অন্য জিনিষ দাঁড় করানোর চেষ্টা কাব্যের আইনেও দণ্ডনীয়। এক্ষেত্রে চেহারা থাকা সত্ত্বেও এ কাব্য অনাধুনিক, এবং পরিত্যাজ্য। প্রাণবান ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে কেবল ফ্যাশানের অনুকরণই (সে ফ্যাশান প্রাচীনই হোক্ বা নবীনই হোক্) কাব্যে অসাধুতা এবং অনাধুনিকতা একথা বোঝা দরকার।

সাহিত্যের ভঙ্গী বদলের জন্য যদি দায়ী হয় মেজাজের পরিবর্তন, এবং মেজাজের পরিবর্তন যেহেতু পারিপার্শ্বিকের ফল, 'আধুনিক' সাহিত্য রচনা সহজ নয়, তার মধ্যে ষোলো আনা কবিকর্ম দাবী করার অধিকার আধুনিক পাঠক সমাজের আছে। পাঠকসমাজের মধ্যে নির্মম রুচিবোধ গড়বার চেষ্টা একালের সমালোচকদের উচিত ধর্ম, বিশেষতঃ যখন বৃহত্তর সমাজবোধেই একালের কবিদের বিঘোষিত বিশ্বাস।

৬

তাহলে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের অবস্থা দাঁড়ালো কি ?

পূর্বের আলোচনা হতে বোঝা যায়, আধুনিক কথাটার অর্থ হাল ফ্যাশান নয়। তার একটি গভীরতর অর্থ আছে। সেইজন্যে যাঁরা

মনে করেন বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দ, অশ্লীলতা প্রভৃতি এ পর্যন্ত অপ্রচলিত লক্ষণ দেখা দেওয়ার ফলেই তার আধুনিকতা নিশ্চিত তাঁদের মতে সায় দেওয়া চলে না। আমাদের সমাজে এবং মনে যে নতুন পালা শুরু হয়েছে তাতে একটা যুগান্ত এসে উপস্থিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলি যে প্রধানতঃ এই যুগান্তেরই ফল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। সে কারণে ও লক্ষণগুলি যেখানে সার্থকভাবে ব্যবহৃত সেগুলিকে আধুনিক বলবো কিন্তু সেগুলিকেই আধুনিক বলবো না। অন্য ভঙ্গীতেও যদি কোনো কবি একালের মনকে রস যোগাতে পারেন সে ভঙ্গীও সম্পূর্ণ আধুনিক একথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হবে।

এই কথাগুলি স্বীকার করলে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ, বাংলা সাম্প্রতিক কাব্য ঐতিহাসিক কারণেই এই রূপ ধারণ করেছে। একালের কবিদের মন ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে না, বরং এখনও সংবেদনশীল তার প্রমাণ কাব্যের হাওয়াবদল সমাজ-বিবর্তনের পিছনে নয়, বরং আগে চলেছে। অবশ্য যে ভঙ্গীর কাব্য রচিত হচ্ছে তাতে ফ্যাশানের তাগিদ এবং মেকির পরিমাণও যথেষ্ট; আর কবিদের মন যেরকম অবিশ্বাস ও নেতিবাদে পরিপূর্ণ তাতে সংবেদনা ও অনুভূতি কতটা বজায় রইলো সে কথা অনুমান করা কঠিন। তবু যে ভঙ্গী-পরিবর্তন হচ্ছে এবং কোনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে এবং হয়তো কয়েকটা স্থায়ী নতুন ভঙ্গীর জন্ম দিয়েছে এ হতে মনে হয় সমষ্টিগত ভাবে কবি সম্প্রদায়ের মন এখনও অনড় অচল নয়।

দ্বিতীয়তঃ, একালের কাব্যে জনমানস বা গণশক্তি সম্বন্ধে যতই স্তুতিবাদ থাক্ এ কাব্য নিঃশ্রেণীক সমাজের কাব্য, অর্থাৎ প্রাণধর্মের পূর্ণ ও সার্থক প্রতিষ্ঠার কাব্য নয়—সেটা প্রধানতঃ ভাঙনেরই কাব্য। এর দোটানা শেষ হয় নি—ভবিষ্যতের দিকে সময় সময় মুখ ফেরালেও এর অতীতের বাঁধন কাটে নি। সমাজেও তো সেই

অবস্থা। এই কারণেই এর মধ্যে কোনো কোনো কবিতা বা কোনো কোনো কবি একক ভাবে সার্থক হলেও সামাজিক দিক্ দিয়ে এ কাব্যের সার্থকতা কম। এর মধ্যে কবিকর্ম যথেষ্ট থাকলেও কবিধর্মের সুযোগ কম, কেন না এ যুগ ও এই সামাজিক পরিবেশ কোনো প্রাণবান্ ঐতিহ্য এবং নির্মোহ সচেতন বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এই কথাটা পরিষ্কার হয় বর্তমান কাব্যের ত্রুটিগুলি আলোচনা করলে। পূর্বে একালের সমালোচকদের মতিভ্রান্তির কারণ নির্দেশ করতে দেখা গেছে তার পিছনে কয়েকটা সামাজিক কারণ আছে। মানসিক দোটানাই ওরকম মতিভ্রমের হেতু। সে কথাটা কাব্যের বেলাতেও অচল নয়। একালের কবিদের ত্রুটিগুলি হতেই যে ঐ কথার প্রমাণ মেলে তাই নয়, একালের কবিদের প্রতিভার স্বল্প আয়ুও তার আর একটা প্রমাণ।

একালের কবিদের পদস্খলনের কতকগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। সেগুলি সমগ্রভাবে আলোচনা করলে বোঝা যায় সেগুলির কারণ শুধুই ব্যক্তিগত নয়। একটা ছোটো উদাহরণ প্রথমে আলোচ্য—

> শুনেছি চেকের স্বাধীনতা অধিকার
> ইসারায় সাবে জনৈক হিটলার;
> দুর্দিনে তাই ভরসা করি বা কার।
> সস্তা বাটার জুতাও পাব না আর!
>
> —চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : বর্ষশেষ

কবিতাটী হালকা সুরে রচিত, খুব গুরুত্ব আরোপ করার কারণ সম্ভবতঃ নেই। তবু এখানে ব্যঙ্গের কৌশলটা কি? জোর করে হাসি ফোটানোর জন্য হিটলারকে 'জনৈক হিটলার' হতে হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে কবি কিছু কিছু কথা 'শুনেছেন' মাত্র। কিন্তু হিটলার কিম্বদন্তী হলেও বাটার দেশ ও জাতি সম্বন্ধে কবির পূর্ণ জ্ঞান আছে, সেখানে অস্পষ্টতার আভাস নেই। চেক্‌জাতির স্বাধীনতা হরণ সহজেই কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারতো এবং স্পষ্টতঃই হতে পারতো—তার

জন্যে ইশারা, বক্রোক্তি বা ব্যঙ্গহাসির প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু কবি এখানে 'আধুনিক' টেক্‌নিক্ অনুকরণ করতে গিয়েই এই সর্বনাশ করেছেন এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। ফ্যাশানের মোহ কাব্যধর্মের চেয়ে প্রবল হয়েছে সন্দেহ হয়।

আরো একটী উদাহরণ দিচ্ছি—

বর্তমান মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা
মাঝে মাঝে মনে হয়—
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি!
নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,
শেয়াল-সঙ্কুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে-ঘর বাঁধি;
গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান,
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান,
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে;
নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।

—সমর সেন: গ্রহণ, ২৩ পৃষ্ঠা

একটী নিখুঁত কবিতা জোর করে 'আধুনিক' হবার চেষ্টায় নষ্ট হলো। প্রথম লাইন ক'টাতে বোঝা যায় কবির মানসিক হাওয়া কোন্ দিকে; বোঝা যায় পলায়নের ভাণ দেখালেও আসলে তা ভাণই, তাতে কবির মন মজে নি। এর প্রকৃত স্বরূপ কি, সংক্রান্তি যে আসন্ন, সে ভাবটা শেষ দুটী লাইনে যেমন ফুটেছে তার চেয়ে ভালো করে সে কথা বলা চলে কি না সন্দেহ। কিন্তু কবি অতো চমৎকার লাইন দুটী লিখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, সেইজন্যে যেখানে পলায়নের কথা এলো

সেখানে এমন বিশেষণ এমন উপমা আমদানি করলেন যেগুলি কাব্যের খাতিরে আসে না, যেগুলি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, কবি যে বাস্তবিক পলায়নী মেজাজের ন'ন এই কথাটা সরবে ঘোষণা ছাড়া তাদের অন্য কোনো সার্থকতাই নেই। 'শেয়াল-সঙ্কুল নির্জন গ্রাম'—কবি যে নিতান্তই 'আধুনিক' এই কথাটা ঊর্ধ্বমুখে তারস্বরে ঘোষণা করা ছাড়া শেয়ালদের অন্য কোনো কাজ আছে কি ? আর 'গরুর মতো করুণ চোখ' এই বিশেষণটার পরিবর্তে 'ম্লান' বা অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার করলে কাব্যের সৌন্দর্য হয় তো বাড়তোই, কিন্তু তাতে কি 'আধুনিকতা' কমবার ভয় ছিলো ? এই কবিরই আর দুটী কবিতা উদ্ধৃত করছি—

ইন্দ্রের ভ্রূকুটিকুটিল গম্ভীর আকাশে
বৈশাখের মৈনাক মেঘ নিঃশব্দে আসে ;
সিনেমার সামনে রুদ্ধশ্বাস ঊর্দ্ধমুখ মানুষের ভিড়,
বিচলিত বিদ্যুৎ সুগভীর ঘৃণা মুখের উপরে হানে।

যে আধুনিক কবি এরকম কবিতা লেখার পরও লেখেন,

রাস্তায় হাসির গর্‌রায় ঘোরে তুখোর ইয়ারের দল
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল

তাঁর দুর্বলতা বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। ছন্নছাড়ার দল একালের কাব্যে স্থায়ী আসন জমিয়েছে, কিন্তু তাদের আসাটা কাব্যের প্রয়োজনে হওয়া চাই। কিন্তু যখন এরা এখানে কবিতার 'আধুনিকত্ব' জাহির করা ছাড়া অন্য কোনো কাজেই লাগে না তখন সজোরে আপত্তি জানাতেই হয়। কিন্তু একালের যাঁরা সার্থক কবি তাঁদেরও এ অপ্রত্যয় কেন ? তাঁদের মনেও দোটানা আছে, তাই সেটীকে ঢাকবার জন্য এই প্রয়াস, এ ধরণের কবিতা পড়লে এই সন্দেহ ক্রমশঃই দৃঢ় হতে থাকে। এঁরা যে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই অন্তর্গত, ভবিষ্যতের গান গাইলেও এঁদের বাঁধন অতীতেরই সঙ্গে, সে কথা এই পদস্খলন, এই দ্বিধা ও এই অপ্রত্যয় হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সকল কবির দোষ-প্রকরণ এত সহজলক্ষ্য নয়। অনেকের মধ্যেই এই দ্বিধা-বিভক্ত দিগ্‌নির্দেশহীন কাল আপন ছায়া ফেলেছে, কিন্তু সবসময় পদস্খলন এত স্পষ্ট নয়, আরো নিগূঢ় অবস্থায় বর্তমান। যেমন—

এখনো আমার মনে হয় তুমি আসবে,
এখনো।
যদিও আমি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছি অকৃপণ অপরিমিত ফোয়ারার
জলের অঞ্জলির মতো ;
... ...
একদিন তুমি আসবে আমার ঘরের দরজা খুলে,
আর ফিরে যাবে না।
তোমার চোখের সূর্য-উৎস থেকে ব'য়ে যাবে উত্তাপের স্রোত,
তোমার বক্ষ উত্থিত হবে আমার দিকে
সময়-সমুদ্রের দুই প্রবল তরঙ্গের মতো ;

—বুদ্ধদেব বসু : নতুন পাতা

কবি ভাবের ঘরে চুরি করেছেন এবং পাঠকদের ফাঁকি দিচ্ছেন, তাঁর গদ্যকবিতা নেহাৎ মেকি এবং উত্তেজনা যে নিতান্ত কৃত্রিম নানা দিক্ থেকে এ কথাটা বোঝা যায়। উপমাগুলির স্ববিরোধিতাও এর অন্যতম প্রমাণ। ফোয়ারার সঙ্গে, জলপ্রপাতের সঙ্গে নয়, অকৃপণ অপরিমিতির কোনো স্বাভাবিক সংযোগ আছে কি? বরং ফোয়ারা সবসময়েই একটা কৃত্রিম সাজানো বাগান এবং নগর-সভ্যতার কথাই মনে আনে, যেখানে জলের পরিমাণ করপোরেশন-নিয়ন্ত্রিত। বক্ষের সঙ্গে তরঙ্গের কি সাদৃশ্য আছে? উপমাটা ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলেছে, না খর্ব করেছে? বক্ষের ওরকম উত্থান-পতন কল্পনা করা কষ্ট-কল্পনা নিশ্চয়ই আর দরজা খুলে এরকম তরঙ্গ ঢোকা নিতান্তই উদ্ভট কল্পনা। 'তুমি আসবে দরজা খুলে'—এ কথা দিয়ে যে চিত্রের শুরু তার মধ্যে ঐ উপমাগুলি বেসুরো, জোর করে চাপানো। ওরকম দরজাভাঙা বন্যা মেদিনীপুরের বন্যা হতে পারে কিন্তু কাব্যের বন্যা নয়। এরকম

অ-সজীব শব্দচয়ন এবং স্খলিত কল্পনা তখনই সম্ভব যখন কবির প্রাণধর্ম কম, কাব্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি, মেকির প্রাদুর্ভাব বেশী।

কিন্তু শুধু এই ধরণের পদস্খলন হতেই যে এ যুগের কাব্যের চালটা বোঝা যায় তাই নয়, আরো একটী বিষয় লক্ষ্য করার আছে। পূর্বে যে কবিতাংশগুলি উদ্ধৃত করেছি সেগুলি প্রায়ই কবিদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হতে সংগৃহীত। 'গ্রহণ' সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'নতুন পাতা' বুদ্ধদেব বসুর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এটী নিতান্ত আকস্মিক নয়। বিষ্ণু দে'র কাব্য আলোচনার সময় দেখা গেলো তাঁর মন ক্রমশঃ এগিয়েছে, তাই 'চোরাবালি' 'পূর্বলেখ' 'বাইশে জুন' যে নিজেরাই সার্থক তাই নয়, একটা সার্থক ক্রমপরিণতিরও সাক্ষী। কিন্তু এঁদের মধ্যে এ ধরণের ক্রম-পরিণতিশীল মন বেশী নয়, বরং প্রতিভার স্বল্পায়ু পীড়াদায়ক। 'বন্দীর বন্দনা' ও 'নতুন পাতার' মধ্যের যুগে বুদ্ধদেব বসু এরকম কবিতাও লিখেছিলেন,—

আজিকে উৎসব রাতি আজিকে উৎসব-রাতি
আজিকে উৎসব রাতি হায় রে,
তোমার শয়ন-'পরি সোনার প্রদীপ করি'
দগ্ধ করো মোরে নিরালায়:রে।

—পৃথিবীর পথে, ৮ পৃষ্ঠা

মুখে মুখ রাখিই যদি, এমন আর দোষ কী, বলো ?
মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে।
দুটি ঠোঁট—ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক রঙিন হ'লো
ঠোক্‌রাই পাখির মতো খুটখুট চার কিনারে।

—কঙ্কাবতী, ৫৬ পৃষ্ঠা

অবশ্য এ বইগুলির প্রত্যেক কবিতাই এ দরের নয়। কিন্তু তবুও তরুণ কবিদের মধ্যে দ্রুত কবিধর্মবিলোপের চিহ্ন সহজেই মেলে। তার সঙ্গে দেখা দেয় প্রচুর দুর্বল কবিতা, অক্ষম কবিতা। আর দেখা দেয় সুররিয়লিস্ট কবিতা অর্থাৎ অবক্ষয়ের চরম অবস্থার কবিতা,

যার মধ্যে কবি সজ্ঞানে সমাজের দিক্ হতে মুখ ফেরান, কবিতা খাপছাড়া দুর্বোধ্যতার চমৎকার নিদর্শন হয়ে ওঠে। বাংলা কাব্যে সব লক্ষণ ক'টাই আপাততঃ দেখা যাচ্ছে। দুর্বল কবিতার কথা নাই বললুম, কিন্তু স্যুররিয়লিস্ট কবিরও সন্ধান নাকি মিলেছে। জীবনানন্দ দাশ সাম্প্রতিক বাংলার স্যুররিয়লিস্ট কবি এরকম মত আধুনিক সমালোচনার পাতায় দেখেছি। তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই, কেন না যে সামাজিক হাওয়া বাংলা কাব্যকে এই রূপ দিয়েছে তাতে অন্ততঃ এক-আধজন স্যুররিয়ালিস্ট কবি না থাকলে হয়তো চিত্র সম্পূর্ণ হতো না! সুতরাং এগুলিও বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার ফল সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। হুমায়ুন কবিরের কথায় এ অবস্থাটার বর্ণনা দেওয়া যায়: "উনিশ শতকে বুদ্ধির স্বাধীনতা এনেছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক গীতিকাব্যের প্রবাহ, বিংশ শতকে বুদ্ধির স্বেচ্ছাচার এনেছে বর্তমানের বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্বের অসংলগ্ন অনুভূতি ও চ্যুতকেন্দ্র সংজ্ঞাধারার কাব্য। ··· বাঙালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণের ইতিহাস তাই অবশেষে ব্যর্থতার ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল।··· বাঙ্লার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যসাধনার দ্রুত অভ্যুদয়, বিস্ময়কর পরিণতি এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা বোধ হয় সমাজ সংগঠনের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। ··· রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় সাহায্যের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোসলেম মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুদয় স্বাভাবিক। অভ্যুদয়ের এই পরিস্থিতিতে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী-মানসে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকও তাই সহজে বোঝা যায়। কিন্তু তার ফলে এই নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী তার আবির্ভাবের মুহূর্ত্তেই একান্তভাবে নেতিধর্মী হয়ে পড়ল। অভ্যুদয়ের মুহূর্ত্তেই নেতিবাদী হয়ে পড়ায় বাঙলার কাব্যধারায় মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী আজো কোন গভীর প্রভাব ফেলতে পারে নি। ··· আরো একটা কারণে বাঙলা দেশে মুসলমান মধ্যবিত্তের সাহিত্যসাধনা এখনো নিষ্ফলা। বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের যেদিন

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব, সেদিন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। ভাঙা হাটে এই নতুন আগন্তুক তাই পশার জমাতে পারেনি, এবং মনে হয় যে যতদিন সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনে নতুন শ্রেণীমানসের আবির্ভাব না ঘটবে, ততদিন বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার প্রতিশ্রুতি এবং সার্থকতাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ··· বর্তমানেও মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই প্রবলভাবে চলেছে। স্রোতের বিরুদ্ধে পুরাতন বন্দরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, অথচ সেই অসম্ভব প্রয়াসেই সমাজ মানসের প্রায় সমস্ত উদ্যম নিঃশেষিত হচ্ছে। ভবিষ্যতের অভিযানে আশঙ্কা থাকতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনা আরো বেশী, অথচ আজো বাঙালী মুসলমানের যৌবন সে দুঃসাহসিকতায় বিমুখ। ··· নতুনের আকর্ষণ বরঞ্চ তরুণ হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে মেলে। হিন্দু সমাজের অন্ধ প্রাচীনপন্থীও আজ সজাগ যে বাঁচবার জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন। গত দশ বৎসরের মধ্যে যত নূতন হিন্দু সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, সকলেই তাই সজাগ-বিপ্লবী, কারণ একদিক থেকে দেখলে প্রতিবিপ্লব ও তো বিপ্লবের সামিল। কবিতার ভাষা ও ভঙ্গী, উপাদান, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টি—সব নিয়েই তাই পরীক্ষা চলছে, কিন্তু যে বালির চরে এ ঘর বাঁধবার চেষ্টা, তার ভিত্তিমূল নড়ে উঠেছে বলে নূতন ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাও আজ এত কঠিন।”

যে নতুন প্রলয়ংকর বন্যা বর্তমানে বইছে তাতে বালির চরে পলি পড়লো কি না, এই কঠিন আঘাতে সাহিত্যের প্রকৃত নবজন্মের কোনো আশা আছে কি না সে কথার আলোচনা পরে। আপাততঃ সেই নবজন্মের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রার্থনা করা যেতে পারে—

> দহন-শয়নে তপ্ত ধরণী
> পড়েছিল পিপাসার্ত্তা,
> পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের
> অমৃতবারির বার্ত্তা।

মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ,
নব অঙ্কুর জয়পতাকায়
ধরাতল সমাকীর্ণ,
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর।

ছবি ও গান ; নাটক, গল্প, উপন্যাস ; ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য।

বাংলা কাব্যে বাঙালীর মানসপরিবর্তনের যে পরিচয় মেলে সেটা যে শুধু কাব্যেরই একচেটে নয়, আরো ব্যাপক, বাস্তবিকপক্ষে সেটা যে সর্বাবয়ব পরিবর্তনেরই ফল, তার প্রমাণ এই যে, অন্যান্য আঙ্গিকেও ব্যাপক এবং মৌলিক পরিবর্তনের আভাস মিলছে। ওগুলির আলোচনা হতে আসল পরিবর্তনটার স্বরূপ বোঝার সহায়তা হয়। কাব্যের বিবর্তনের পাশাপাশি অন্যান্য আঙ্গিকগুলির পরিবর্তনের আলোচনা হতে আরো বোঝা যায় একই মানসিক ভঙ্গী আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কি নতুন চেহারা ধারণ করে। পশ্চিমী মনের আলোচনায় দেখা যায়, যে মানসিক ভঙ্গী ছবিতে হয়তো নানা রং এর অকৃপণ সমাবেশের পক্ষপাতী, ভাস্কর্যে সে মানসিক ভঙ্গী ঠিক বিপরীতভাবে আত্মকাশ করে, কেন না পাথরের একটা স্বকীয় চেহারা আছে। আবার দেওয়াল-চিত্র এবং অন্যান্য চিত্রের ভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। রঙের কায়দায় পটভূমিকে এগিয়ে আনা বা পিছিয়ে দেওয়া স্তর-ভাঙ্গা ছবির অন্যতম কৌশল ; এই কৌশল হতে কিউবিস্ট চিত্রকলা এবং অন্যান্য ভঙ্গীর চিত্রকলার উদ্ভব। কিন্তু দেওয়াল-চিত্রে এ কৌশল অন্যভাবে ব্যবহৃত, কারণ দেওয়াল-চিত্রের সব চেয়ে বড়ো কথা massiveness এবং flatness.

বাঙালীর মন শব্দোপাত্ত আঙ্গিকে যতোদূর অগ্রসর, ছবি ছাড়া, অন্য চক্ষুগ্রাহ্য আঙ্গিকে সম্ভবতঃ অতদূর নয়। আবার শব্দোপাত্ত আঙ্গিকের মধ্যে গান ও কবিতায় যতোদূর অগ্রসর, ছবি ছাড়া, অন্য কিছুতেই ততোদূর অগ্রসর হওয়ার চিহ্ন বোধ হয় মেলে না। এগুলির

কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ আছে। এমন কি, ছবিতে এই বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলও আমাদের সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।

বলা বাহুল্য, এগুলির ধারাবাহিক বিবরণের সাহায্যে একটা বিশ্বকোষ রচনা করা একেবারেই আমার উদ্দেশ্য নয়, তার প্রয়োজনও সম্ভবতঃ নেই। পরিবর্তনের প্রধান ভঙ্গীগুলিই আলোচ্য। এ ধরণের আলোচনায় উল্লিখিত রূপায়নগুলির প্রতি অবিচারের ভয় আছে, কিন্তু এইটা সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা বলে বিভ্রান্ত না হলে সে ভয়ের কারণ নেই।

কবিতার সঙ্গে গানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মানবসভ্যতার আদি যুগে অনুসন্ধান করলে জানা যায় দলবদ্ধ সঙ্গীত হতেই কবিতার উৎপত্তি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত নির্যাস হিসেবে কবিতা-রচনা এবং কবিতা-পাঠ শ্রেণীবিভেদেরই ফল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গানে রূপান্তরিত হতে দেরী হয় না। বরং রবীন্দ্রনাথের গানগুলির উৎকর্ষের জন্য কথা বা সুর কোনটার দায়িত্ব কতখানি সে বিষয়ে নিঃসংশয় নির্দ্ধারণ প্রায় অসম্ভব। বরং রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর কবিতার আর একটা দিকের সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণতঃ দীর্ঘ, অন্ততঃ তাদের মেজাজ দীর্ঘ হওয়ার দিকে। কিন্তু গানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ক্ষুদ্রতর পরিধিতেও অত্যন্ত সার্থকভাবেই প্রকাশিত।

গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ না হলেও সে সম্বন্ধে অশিক্ষিত-পটুত্ব দাবী করার অধিকার অনেকেরই আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত বৈশিষ্ট্য না বুঝলেও সামাজিক দিক্ থেকে এই কথাটা সহজেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের সঙ্গীত-ইতিহাসে একটা নতুন পর্ব। ওস্তাদী গান সম্বন্ধে একটা কথা এই যে, তার মধ্যে সুরের প্রাধান্য যত বেশি কথার প্রাধান্য তত নয়। প্রতীকধর্মিতার উপর ঝোঁক এত বেশি যে কথাটা উপলক্ষ্যমাত্র, সুরটাই আসল কথা। ধ্রুপদ গানের আলাপ কতকগুলি অর্থহীন

কথার উপর ভর করে চলে, আর কথাটাকে অস্বীকার করবার ঝোঁক প্রবল, তার আরও প্রমাণ মেলে চতুরঙ্গ বা তিলানার উপস্থিতিতে। শব্দের কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ আছে, এক একটা কথা এক একটা মানস-চিত্রের প্রতীক। সেগুলির বন্ধন হতে মুক্তি দিয়ে নিছক সুরের কারবার এই গানে। কিন্তু তবু এ চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল নয়, কোনো কোনো বিখ্যাত গান কবিতা হিসেবে-ও বড়ো, নওলকিশোরের ধ্রুপদ এবং অন্যান্য গান তার প্রমাণ। আর, কথার প্রভাব সুরের পক্ষে যে ক্ষতিকর এমন সার্বজনীন সত্যও স্বীকার করা চলে না। একই সুরের নানা গান আছে, কিন্তু এক একটী গানে এক একটা সুরের বৈশিষ্ট্য যেমন খোলে অন্য গানগুলিতে তেমন খোলে না এ কথা তানসেন রচিত দরবারী-কানাড়ার 'চঢ়ো চিরঞ্জীব' প্রভৃতি গান শুনলেই বোঝা যায়। এক একটী সুরের এক একটা চাল আছে। কথা সেই চালকে বিকৃত করতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে সার্থকতরও করতে পারে, একথাও অস্বীকার করা চলে না।

ওস্তাদী গানে এই 'বিশুদ্ধিতা'র ঝোঁক শুধু সুরের প্রতি পক্ষপাতেই নিঃশেষ নয়। গান গাওয়ার সময় ওস্তাদেরা অনেকেই (দু-চারজন ওস্তাদ ছাড়া প্রায় সকলেই এই দলে) ছাত্রসহ গাইতে বসেন এবং কিছুক্ষণ পর পর বিস্তার বা তান ছাড়া ফাঁক পোরানোর ভার ছাত্রদের উপর পড়ে। কিন্তু গানে শব্দ অর্থ আর সুরের ভঙ্গী ছাড়াও আরো একটা জিনিস আছে, সেটা কণ্ঠ ; যেমন নাচের বেলায় সাবলীল দেহ। ওস্তাদী নাচের বেলায় কুরূপেরাও নাচতে সংকোচ বোধ করেন না, কেন না সেখানে নাচের কৌশলটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। পায়ের কাজে তেহাই, বোল প্রভৃতির কারুকার্যই চরম লক্ষ্য, একটী অখণ্ড রসসৃষ্টি সেখানে উদ্দেশ্য নয়। দেখা যায়, বর্তমান নাচ প্রতিক্রিয়ার ফলে উলটো দিকে বেশী ঝুঁকেছে ; ফলে অক্ষম ভাবালুতার এতো প্রাচুর্য যে আমাদের একটু কঠিনতর ঐতিহ্যের দিকে আবার মুখ ফেরাতে ইচ্ছা করে, মনে হয় এই নরম পিচ্ছিলতার

মধ্যে বোল তালের বাঁধন থাকলে তার মধ্যে হাড়কঙ্কাল থাকতো, তাতে শিরদাঁড়া সম্ভব হতো, লাভ-বই ক্ষতি ছিলো না। এ বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ' ছাড়া সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার এখনও হয় নি, অবশ্য রুচিবোধও এখানে বহুবিস্তৃত নয়। তবু সাহস থাকলে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে নাট্যের এক বিস্ময়কর সম্ভাবনা এবং অনাস্বাদিতপূর্ব রস থাকলেও মনে হয় তাতে নৃত্যশিল্পীরাই কবির অনুযায়ী, ওরচনা হতে বিযুক্তভাবে ওনাচ সফল হতো কি-না সন্দেহ। উদয়শঙ্করের নৃত্যশিল্পে নানা ধারার সংমিশ্রণ আছে, কারুকার্যও আছে—অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ভারতীয় নাচের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আছে, কিন্তু অতি-সংক্ষিপ্তি এবং অসমান কারুকার্যে একটা অখণ্ড রসবোধ সম্ভবতঃ ব্যাহত। ভাবতে বিস্ময় লাগে, যাঁর ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আছে তিনি প্রতীকধর্মিতার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেও কি করে ময়ূর বোঝাতে ময়ূরের পাখায় নিজেকে আবৃত করতে পারেন? যাঁরা নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র সর্বশেষ অভিনয় দেখেছেন তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে চণ্ডালিকার ফুল তোলায় ফুল তোলার মুদ্রাই ছিলো, ফুল ছিলো না। এক একটা রাগের এক একটি সুস্পষ্ট রূপকল্পনা ভারতীয় সংগীতের অনবচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাল, লয়, এবং অন্যান্য কারুকার্য সেই রূপটাকেই ফুটিয়ে তোলার সহায়তা করে। এই প্রতীকধর্মিতার সঙ্গে পাশ্চাত্য রিয়লিজম্, যে রিয়লিজম্ ছাড়া ময়ূরপাখার সজ্জার অন্য কোনও কৈফিয়ৎ নেই,—ও দুটো মেশে না, কেন না, ও দুটো এক জাতের জিনিস নয়। অথচ মজার কথা, পাশ্চাত্য নাচ রিয়লিজমের বাঁধন কাটিয়ে এক্স্প্রেসনিস্ট পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হতে চলেছে। আসলে এই বর্ণসংকরতা আমাদের জারজ সভ্যতার নিদর্শন। আমরা ভারতীয় অথচ মনে প্রাণে ভারতীয় নই, আমরা পশ্চিমী সভ্যতার ঔপনিবেশিক অথচ বংশানুক্রমিক বাসিন্দা নই—এই দ্বিধা সংঘাতের সচেতন বা অচেতন ফলই উপরোক্ত বর্ণসাংকর্যে প্রকাশিত। শুধু উদয়শঙ্কর ন'ন, এরকম যুগপ্রমাদ হতে

রবীন্দ্রনাথও যে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি, 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তরবারি-হস্তে ঘাতকের অত্যন্ত 'রিয়লিস্‌টিক' নাচ সে কথা প্রমাণিত করে। এইখানে আরো একটা রহস্যের সন্ধান মেলে। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ রকম ভুল অসম্ভব হলেও নৃত্যনাট্যে এ ভুল ঘটলো, তার কারণ কি এই যে, এই নৃত্যনাট্যটা পঠিতব্য ছিলো না, প্রযোজিতব্য ছিলো—যেখানে দর্শকেরাও এই জারজ সভ্যতার অন্তর্গত ? যাঁরা বালা সরস্বতীর নাচ দেখেছেন তাঁরা এই আপাত্তর স্বরূপ বুঝবেন। ইদানীং আমরা 'রাগপ্রধান' 'কাব্যপ্রধান' প্রভৃতি যে সব কথার সন্ধান পেয়েছি সরস্বতীর নাচের ত্রিসীমানাতেও তার সন্ধান নেই, অর্থাৎ ভাবপ্রবণতার প্রতি সস্তা আবেদন নেই—তাতে নিয়মের বাঁধন আছে, সাঙ্গীতিক পটভূমিও প্রচলিত অর্থে 'আধুনিক' নয়। কিন্তু ওগুলি সরস্বতীর নাচে ততোটুকুই বাঁধন, শরীরের পক্ষে মাংস-হাড়-পেশীর বাঁধন যতোটুকু বাঁধন। কবিতায় যে সংকট কিছুকাল পূর্বে দেখা দিয়েছিলো নাচে সে সংকট আসন্ন বলে মনে হয়। ছন্দ যখন বাঁধন হয়ে শ্বাসরোধ করতে চায় তখনই ভাঙা-ছন্দের কাব্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। বিদ্রোহের জোরটা অস্বাভাবিক বেশী। কিন্তু ছন্দ বা ছন্দ-হীনতা উভয়ই কাব্যের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত, এ কথাটা না বুঝলে বা কোনো যুগান্তকারী প্রতিভা স্বীয় রচনায় এ কথাটা না বোঝালে আমরা ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ অবস্থায় থাকি, কেউ প্রাচীন কৌশলের skill-fetishism-কেই কলাকৌশল বলে উল্লসিত হন, কেউ বা নিয়ম-ভাঙার সস্তা বাহাদুরিকেই প্রকৃত বিদ্রোহ এবং নবযুগের কাব্যকলা ভেবে নৈরাজ্যসৃষ্টির সহায়তা করেন। প্রাচীন পদ্ধতির নাচে অন্তঃপ্রেরণা ক্ষীণ হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা অপর দিকটাতে অনাবশ্যক ঝোঁকই দেখছি—একটা প্রকৃত নতুন ঐতিহ্য রচনা করার মতো প্রতিভা নাচের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ আজও অনাগত।

ওস্তাদেরা ছাত্রদের উপর গানের আংশিক ভার দিতেন তাতে ঐ সংকটেরই আভাস মেলে। গান একটা অখণ্ড রসসৃষ্টির ব্যাপার এবং

তার মধ্যে কণ্ঠ একটা অপরিহার্য উপকরণ, skill-fetishism-এর যুগে সে কথা বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য ওস্তাদী গানের সামাজিক পরিবেশ আলোচনা করলে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। মোগল যুগেও এর প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয় নি, সে যুগের নানা উদ্ভাবন হতে সে কথা বোঝা যায়। মল্লারের উপর মিয়াকী মল্লার রচনার স্বাধীনতা তখনও বিলুপ্ত হয় নি, আর বাঙালী গুর্জরী প্রভৃতি রাগ নানা প্রাদেশিক ভঙ্গীর দরবারী মর্যাদা লাভের প্রমাণ। আসলে তখন গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শুধু মোগল সম্রাট্ নয়, নানা লোক-সঙ্গীত সময়ে সময়ে তাঁদের হাতে দরবারী মর্যাদা লাভ করতো মাত্র। আজকাল যে পদ্ধতি মার্গ-সঙ্গীত নামে পরিচিত সে পদ্ধতির নানা রূপ,—যথা ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি,—অনাদিকাল হতে আসে নি, তার সঙ্গেও সমাজবিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলো। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে এই দরবারী সঙ্গীতের চেয়ে লোক-সঙ্গীতের ঐতিহ্যই বেশী সত্য ছিলো এ কথা মানতেই হয়। ওয়াজিদ আলি সা'র মেটেবুরুজে আসা, এবং বাংলায় একটা নবীন শ্রেণীর উত্থান,—বাংলায় ওস্তাদী গানের প্রচলনের সঙ্গে এগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশে ওস্তাদী গানের বহুল প্রচলন ইংরেজ-রাজত্বের প্রায় সমসাময়িক। নব-গঠিত জমিদার-শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় ওস্তাদী গানের আরম্ভ। স্থানীয় সংস্কৃতির অন্তরের তাগিদে এ গান সম্ভবতঃ আসে নি, নানা হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া সখের মধ্যে এটীও অন্যতম। সেইজন্য তার উদ্ভাবনের দুঃসাহস ছিলো না, 'বিশুদ্ধি' বজায় রাখতে, ছোঁয়াচ কাটাতেই সে ব্যস্ত। এমন কি ধ্রুপদেও যে বিভিন্ন বাণীর প্রচলন ছিলো তারও বিশেষ পরিচয় এদেশে আসে নি, অবশ্য সেটার সম্পূর্ণ কারণ বাংলাতেই নিহিত ছিলো না। বাংলার লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে এর ভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। মনোহর-সাহী কীর্তন ধ্রুপদের আত্মীয় এ কথা বলতে অতি বড়ো ওস্তাদেরও আটকানো উচিত নয়, কিন্তু জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে মিল যতোখানি কীর্তনের সঙ্গে ধ্রুপদের মিলও ততোটাই। ওস্তাদী গানে বিস্তার, তান, তোড়া শ্রোতার

রসোদ্বোধ করতে চায় সুরের প্রতীকধর্মিতার মধ্য দিয়ে। কীর্তনে ওগুলি অনেক আছে কিন্তু ওভাবে নেই, কেন না, তার মধ্যে নিছক সুরে সে অবিচল বিশ্বাস নেই। কথার সঙ্গে সুরকে জড়িয়ে দেওয়া হলো, কাজেই সুরের শম কবিতার লয়েরও শম, আর যে কেন্দ্র থেকে গান বারে বারে আবর্তিত হচ্ছে সে কেন্দ্রটা কথাগত এবং সুরগত উভয়ই। যাঁরা আধুনিক সঙ্গীতের ইতিহাস লিখতে সক্ষম তাঁরা কেউ কথা ও সুরের এই প্রথম বৈপ্লবিক সংমিশ্রণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করলে তা একালেও কাজে লাগতে পারে মনে হয়। কীর্তন এবং বাউল গানের অন্যতম সম্পদ তার সহজ ভাষা এবং সে ভাষা জনসাধারণেরই ভাষা, বিদগ্ধের ভাষা নয়।

শ্রেণীবিবর্তনের ফলে কিভাবে গানের চেহারা বদলালো তার ইতিহাস কাব্যের অনুরূপ ইতিহাসের চেয়ে কম বিচিত্র নয়। তিন দিক্ দিয়ে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, কথা। দ্বিতীয়, সুরের ভঙ্গী। তৃতীয়, ওদুটার সমন্বয়ে সঙ্গীতের স্বরূপ ও আবেদনের ভঙ্গী। ওস্তাদী গানে কথার দাম কোনোকালেই শূন্যের কোঠায় পৌঁছয়নি, অন্ততঃ নানা অস্বীকৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি। সেইজন্য যখন এই ওস্তাদী সঙ্গীত কেবল বৈঠকী কারবার হওয়ার ফলে তার রসিক সংখ্যা কমতির দিকে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত হিন্দী গানগুলিতে বাংলা পদ বসাতে শুরু করলেন,—সেইটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম পর্ব। সেখানে অবশ্য কথাকারের স্বাধীনতা নেই, অক্ষর মেপে অক্ষর বসানোতেই তাঁর কারুকার্য নিঃশেষিত। বর্তমানে ওস্তাদেরা হিন্দী-গানের শেষে এইরকম এক একটি গান গাইতে আর লজ্জাবোধ করেন না, অন্ততঃ বাংলাদেশে নয়,—যে শ্রোতারা মার্গসঙ্গীত ছাড়া অন্য গানের শুচিবায়ুগ্রস্ত তাঁরাও এগুলিকে 'মন্দ নয়' গোছের অভ্যর্থনা জানাতে আর দ্বিধাগ্রস্ত নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতে ক্ষান্ত হননি, সেইজন্য তাঁর গানের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেলো তিনি চমৎকার কথায় নানা ধরণের সুর বসাচ্ছেন। আরম্ভটা বিপরীত,

কথা হতে শুরু—সেইজন্যে সুরের নিছক 'বিশুদ্ধি'ও বজায় নেই। বলা বাহুল্য, এ দুটিই নতুন ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়, পুরোনো ঐতিহ্যকেই ভাঙাচোরা নাড়াচাড়া করা। সুতরাং তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কথা ও সুরে নতুন ঐতিহ্য রচনার চেষ্টা করলেন যার মধ্যে দুটিই পরস্পরের পরিপূরক, কোনোটাই অচল খুঁটি হিসেবে স্থির নেই। এইখানে একটি সমস্যা দেখা দিলো। শ্রীযুত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় সমস্যাটি এই : "স্বর-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে অর্থ-সঙ্গীতের চাল কি প্রকার হয়েছে স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে যে রবিবাবুর গানের চাল অত্যন্ত মধুর। স্বর-সঙ্গীতের style নির্ভর করে গায়কের ওপর, উচ্চারণের ওপর, তালের ওপর, ধরবার ও ছাড়বার ওপর। রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সাধারণের আর এক ভীষণ আপত্তি এই যে, তাঁর সঙ্গীতে তাল নেই। তালে গাওয়া হয়, আর ছন্দে গান রচিত হয়। অতএব সঙ্গীতে তাল নেই বলা মূর্খতা। ... আমার আর একটি বক্তব্য আছে—ধরুন, তাঁর সঙ্গীতে, দিনুবাবুর গলাতেও তাল ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে সুরের তাল একরকম, কবিতার ছন্দ অন্য প্রকার। সুরকে যে কোন তালেই গাওয়া যায়,[১] তার নিজস্ব কোন তাল নেই, কিন্তু সঙ্গীত তার কথার ভাব অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তাল অপেক্ষা লয়ই বেশী প্রয়োজনীয়। তাও ধ্রুপদে আভোগীর লয় অন্তরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে ত হয়ই। রবিবাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেন না তাঁর সঙ্গীত কবিতা হিসেবেও খুব বড়।" এর মধ্যে সম্প্রতি আলোচ্য একটি কথা : সুরের তাল একরকম, কবিতার ছন্দ অন্য প্রকার। কথাটাকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়া দরকার। সমস্যাটা আরও গভীরে দাঁড়ায় এই : সুরের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে,

১। এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। Theoretically গাওয়া হয়তো যায়, কিন্তু দরবারী কানাড়ার কহরবা এবং পিলুর রুদ্রতাল ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

কবিতারও একটী নিজস্ব ধর্ম আছে, সে হিসেবে দুয়ের রসোদ্রেকের পদ্ধতিও অন্য। কথার কতকগুলি সামাজিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি আছে, সেগুলির কৌশলী ব্যবহার তার রসসৃষ্টির প্রধানতম অঙ্গ। কিন্তু সুরে তা নেই। অবশ্য ওস্তাদী গানের অবনতির যুগেই কোন্ সুর কোন্ ঋতুতে এবং দিনে না রাত্রে গাইতে হবে সে সম্বন্ধে নানারকম শাস্ত্র বাঁধার চেষ্টা হয়েছিলো এবং যাঁরা সে সংস্কারে দৃঢ় বিশ্বাসী তাঁদের মনে হয়তো দরবারী কানাড়া রাত্রিরই সংস্কার জাগায়। কিন্তু এ সংস্কার কথার সংস্কারের মতো ওরকম সুদূরপ্রসারী এবং স্বাভাবিক নয়। সাদা বোঝাতে কালো কথাটার ব্যবহার সম্ভবতঃ অচল, কিন্তু সকাল বেলাতেও দরবারী কানাড়ার মতো বিরাট গভীর রাগ খানিকটা ভালো লাগে একথা স্বীকার করতে অতি-অল্প সংখ্যক দু-একজন ছাড়া কেউ-ই ইতস্ততঃ করবেন না। সেইজন্য 'অর্থ-সঙ্গীতে'র প্রকৃত সমস্যা সেইখানেই যেখানে সুরের ধর্মের সঙ্গে কবিতার ধর্মের বিরোধ বাধে। শ্রীযুত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তাতে কবিতার মর্যাদা বাড়ে কিন্তু গানের মর্যাদা কমে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত কবিতা হিসেবেও খুব বড়ো—একথাটা ব্যাজস্তুতির মতো। আমার বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের গান যখন কবিতা হিসেবে পড়ি তখন কবিতা হিসেবে তার উৎকর্ষে বিস্মিত হই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতা হতে এদের স্বাদ একটু পৃথকই। কিন্তু সেটা কবিতার কথা, গানের কথা নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে কবিতার ধর্ম এবং সুরের ধর্মের সুষ্ঠু এবং অভূতপূর্ব সমন্বয় হয়েছে। এই মিশ্রণের পদ্ধতি কি সে বিষয় দীক্ষিতদের আলোচ্য, কিন্তু এ দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবেই ঘটেছে সেকথা যে কোনো সহৃদয় শ্রোতার কানেই ধরা পড়বে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত কবিতা বা সুর হিসেবেই নয়, গান হিসেবেই বড়ো। আরো লক্ষ্য করা যায়, এই গানে সুর নতুন ভঙ্গীর—বাঁধন ভাঙার সাহস তাতে আছে। তৃতীয়তঃ এ গানে কথা

অবাস্তর নয়-ই, বরং স্থরের মতো সেও এ গানের একটী অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে আরও দুই একটী কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের স্থর কথার সঙ্গে চলে, কে কার অলংকার তা বলা কঠিন, তার অন্যতম কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতে স্থর বাউল প্রভৃতি নানা লোকসঙ্গীত হতে আহরিত— যে লোকসঙ্গীতে ভাষার সঙ্গে স্থরের সন্ধি চিরন্তন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জন্মের সময়ের সামাজিক ইতিহাসটী স্মরণ করা দরকার। জমিদারদের পতন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, ভালো ওস্তাদ বহন করার সামর্থ্য কমতির দিকে। জনসাধারণেরও মার্গসঙ্গীত শুনবার ও আলোচনা করার স্থযোগ কম। এই সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনে যে নতুন আবহাওয়া এলো তার ফলে স্বদেশীযুগে পথে পথে গাইবার এবং বড়ো জনসভায় গাইবার গানের প্রয়োজন হলো, অন্যদিকে তেমনি রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের জাঁকালো স্থরের আবির্ভাব হলো। ফলে ক্ষীয়মান বৈঠকে-ই মার্গসঙ্গীতের নির্বাসন ঘটলো। জাতির মনে যে চঞ্চলতা জেগেছিলো সেকালের গানে তার কিছুটা এখনও অনুভব করি। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার ফলেই ধ্রুপদী সঙ্গীতে সংস্কারের চেষ্টা এসেছিলো, নানাযুগের নানা ব্যর্থ বাঁধনের হাত হতে মুক্তি দিয়ে ধ্রুপদের আসল চেহারাটা ফুটিয়ে তোলাই ভাতখণ্ডেজীর উদ্দেশ্য ছিলো। গানের দিক্ হতে এর সার্থকতা যতোই হোক্ এর সামাজিক পরিবেশটীও উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একই হাওয়ায় অন্য ভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ হলেন, অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের দিকেই তাঁর গতি। সেইজন্য প্রাচীনের পুনরাবিষ্কারের চেয়ে নতুন নতুন সৃষ্টিতেই তাঁর উৎসাহ বেশী। অবশ্য সে নতুন সৃষ্টির মধ্যেও প্রাচীন থেকে উপাদান সংগৃহীত হয় নি তা নয়, কিন্তু তার ঝোঁকটা অন্যদিকে। স্থর সেইজন্যে তাঁর হাতে লোকসঙ্গীত হতে শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। আর সঙ্গীতে যখনই এরকম সংকট দেখা গেছে তখনই দেখা গেছে শুধু লোকসঙ্গীতের সঙ্গে বৈঠকী সঙ্গীতের সংমিশ্রণেই সে সংকট ত্রাণ হয় নি, কথার সাহায্য গ্রহণও অনিবার্য। ক্ষীয়মান বৈঠক

হতে বৃহত্তর (হয়তো পূর্বের দলের ধারণায় এঁরা 'সমঝদার' ন'ন এবং এই 'অবনতি'র ফলে সঙ্গীতের 'অপমান', এরকম একটা ধারণাও গড়ে ওঠে) বৈঠকে গানের যাত্রাপথে কথা-ই সেতু। গদ্যে চলতি ভাষা ব্যবহার এবং কবিতায় 'কাব্যিক' ভাষা পরিবর্জন এবং সজীব শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা অনুরূপ হাওয়াবদলেরই অনুরূপ প্রকাশ। মূলতঃ চেষ্টাটা একই, আঙ্গিকের পার্থক্য অনুযায়ী পৃথক ভঙ্গীতে প্রকাশিত। সুর এবং গানের কথার এই পরিবর্তন গানের সংকট-তারণের নিজস্ব টেক্‌নিক্। রবীন্দ্র-সঙ্গীতও শ্রেণীসংকটের অন্যতম ফল, প্রতিভার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করলেও একথা বলা যায়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতও যে শ্রেণীসংকটের অন্যতম ফল সে কথাটী শুধু পূর্বের যুগের পটভূমিকাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাই নয়, পরের যুগের তুলনায় এ কথাটী আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুধু শ্রেষ্ঠ কবি ন'ন, শ্রেষ্ঠ সুরকারও—এরকম সংযোগ জগতে বিরল। প্রতিভার সর্বমুখীনতা স্বতঃই বিস্ময়ের কারণ, কিন্তু এরকম অদ্ভুত সর্বমুখীনতা জগতেও অতি বিরল। রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রতিভাই এর জন্য দায়ী হলেও তাঁর এই প্রতিভার বিকাশে তাঁর যুগ তাঁর সহায় হয়েছিলো এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তন-ভঙ্গী হঠাৎ-প্লাবনী নদীর মতো নয়, গঙ্গার মতো—তার একটী দীর্ঘ যাত্রা আছে, ক্রম-পরিণতি আছে, অদ্ভুত সঞ্জীবনী ক্ষমতা আছে, আর নানা বিচিত্র রস ও নানা বিচিত্র দেশের স্পর্শ আছে। তটভূমি যেমন গঙ্গার দানে সমৃদ্ধ, তেমনই গঙ্গার পরিণতিতে তটভূমির দানও কম নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা-ধারার এই বৈশিষ্ট্য মনে থাকলে তটভূমির দিকে-ও তাকাতে হয়। যে যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম উন্মীলন সে সময় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়। মধ্যবিত্ত জীবনে যে অভূতপূর্ব আঘাত এসেছিলো তারই ফলে সমস্ত জাতি উদ্বুদ্ধ। কিন্তু সে উদ্বোধন ভাব-ধর্মী, বুদ্ধি-ধর্মী নয়। সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ভাববৃত্তির মধ্য দিয়ে, সেগুলির পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের চেষ্টা সে যুগে ছিলো না।

ভাববৃত্তির উপর এই ঝোঁক, এই ভাবগত মহোচ্ছ্বাস—রবীন্দ্র-প্রতিভার পক্ষে এর চেয়ে অনুকূল পরিবেশ সম্ভবতঃ আর ছিলো না। সে সময় একটী সংকট আসার ফলে জাতি নতুনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ, কিন্তু সংকটটী এমন ভঙ্গীর যে সে সময় নতুনের প্রতীক্ষা ভাবের জোয়ারে পর্যবসিত—ঠিক সে সময় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতেই সেই নতুনত্ব পরিপূর্ণ মূর্তি লাভ করবে সেটা স্বাভাবিকই। আর রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা ছাড়াও গান এবং সুর রচনার প্রেরণা ও সুযোগ পাবেন সেটাও বিচিত্র নয়। সেই যুগসংকটটী রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সম্পূর্ণরূপেই ধরা পড়েছিলো, সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ যে ঐ সংকটটার সর্বাঙ্গীণতায় সর্বাঙ্গীণরূপে উদ্বুদ্ধ হবেন ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবেন, নব নব পথ দেখাবেন, জাতির মানসের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্বন্ধ আলোচনা করলে সেটী স্বাভাবিক মনে হয়। শ্রেষ্ঠ কবি এবং শ্রেষ্ঠ সুরকারের একাধারে এই সম্মিলন বহুকাল পরে ঘটেছিলো, এরকম সম্মিলন আর কবে কোথায় ঘটেছিলো তা আমাদের মনে পড়ে না, কিন্তু এই সম্মিলন ঘটবার আধারটী দৈবদত্ত হলেও সম্মিলন ঘটবার কারণও যথেষ্ট ছিলো।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটী বৈশিষ্ট্য সেগুলি গানে রূপান্তরিত হয় না, সেগুলির কাব্যরস অনস্বীকার্য হলেও সে কাব্যরস সঙ্গীতরসের কাছাকাছি নয়। গীতাঞ্জলি গীতালির কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে বড়ো কি গান হিসেবে বড়ো কি দুয়ের নীরক্ষীরন্যায়ে সংমিশ্রণেই বড়ো (ন্যায়টাকে উপমা ভাবলে ভুল করা হবে) সে কথা বলা কঠিন। কিন্তু সমর সেনের কবিতা স্বপ্নে কি দুঃস্বপ্নেও গাওয়া চলে না। এর একটী সহজ কৈফিয়ৎ এই যে, এঁরা গীতিকবি ন'ন। আর যেহেতু প্রকৃত কবিতা গীতিকবিতাই এরকম ধারণা রোমান্টিক যুগের অন্যতম আবর্জনা, বাংলায় মাইকেলের মতো কবি প্রধানতঃ গীতিকবি না হয়েই বড়ো কবি, সেহেতু এঁদের কবিতা গীতিকবিতা হতেই হবে এরকম দাবী নিতান্তই অচল এবং হাস্যকর। কথাটী প্রথমতঃ এই, কিন্তু বাহ্য। প্রশ্ন ওঠে, এরকম ঘটনা নিতান্তই আকস্মিক, না এর পিছনে গভীরতর

কোনো কারণ আছে। কবিতার দিক্ দিয়ে এর পিছনে কি সামাজিক হাওয়াবদল আছে সে কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য করার কথা, এই সামাজিক হাওয়াবদলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এক-নায়কত্ব নষ্ট করা, ব্যক্তিক স্বৈরাচারের ধ্বংস সাধন। 'হিরো'র যুগ রাজনীতিতে শেষ না হলেও কাব্যে শেষ হয়ে এসেছে, শেক্‌স্‌পীরীয় নায়ক এখন দুর্লভ, ব্যক্তির বন্ধন মোচনেই সমাজের উন্নতি এরকম শেলীয় বিশ্বাস একালে নিতান্তই অসম্ভব। কবিরা যেকালে বিশ্বাস করেন যে সমাজেই তাঁদের ধৃতি ও পুষ্টি এবং কাব্যের সার্থকতার সম্ভাবনা, সেকালে কাব্যও অপেক্ষাকৃত সমাজ-ঘেঁষা হওয়া স্বাভাবিক, কবির দৃষ্টিও বহির্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে, নানা আঙ্গিক উদ্ভাবনের ফলে এবং নানা কবির প্রেরণা ও পরিশ্রমের ফলে কাব্যের কাব্যত্ব বজায় রেখে এই হাওয়া-বদলের রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কবিতার 'আমি'-র চেয়েও গানের 'আমি' বড়ো। অবিশ্বাসী ঐতিহ্যের ও ব্যঙ্গহাসির কবিতা গানের ধর্মের অনুযায়ী নয়। আর সেই সঙ্গে গদ্য ছন্দ (মুক্ত ছন্দ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বলছি না) গানে কতদূর বসে সে সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাহীন। 'আমি-'র সঙ্গে সমাজের সংঘাত গানে প্রবলতর।

ঠিক এই কারণেই বাংলা গানের বর্তমান দুর্দশা। কথার দিক্ হতে দেখা যায়, সাম্প্রতিক গানগুলি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অক্ষম অনুকরণ, রবীন্দ্রনাথের লাইনগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসানো। কিন্তু তাতে গানের অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য। সস্তা ভাবালুতা মনকে ক্লিন্ন করে। সিনেমার গানে, নাটকের গানে, 'আবহ-সঙ্গীতে', রেকর্ডের গানে যে ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল অধোগতির পরিচয় সম্প্রতি মিলছে সেগুলি গান বলে অবশ্য প্রচলিত কিন্তু সেগুলি আসলে কি তা বলা কঠিন। সাহিত্যে বা শিল্পে অনুকরণের চেয়ে অনুসরণই বোধ হয় অধিকতর সত্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় "অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি ; নিজের টিকি

পর্যন্ত দেখা যাবে না। আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘর-জামাইয়ের দশ হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছায় না। তাই বলে স্ত্রীকে বজায় না রাখলে ঘর চলে না। কিন্তু স্বভাবে ব্যবহারে যে স্ত্রীর ঝোঁক হওয়া চাই পৈতৃকের চেয়ে শ্বাশুরিকের দিকে, তবেই সংসার হয় সুখের।”

একালের কবিরা যদি বলার কিছু না থাকলেও কবিতা লিখতে হবে শুধু এই কারণেই কবিতার ধারাকে ঘুলিয়ে তুলতেন তা হলে যে অবস্থা হতো বাংলা গানের দুরবস্থাও কিছু পরিমাণে সেইরকম। কবিতায় রবীন্দ্র-রচনা একটী ক্রম-পরিণতিশীল ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তার একটী সজীব সচেতন এবং সম্ভবতঃ প্রাণবান উত্তরাধিকারও আছে, কিন্তু গানে অনুরূপ ঘটনা হয় নি। তার কারণ আমাদের যুগ ও সমাজের পরিবর্তন। ছোটো বড়ো কবি অনেক জন্মালেন কিন্তু গীতিকবির সন্ধান মিললো না। কবিতায় যে অপঘাত ঘটে নি গানে তাই ঘটেছে,—কারণ গানের ক্ষেত্রে সজীব রচয়িতার সন্ধান মিলছে না এবং বর্তমান হাওয়ায় তা মেলাও সম্ভবতঃ কঠিন।

গানে এই রুচিবিভ্রাটের কাহিনী শুধু কথার দিক্ হতেই সত্য নয়, সুরের দিক্ হতেও সম্ভবতঃ সত্য। আধুনিক গানের সুর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আংশিক অনুকরণ, তার অপর কিছু অংশ পশ্চিমা সঙ্গীতের সঙ্গে এদেশী লোকসঙ্গীতের সংমিশ্রণে নিষ্পন্ন। কথার চোরাবালির পর ‘আধুনিক’ গানের যদি বা কিছু অবশিষ্ট থাকে সুরের চোরাবালিতে তার সম্পূর্ণ বিলোপ অবধারিত। একদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতলালের যুগের রঙ্গমঞ্চের ক্ষীণ ধারা, অপরদিকে এই বর্ণসাংকর্য, এ দুয়ে একালের রঙ্গমঞ্চ বা সিনেমা-রেকর্ডের গান কলঙ্কিত। যাঁরা একালের যুগ-সচেতন ঔপন্যাসিক তাঁরা কেউ কেউ ছায়াচিত্রের গল্প রচনায় হাত দিয়েছেন, কিন্তু একালের যুগসচেতন কবিরা সে চেষ্টা করেন নি। গানের দুরবস্থা ঘটা, এ অবস্থায়, বিচিত্র নয়।

অবশ্য কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, লোকসঙ্গীত হতে শক্তি

সঞ্চয়ই যদি স্থাপিত রীতির গানের সংকট-তরণের চিরন্তন কৌশল, তা হলে ইদানীং ঝুমুর ভাটিয়ালী এবং গ্রাম্যসঙ্গীতের প্রচলন নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। কথাটা বিবেচনাযোগ্য সন্দেহ নেই, কেন না, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সার্থকতার পিছনেও এই রহস্য আছে। ও আপত্তির আলোচনায় দুটা জিনিষ লক্ষানীয়। প্রথমতঃ, গ্রাম্যসঙ্গীত সম্প্রতি বাংলা গানের অঙ্গীভূত হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে কেবল অঙ্গীভূতই হচ্ছে, মিশ্রীকৃত নয়। সেগুলি নানা জলসাতেও গাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেগুলির বৈশিষ্ট্য আধুনিক গানে শক্তি জোগায় নি। দ্বিতীয়তঃ এ লোকসঙ্গীতগুলি সবসময়ে সজীব ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়, অতীত ঐতিহ্যের কঙ্কালমাত্র। সেগুলির সর্বাঙ্গীণ অন্তর্ভুক্তি সে জন্য সবসময়ে শক্তির কারণ নয়। এগুলির সজীব দিক্‌টা বেছে সেগুলিকে বর্তমান গানের ধারার সঙ্গে সুষ্ঠুভঙ্গীতে মিশিয়ে নতুন ঐতিহ্য গড়ে তোলার কোনো নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আর সঙ্গীতে এরকম সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন শুধু সুরে নয় কথাতেও আসা প্রয়োজন, তা না হলে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্ভব নয়, এ কথা মনে রাখলে এই গ্রাম্যসঙ্গীতের আংশিক প্রচলন এখনও ভবিষ্যতের দিক্ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা বলা চলে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালী ছেলেমেয়ের মধ্যে ওস্তাদী গান শিখবার আগ্রহ বেড়েছে, ভারতময় সঙ্গীত সম্মিলনীর সংখ্যাও বেড়েছে, গানের বর্তমান দুরবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এগুলি লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু সঙ্গীতের রাজত্বে এগুলি প্রতিবিপ্লবের সামিল, যদি না ঐ অতীতের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের বীজ জন্মায়। বন্ধনমুক্ত নতুন ভঙ্গীর সঙ্গীতের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে মিলেছিলো, সেগুলি নিছক 'আমি'ময় নয়, একটা কাহিনীও তার মধ্যে আছে। তার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চমৎকার ভারসাম্য। কিন্তু সে কথা আলোচনা করা নিষ্ফল, কারণ সেগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার নিতান্ত নিজস্ব অভিব্যক্তি এবং একালের গানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্ভবতঃ ও পথে নয়। এযুগে গানের এই সমস্যার কি সমাধান হবে এবং কি উপায়ে সমাধান হবে সেটা এখনও অজ্ঞাত।

আরো একটী কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানেও একটা প্রাণ-খোলা হাসির স্বাক্ষর আছে, রবীন্দ্রনাথের গানেও হাসির সূক্ষ্ম সৌরভের সন্ধান মেলে। কিন্তু একালের বাংলা গান অধিকাংশই সীরিয়াস, আর হাসির গান নামে যেগুলি প্রচলিত সেগুলির সীমাহীন কুশ্রীতা এবং ক্ষমাহীন অক্ষমতা সমালোচনার অযোগ্য। এটা কি আকস্মিক, না এর শেষ কারণ আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত ?

২

প্রতিভার অলৌকিকত্ব, কবির বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করেও গান যতোটা ব্যক্তিগত, গল্প ও উপন্যাস ঠিক ততোটাই সামাজিক। তার মধ্যে পাত্রপাত্রীর কথাই বেশী, কবি সাধারণতঃ এই কুশীলবদের আড়ালে থাকেন। সে হিসেবে গল্প-উপন্যাসেই এযুগের মন সহজে প্রকাশ পাবে এ আশা দুরাশা নয়। নতুন আবহাওয়া কবিতায় সার্থক হয়ে উঠবার পূর্বে যতো ব্যর্থ শ্রম দরকার বা যতো পথ কাটার প্রয়োজন, গল্প-উপন্যাসে সম্ভবতঃ তার দরকার হয় না, কেন না, গল্প-উপন্যাসের ভঙ্গীটাই অন্যরকম। বাংলা গল্প-উপন্যাসের সাম্প্রতিক অবস্থা এই কথারই সাক্ষ্য। অবশ্য কবিতার মতো বাংলার উপন্যাসের ঐতিহ্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ,—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রত্যেকেই গল্প-উপন্যাসের অংশীদার। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিদের মতো ঔপন্যাসিকদের চিত্তেও হাওয়া-পরিবর্তন বিভিন্ন ফসল ফলিয়েছিলো—সেদিক্ দিয়ে বাঙালী ঔপন্যাসিকের মন কম সংবেদনশীল এবং স্বায় আঙ্গিকে কম কৌশলী ছিলো না। অবশ্য এই ভাবে আলোচনার একটা বিপদ আছে। ছিদ্রান্বেষীরা বলতে পারেন, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরী, এঁদের দাম কি কেবল যুগপ্রতিভূ হিসেবেই ? পরিবর্তনের ভঙ্গীর উদাহরণ ছাড়া কি এঁদের রচনার অন্য কোনও সার্থকতা নেই ? এর উত্তরে বলতে হয়, তা

মোটেই নয়, এবং নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অত্যন্ত সার্থক শিল্পীদের নামই উল্লিখিত হয়েছে। সার্থক রচনার নিশ্চয়ই একটা কালোত্তীর্ণ রস আছে, কিন্তু সে রস জন্মায় কালকে স্বীকার করেই, কালকে অস্বীকার করে নয়। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে যতীন্দ্রমোহন বাগচী কি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করলেই চলতো। ও যুগের ভঙ্গী বোঝবার জন্যে এঁদের কবিতাই বোধ হয় আরো উপযুক্ত, কেন না, সেগুলিতে খাঁটি প্রতিভার চেয়ে যুগসংস্কারই বেশী এবং সে হিসেবে তার যুগোচিত চেহারাও বেশী। সুতরাং যখন বলি, কবিদের মনে বা ঔপন্যাসিকদের মনে নতুন কাল নতুন ফসল ফলিয়েছিলো তার অর্থ এ নয় যে, ভঙ্গীর পরিবর্তনের নিদর্শন হিসেবেই তাঁদের কাব্য আলোচ্য। বরং বিপরীত। যে শিল্পীর সৃষ্টি ক্ষণজীবী নয় তাঁর চিত্তক্ষেত্রে নতুন কাল কি ভাবে স্বীকৃত হলো সেইটার আলোচনা হতেই সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ এবং সার্থক সাহিত্যরচনার ক্রিয়াটা ধরা পড়ে। নিকৃষ্ট রচয়িতারা চল্‌তি ফ্যাশানেই অভিভূত হবেন, মুদ্রা-দোষগুলি তাঁদের মধ্যেই ভালো ফুটবে, এ কথাটা এতই সাধারণ যে, সেটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াও সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কালকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বীকার করে কালোত্তীর্ণ হওয়া মহৎ কবির পক্ষেই সম্ভব, এমন কি, অন্বয়মুখে স্বীকার না করেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব। মহৎ কাব্যে পরিবর্তনের ভঙ্গীর সন্ধান মেলে, অনেক-ক্ষেত্রে একেবারে উপরে মেলে না, কিন্তু পরিবর্তনের ভঙ্গীই মহৎ কাব্যের সর্বস্ব এমন কথা অবিমিশ্র বাতুলতা।

বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত আলোচনা যখন আমার উদ্দেশ্য নয় তখন প্রত্যেক কৃতী শিল্পীর নামোল্লেখ না করলেও সম্ভবতঃ দোষের কারণ হবে না। রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার উপন্যসগুলিতে কেন ঐ ধরণের চড়া সুর, কবিত্বময় ভাষা এবং তির্যক ভঙ্গী প্রধান হয়ে উঠেছিলো তার কারণ নির্দেশের চেষ্টা পূর্বেই করেছি। অথচ রবীন্দ্রনাথই তাঁর ছোট গল্প এবং তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে বাঙালী জীবনের ঘরোয়া ছবি

আঁকতে আরম্ভে করেছিলেন। সেসময়েই কতকগুলি জিনিসের সূচনা দেখা গেলো, কবির ভাষায় যেগুলি 'নির্মম সাহিত্যে'র পর্যায়েই পড়বে। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই নির্মম সাহিত্যের আর এক পর্ব। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটা বৃহত্তর পটভূমিকা থাকে, প্রকৃতির সঙ্গে আদান-প্রদান থাকে, নানা আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব থাকে, না হয় প্রীতিস্নিগ্ধ গৃহ-কোণের চিত্রও থাকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় এরকম ফাঁক পূরণের চিহ্ন কম। নিবিড়, কিন্তু সম্ভবতঃ নির্মমতর বর্ণনাই শরৎচন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর রচনায় এই নির্মমতার সামাজিক ও ব্যক্তিক উভয় দিকই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটেছে। 'অরক্ষণীয়া'র মতো নিষ্ঠুর গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব নেই, নির্মমতার সামাজিক দিক্ সাহিত্যে এভাবে পূর্বে বেশী দেখা যায় নি। নির্মমতার ব্যক্তিক রূপটা পাই অচলা-পার্বতী প্রভৃতির চরিত্রে। যে কারণেই হোক্, মানসিক পীড়নে চরিত্রগুলি ক্লিন্ন ক্লিষ্ট দলিত। চিত্রাঙ্কনের মধ্যে কোথাও করুণার আভাস নেই—পীড়নের পর পীড়ন, পেষণের পর পেষণ, এতেই শিল্পীর আনন্দ। এরকম নিপীড়ন-রস বাংলা সাহিত্যে প্রথম কি না সে কথা পণ্ডিতদের আলোচ্য।

আসলে পার্বতী-অচলার এই মানসিক পীড়ন এবং চারিত্রিক ('চরিত্র ভাল', এ অর্থে চরিত্র নয়, সাহিত্যিক চরিত্র) দুর্বলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন, বিশ্লেষণ ও উদ্‌ঘাটন শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হলেও এগুলির মূল সামাজিক সংকটে। ওরকম দুর্বলতা সামাজিক সংকটকাল ছাড়া সম্ভব নয়। মনোবিকলনবাদীর মতে ওধরণের ঘাত-প্রতিঘাতের কারণ রুদ্ধরতি। কিন্তু রুদ্ধরতি সামাজিক অত্যাচারের ফল এ কথা মনোবিকলনবাদীদেরও স্বীকার্য। অবশ্য এর অর্থ নয় যে, মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং মার্কসীয় ব্যাখ্যার শেষ সিদ্ধান্তও একই। ফ্রয়েডের নিজের কথায় মনোবিকলনতত্ত্বের the other opposing *weltans-chauung* হচ্ছে মার্কসীয় ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা। রুদ্ধরতির ঊর্ধমুখীনতায় সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব, এর মূল কথাটা হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের

-বিরোধ, এবং সাব্লিমেশন তত্ত্বের ফলে সামাজিক অগ্রগতি যদি বা সম্ভব হয় সে অগ্রগতির কারণ মূলতঃ বিরোধমূলক এবং নেতিধর্মী। ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের সমীকরণ সাব্লিমেশনের মূলতত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর। বাহ্য বাধায় ব্যাহত প্রবৃত্তির পীড়ন বিকারের কারণ একথা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এর জন্যে পুঁথির প্রয়োজন হয় না। পার্বতী বিবাহিতা, সংসারধর্ম পালনই তার কর্তব্য, কিন্তু তার বুদ্ধি ও হৃদয়ের পথ এক হয় নি। এঙ্গেল্‌স্ এককালে বলেছিলেন, সর্বহারা ছাড়া স্বাধীন বিবাহ বা মুক্তপ্রেম সম্ভব নয়। বিবাহের বর্তমান রীতিতে দুটা ব্যক্তির বিবাহের পরিবর্তে দুটী সামাজিক টাইপের বিবাহই অধিকতর সত্য, সামাজিক শ্রেণীবিভেদ প্রকৃত প্রেমের অন্তরায়। স্বাধীন প্রেম অর্থে স্বেচ্ছাচার কোনো কালেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নয়, কিন্তু রূপোর নিকষে রূপাবিচার ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অধঃপতনের চরম নিদর্শন। ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু যুগে নানা বাঁধন ও নানা নিয়ম অনুরূপ প্রকৃতি এবং অনুরূপ পারিপার্শ্বিকের নরনারীর মিলনের পথ প্রশস্ত করার পরিবর্তে নিছক বাঁধনেই পরিণত হয়। আমাদের সমাজের ইদানীংকার গতিবিধি লক্ষ্য করলেই একথাটী বোঝা যায়। আমাদের প্রাচীন সমাজে বৈবাহিক বিধিনিষেধ নানা ক্ষেত্রে অনেক সময় সংকীর্ণ হলেও তাতে ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের বিবাহের কোনও বাধা ছিলো না। সম্প্রতি 'আলোকপ্রাপ্ত' সমাজ সে বিধিনিষেধগুলি উপেক্ষা করলেও শ্রেণীমর্যাদা রক্ষায় বেশী তৎপর। বংশ-কৌলিন্যের বদলে কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ এসেছে। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক বিধিনিষেধের সন্ধান মিলছে। যে শিল্পী এই বিধিনিষেধ স্বীকার করতে পারেন নি তাঁর পক্ষে এগুলির নানা অসঙ্গতি, নানা সামাজিক ও ব্যক্তিক পীড়ন চোখে পড়াই স্বাভাবিক। সুতরাং শরৎচন্দ্র যে হাসির গল্প লেখেন নি, কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের বহুমুখীন উন্নাসিকতা ও প্রবঞ্চনা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রাসবিহারী-বিলাসবিহারীর ভণ্ডামি, রমেশের

পল্লীসংস্কার, বিজয়ার দরিদ্রের প্রতি করুণা, মহিমের সচেতন জড়তা, সুরেশের ছলনা এবং বিবেকদংশনের যুগপত্তা,—বিভিন্ন চেহারায় দেখা দিলেও এগুলি মধ্যবিত্ত মানসেরই নানা দিক্, এগুলির মূল ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। আর দেবদাস-পার্বতী, সতীশ-সাবিত্রী, শ্রীকান্ত-পিয়ারীর খাপছাড়া মিছিল শুধু যে একালের ভবিষ্যৎ-হীন সমাজের একটা দিক্ তাই নয়, ওগুলি আমাদের জীবনস্রোত পঙ্কিল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও বড়ো বুলির সাহায্যে বাইরের ঠাট বজায় রাখার মধ্যবিত্ত চেষ্টার প্রতি একটা বিরাট ব্যঙ্গও। লক্ষ্মীকে স্বীকার করার দায় লক্ষ্মীছাড়ার নেই, কম্বাইন্‌ড্ হ্যাণ্ডে অভ্যস্তের পক্ষে পিয়ারী বাঈজীই কল্পনাতীত সৌভাগ্য। খাপছাড়া দলের সামাজিক সভ্য-ভব্যতা মান্‌বার কোনো দরকার নেই, তাই কোথাও দুয়ের সংঘাতে পীড়ন, কোথাও বা চাপা ব্যঙ্গ। সাবিত্রী সম্বন্ধে সতীশের বিস্ময়োক্তি স্মরণীয় "ভদ্দরলোক কি রে—"।

কিন্তু এইখানে আর একটী কথা আলোচ্য। শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমালোচনা সচেতন হলেও সাধারণতঃ নেতিধর্মী। কি পীড়ন কি চাপা ব্যঙ্গ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পঙ্গু মনুষ্যত্বের (বা ক্লীবত্বের) পরিচয় আছে, সবল মানবিকতার ও সুস্থ ভবিষ্যৎ আদর্শের জোরে সংকটত্তরণের চেষ্টা নেই। এই কারণে ছোটো বালকের চরিত্র শরৎচন্দ্রের হাতে অপরূপ ফোটে, তারা এই অন্তঃসংঘাত হতে অনেকটা বঞ্চিত। 'রামের সুমতি'র রাম, 'মেজদিদি'র কেষ্ট, 'দত্তা'র পরেশ—এদের চেহারাই অন্য। বয়স্ক মানুষদের মধ্যে নরেনের চরিত্রে ঐ আদর্শের কিছু সন্ধান মেলে, কিন্তু তার মধ্যেও বয়স্ক শিশুর প্রভাব সুস্পষ্ট, ফলে সুস্থ যৌবনাদর্শ তার মধ্যেও দেখা দেয় নি। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্বাস অনেকটা অনুমানের বস্তু, কিন্তু 'পথের দাবী'তে সন্ত্রাসবাদ চিত্রণের একটী অর্থ আছে। সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সাহিত্যিক উপকরণ নিশ্চয়ই আছে, এই গোপন অন্ধকারে বিপদসঙ্কুল জীবন সহজেই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে। নানা দেশী-বিদেশী

লেখকের রচনা এ কথার স্বপক্ষে সাক্ষী। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ শ্রেণীস্বার্থধ্বংসের উপায় হলেও উদ্দেশ্য নয়, নিষ্পিষ্ট গণশক্তির অসহিষ্ণু প্রকাশই সন্ত্রাসবাদের কারণ। প্রকৃত গণশক্তির উদ্বোধনে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের দেখা মেলে, সন্ত্রাসবাদের নয়। যাঁরা স্বল্পাকাঙ্খী দলে নাম লেখাতে রাজী ন'ন তাঁরা সম্ভবতঃ পরিণামে লাভের লোভে আপাত উপায় হিসাবেও সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করতে রাজি ন'ন। কিন্তু রাজনৈতিক তর্কের গহনে প্রবেশ না করলেও বলা যায় এগুলির মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ভাবোচ্ছ্বাস যেমন নেই তেমনই আসন্ন কালান্তরের সঞ্জীবন আশারও সন্ধান নেই, বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসই বড়ো, বর্তমান সম্বন্ধে যথেষ্ট অসন্তোষ আছে কিন্তু কিসে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক, এমন কি, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও নেই। 'মহেশ' গল্পের শেষের কথাটা এই,—"আল্লা! আমাকে যত খুসী সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। ··· যে তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।" আমার যা হয় হোক্, অপরের ক্ষতিটাই বড়ো কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভারও একটা ক্রম-পরিণতি আছে, রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করারই প্রয়োজন নেই। এঁদের প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে শেষের যুগের রচনার পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য ভাষা, বিষয়বস্তু নির্বাচন, বর্ণনাভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গী, প্রত্যেক দিকেই দেখা যায়। দুর্গেশনন্দিনী বা কপালকুণ্ডলার ভাষার সঙ্গে বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল তুলনীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় জমিদার-বাড়ার নীচে নামেন নি, কিন্তু রাজা-বাদশার বর্ণনার চেয়ে এগুলি আরো ঘরোয়া একথা অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য রাজাবাদশার বর্ণনা বলেই দুর্গেশনন্দিনী কম সার্থক তা নয়, রাজসিংহ সাতারাম-ও রাজাবাদশার কাহিনী, কিন্তু সার্থক রচনা ক্রমশঃ ঘরোয়া ছবিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে

লাগলো বা সেইদিকেই কবিদের সন্ধান করতে হলো, শ্রেণী-ক্ষয়িষ্ণুতার ইতিহাসে এ কথাটাও মনে রাখার মতো। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এরকম ক্রম-পরিণতি এবং পটপরিবর্তনের চিহ্ন অজস্র। কিন্তু শরৎচন্দ্র এরকম ক্রম-পরিণতির পরিচয় দেন নি, তাঁর প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে শেষের যুগের রচনার পার্থক্য অতোটা সুস্পষ্ট নয়। শেষের দিকে, আশঙ্কা হয়, নিজের ঐতিহ্য খণ্ডন করার পরিবর্তে নিজের ঐতিহ্যের ভারেই শরৎচন্দ্রের রচনা অচল। 'শেষের পরিচয়ে'র যে কয় পরিচ্ছেদ তাঁর নিজের রচনা তাতে নতুন মা, রাখাল প্রভৃতি চরিত্র অবিশ্বাস্য রকমে টাইপ-ঘেঁষা। তাদের জীবন অদ্ভুত-রকম ছন্নছাড়া, কিন্তু ছন্নছাড়া হবার একটা মানবিক কারণ না ফুটলে চরিত্রগুলির সাহিত্যিক অপমৃত্যু অনিবার্য। মনে হয়, ঐ আংশিক-লিখিত বইটার মধ্যেও এই অপমৃত্যুর লক্ষণ সুস্পষ্ট। আসলে এটা শরৎচন্দ্রের প্রতিভারও অপমৃত্যুর লক্ষণ। কোনো বৈজ্ঞানিক আশাবাদের সন্ধান মিললে সম্ভবতঃ তাঁর রচনায় ক্রম-পরিণতির চিহ্ন মিল্‌তো, তাঁর প্রতিভার আপেক্ষিক স্বল্পায়ুর জন্যও বাঙালী পাঠককে শোকগ্রস্ত হতে হতো না। কিন্তু তা ঘটে নি। সেইজন্যেই শ্রীকান্তের সঙ্গে রাখালের যতোটা পার্থক্য রমেশের সঙ্গে অমিত রায়ের পার্থক্য তার চেয়ে বহুগুণে বেশী, আকারে এবং প্রকারেও।

সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখকদের সমালোচনা এক হিসেবে সহজতর। এঁদের অনেকেই একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি এবং প্রবন্ধলেখক। কারিকা ও বৃত্তি একই লোকের রচনা হলে বুঝবার সুবিধা। এঁদের গল্প ও উপন্যাসে যে রচনাভঙ্গী গড়ে উঠছে এবং যে হাওয়াবদলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও কয়েকটা কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, কবিতায় যেমন উপন্যাসেও তেমন, সামাজিক বহিরাবরণ এবং আত্ম-প্রবঞ্চনা ভেঙে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেই ঔপন্যাসিকেরা অনেকসময় ব্যস্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয়,

অভিনয় নয়, এবং অন্যান্য গল্প' প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই ধরণের আভাস মেলে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো নানা প্রচেষ্টাও চলছিলো। কয়েকখানি হাতের কাছে পাওয়া বই থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর'। এর মধ্যে বর্তমান জীবনের কঙ্কালসার স্বরূপটী ফুটেছে। মোহ কেটেছে, ফলে গল্পে এমন একটা ভঙ্গীর সন্ধান মিললো যা আগে সহজলভ্য ছিলো না। অবিশ্বাসের মাত্রা বেড়েছে, তাই মৃদু ব্যঙ্গহাসি যতো আছে ক্রোধস্ফুলিঙ্গ ততো নেই। প্রবোধকুমার সান্যালের 'আঁকাবাঁকা'-ও এই ধরণের অবিশ্বাস এবং বাঁধনহারা ভাবে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার শেষদিকের অস্পষ্ট ভাবালুতা অচল। বিভূতিভূষণের রচনায় আর একটী দিকের সন্ধান মেলে। বাঙালী পল্লীজীবনের নিবিড় পরিচয় এবং পল্লীসভ্যতার সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার নানা সংঘাত অপুর চরিত্রে ফুটেছে।

বাস্তবিক, পূর্বের সঙ্গে তুলনা করলে নতুন উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে সময়বোধের একটি বিচিত্র ভঙ্গী চোখে পড়ে। পূর্বের উপন্যাস-গুলিতে একটা সময়-কাটার আভাস মিলতো। কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিষবৃক্ষ বা দেবী চৌধুরাণী পড়লে মনে হয় এগুলি দশ, পনের কি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের একটি কাহিনী। চোখের বালি কি নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ—এগুলির মধ্যেও সে অনুভূতি আছে, শরৎচন্দ্রের রচনাতেও আছে। কিন্তু শেষের কবিতা পড়লে ও-ধরণের সময়বোধ নিশ্চয়ই হয় না, মনে হয় এটি কতকগুলি মুহূর্তের সমষ্টি, হয়তো অক্ষয় মুহূর্ত, তবু মুহূর্তই, তার বেশী কিছু নয়। সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলির মধ্যে দুটি ভঙ্গী দেখা যায়। কতকগুলির মধ্যে সময় কাটবার কোনো আভাস নেই, সেগুলির সময় স্বল্প, দীর্ঘদিনের কাহিনী তারা নয়। নাগরিক জীবন এরকম উপন্যাসের সহায়তা ঘটিয়েছে। কর্মব্যস্ত জীবনে গভীর অনুভূতির অবসর কম, কাজ কাজ করেই জীবন ও সময় পাগলের মতো কেটে চলেছে, জীবনের মূল নেই, ঐতিহ্যে বিশ্বাসও অসম্ভব। বুদ্ধদেব বসুর 'পরিক্রমা' এই ধরণের চমৎকার উদাহরণ। একটি দিনের সকাল

হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এর সময়, কিন্তু তার মধ্যে, বা তার মধ্যেই, গল্প গড়ে তোলা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। কিন্তু এর বিপরীত ভঙ্গীর সন্ধান মেলে তারাশঙ্করের রচনায়। তাঁর গল্প বা উপন্যাসগুলির মধ্যে একটী গভীর সময়বোধ আছে যা সম্ভবতঃ পল্লীর পটভূমিকা ছাড়া ফুটতো না। তাঁর জলসা-ঘর, খড়গ প্রভৃতি গল্প এবং ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী প্রভৃতি উপন্যাসে যে তীব্র অনুভূতি এবং অদ্ভুত রচনাকৌশল আছে সেগুলি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। যাঁরা সাহিত্যে গণ-আন্দোলন প্রভৃতি অচল এরকম একটা 'বিশুদ্ধ' ধারণা পোষণ করেন, তারাশঙ্করের রচনা তাঁদের পক্ষে মহৌষধ। শ্রেণীসংঘর্ষ ফোটাবার জন্যে তারাশঙ্কর কখনও বেপরোয়া নাগরিক জীবন আঁকতে চাননি, নিছক বৈহাসিক ছদ্মবেশে তাঁর রুচি নেই, তাঁর কোনো চরিত্র বুদ্ধদেব বসুর পাত্রপাত্রীর মতো হালকা বেপরোয়া নয়, কারণ তাঁর শ্রেণীসংঘর্ষবোধ আরো গভীর, অনুভূতি আরো স্পষ্ট, আরো প্রত্যক্ষ এবং কম নেতিধর্মী। কালিন্দীর সংঘর্ষ বা গণ-দেবতার সংঘর্ষ সহজেই রাজনৈতিক বক্তৃতার বিষয় হতে পারে। কিন্তু বাংলার সামাজিক স্তরে স্তরে বর্তমান কালের যে দংশন মুহূর্তে মুহূর্তে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সেগুলিকে বাস্তবভাবে অনুভব করা এবং রূপ দেওয়ার এরকম ক্ষমতা তারাশঙ্করের নিজস্ব। অনিরুদ্ধ কামার, পাতু, দুর্গা, রাজবন্দী—এসব চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক, তারা যে কাজ করে সেগুলি থিওরির চাপে করে না, প্রাণের স্বাভাবিকতায় করে; কিন্তু তাদের প্রাণে যে সংঘর্ষ এসেছে সে সংঘর্ষ কতদূর মানবিক এবং কতদূর সত্য তারাশঙ্করের রচনায় তারই পরিচয় মেলে। ধাত্রীদেবতার মধ্যেও সেই কথা। এর বিরাট্ গম্ভীর পটভূমিকার সামনে যে প্রাণের উদ্বোধন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের ছবি মেলে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, নবজাগ্রত চাষী সম্প্রদায় এবং বিপ্লবী মধ্যবিত্ত যুবকের যে সম্মিলন শিবনাথের চরিত্রে ঘটেছে সেটি শুধু রচনাকৌশল এবং বর্ণনাভঙ্গীর দিক্ দিয়েই যে রসোত্তীর্ণ তা নয়, বাংলা সাহিত্যে এর স্বাদও অভিনব।

দুঃখের কথা, বাংলা উপন্যাসের ধারা সমগ্রতঃ এদিকে নয়। এরকম বাস্তব অনুভূতির পথে এগোনোর পরিবর্তে বাংলা গল্প ও উপন্যাস অন্যপথেই বেশী এগোচ্ছে মনে হয়। পল্লীজীবনের পরিবর্তে নাগরিক জীবনের বর্ণনা ক্রমবর্ধমান, উচ্ছ্বাসময় ভাষার পরিবর্তে ব্যঙ্গময় তির্যক ভাষা এবং চলতি ভাষার ব্যবহার সহজলক্ষ্য, 'বস্তি-সাহিত্যের' প্রচলন, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের কাটাছাঁটা নাটকীয় সংলাপ এবং 'বস্তি'-জীবনের 'অশ্লীল' উক্তি, মানস বিশ্লেষণের প্রাধান্য, বহুসময়ে রুগ্ন ও বিকৃত মানসিক সংস্থানের বর্ণনা —একালের গল্প উপন্যাসে এগুলি অপ্রতুল নয়। এগুলির রস বাংলা সাহিত্যে হয়তো কিছু পরিমাণে নতুন, সে হিসেবে নতুন রস সংস্থাপনে পারদর্শিতা আনন্দেরই কথা, তবুও কিন্তু এর মধ্যে দুঃখের কথা এইজন্যই যে অনেক সময় এগুলি সাহিত্যের পর্যায়ে না পৌঁছেই শুধু বীভৎসতা এবং কদর্যতার ছাপ নিয়েই সাহিত্যের আসন দাবী করে। বিকৃত মনের কাহিনী কিভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে তার সন্ধান মেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো রচনায়। তাঁর 'মিহি ও মোটা কাহিনী' বিস্ময়কর রচনা। অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে রচিত হলেও এবং মনোবিকলনের দীর্ঘ বক্তৃতা না থাকলেও এগুলিতে এমন কতকগুলি মনের পরিচয় মেলে যেগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং অত্যন্ত সত্য, কিন্তু কোনোমতেই সুস্থ নয়। এবং সে পরিচয় দেবার কৌশলও এমন চমৎকার যে সেগুলি কোনো থিওরির উদাহরণ নয় কিন্তু মানবিক সত্যই, একথা দুঃশীল সমালোচকও স্বীকার করবেন। এ বইটি সাহিত্য হিসেবে কেন সার্থক সেকথা স্পষ্ট বোঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' পড়লে। এটি-তে তাঁর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু এই নতুন রস যেখানে সার্থক (এবং যেখানে অসার্থকও) সেখানে সেটা যে আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের ফল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কবিতায় বা গানে যেটা কোনো কোনো সময়ে পরোক্ষ, কবিমনের দ্বারা অন্য চেহারায়

রূপান্তরিত, গল্প উপন্যাসে সেগুলি আরো প্রত্যক্ষ ও আরো উদ্ধত-ভাবে দুঃসাহসিক। সংক্ষেপে বলা চলে, এগুলিও বাঁধন ভাঙার রচনা, নতুন সমাজের রচনা নয়। এই কারণেই অক্ষম সাহিত্যিকদের মধ্যে 'কদর্যতা' বা 'বীভৎসতা' নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলেছে, যদিও সেগুলি যে আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের অনস্বীকার্য সত্য এবং সে হিসেবে নিঃসন্দেহে সাহিত্যের উপকরণ সেকথা তাঁরা অনেক সময় প্রমাণ করতে পারেননি। কডওয়েল লিখেছিলেন, Low-brow proletarian art grows on the proletariat's unfreedom and helps, by its massage of the starved revolting instincts, to maintain that unfreedom in being. Because it is mere massage, because it helps to maintain man in unfreedom and not to express his spontaneous creation, because of that it is bad art. Yet it is an art which is far more really characteristic, which plays a far more important and all-pervasive rôle in bourgeois society than, for example, the art of James Joyce. এর মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য মমতা প্রভৃতি মানবিকতার চিহ্ন থাকা সম্ভব নয়, কেন না this understanding by the unfree of the essence of his formula forces him to detach it still further from material reality and lift it completely into an ideal realm where it blossoms and spreads without restraint, forming an inverted world of ideal freedom which is at once a protest against real misery and an expression of real misery—a wholly bourgeois phantasy, the religion of *humanism*. এই humanism-ও এখন অসত্য হতে চলেছে, তাই ভ্রান্তিবিলাস আরো কম, সেকারণেই একালের ঔপন্যাসিকেরাও আরো নাস্তিক হতে

চলেছেন। এঁরা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার আশ্রয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তা না হলে বিপ্লবী হয়েও আস্তিকতার সন্ধান মিলতো। নৈরাজ্যবাদী নিঃসন্দেহে বিপ্লবী, কিন্তু প্রাচীন সমাজেরই অন্তর্গত। What politically is this final bourgeois revolutionary ? He is an anarchist.

বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে প্রকৃত নতুন যুগের সুর লেগেছে কি-না জানা নেই, কিন্তু নানা নতুন সুর নিশ্চয়ই লেগেছে। তার কারণ নিঃশ্রেণীক সমাজের উদয় নয়, প্রাচীন সমাজের ভাঙন। নানাদিকে নানাভাবে নানাভঙ্গীতে এর সন্ধান মিলছে, কিন্তু তার মূল কারণ একই জায়গায়। সেইজন্যে ভাবরূপায়নের প্রত্যেক দিকেই এক ধরণের গতির সন্ধান মেলা আশ্চর্য নয়। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু রসোত্তীর্ণ রচনার সন্ধান মেলাও আশ্চর্য নয়, কারণ কোথাও কোথাও শুধু যে প্রতিভাবান্ শিল্পীর সন্ধান মিলেছে তাই নয়, তীব্র আঘাতে জীবনের নিটোল শান্তি ভেঙে তার প্রত্যেকটি কণা আমাদের অনুভূতি-গ্রাহ্য হবার সুযোগ মিলেছে, দুঃখ-বেদনা-আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি খোঁচ প্রত্যেকটি কোণ বুঝবার দিন এসেছে, প্রাণের গভীরতম স্তর পর্যন্ত আলোড়িত হয়েছে। নতুন নতুন দৃশ্য-পটের সার্থক উন্মীলনের সুযোগ সুস্পষ্ট। নিটোল শিশিরকণার মধ্যে সৌন্দর্য আছে, সে সৌন্দর্য হয়তো শুভ্র, করুণ-গম্ভীর ও প্রীতিস্নিগ্ধ, কিন্তু যে সময় জলকণা star-showers-এ লাফিয়ে ওঠে তার মধ্যে নিষ্ফল আস্ফালন এবং আপন-ভাঙা বিপ্লব থাকলেও তার সৌন্দর্যও অবশ্যস্বীকার্য।

৩

এ যুগে নাটক জন্মানোর একটা বিশেষ সুবিধা এবং নাটকের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। বাংলাদেশে গত শতকে দীনবন্ধু, এমন কি মাইকেলের, নাটক রচনার এবং অভিনয়ের পুনর্জন্ম

হবার একটী অনুকূল পরিবেশ ছিলো। যে সময় সমাজসত্তা গভীরতম স্তর পর্যন্ত নাড়া খায় অথচ সমাজশরীর ভেঙে পড়ার পরিবর্তে একটী নতুন সংহতিতে উদ্বুদ্ধ হয় সে সময় নাটকের প্রাচুর্য স্বাভাবিক, কেন না সে সময় নাটকের আঙ্গিকই ভাবপ্রকাশের সবচেয়ে উপযোগী। তা ছাড়া আঙ্গিক হিসেবে নাটকের কতকগুলি সুবিধা বা বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে কবিতা বা গান আছে, গল্প-উপন্যাসও একভাবে আছে, সেই সঙ্গে শব্দগ্রাহ্য আঙ্গিকের সঙ্গে চক্ষুগ্রাহ্য আঙ্গিকের মিলন ও মিশ্রণ আছে। প্রতীকিতা এবং সাক্ষাৎ অনুকৃতি দুই-ই আছে। নাটক পঠনীয় হিসেবেও নতুনত্বের বাহন হতে পারে। কিন্তু অভিনীত হলে তার মধ্যে আরো ভাবসংঘাত দেখাবার সুযোগ অত্যন্ত বেশী। অবশ্য অভিনয়ের বেলা নাটক-রস ছাড়া একটী স্বতন্ত্র নাট্যরস আছে, কডওয়েলের কথায় Irving's "Hamlet", or Shakespeare's —we have to choose. গানের মধ্যে কথা ও সুরের মতো নাটকের মধ্যেও নাটক-রস এবং নাট্যরসের সমন্বয় ও পারস্পরিক পরিপূরণ না হলে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু যে যুগে সংহতিবোধ প্রবল সে যুগে নাটক যেমন স্বাভাবিক, যে যুগে শ্রেণীবৈষম্য বর্ধমান এবং দর্শকদের অনুভূতির স্তর বিভিন্ন, সহৃদয়তার মাত্রা ও ভঙ্গী এক নয়, সে যুগেও নাটকের একটী বিশেষ সুবিধা আছে। এলিয়ট এই কথাটীকে এইভাবে বলেছেন :

The ideal medium for poetry, to my mind, and the most direct means of social 'usefulness' for poetry, is the theatre. In a play of Shakespeare you get several levels of significance. For the simplest auditors there is the plot, for the more thoughtful the character and conflict of character, for the more literary the words and phrasing, for

the more musically sensitive the rhythm, and for auditors of greater sensitiveness and understanding a meaning which reveals itself gradually. And I do not believe that the classification of audience is so clear-cut as this; but rather that the sensitiveness of every auditor is acted upon by all these elements at once, though in different degrees of consciousness. . . . Furthermore, the theatre, by the technical exactions which it makes and limitations which it imposes upon the author, by the obligation to keep for a definite length of time the sustained interest of a large and unprepared and not wholly perceptive group of people, by its problems which have constantly to be solved, has enough to keep the poet's *conscious* mind fully occupied, as the painter's by the manipulation of his tools. If, beyond keeping the interest of a crowd of people for that length of time, the author can make a play which is real poetry, so much the better. (*Use of Poetry & Use of Criticism*, p. 153).

এলিয়টের এই উক্তির মধ্যে একটা গভীরতর সমস্যা এবং একটা বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গীর সন্ধান মেলে। নাটকে স্তর-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এলিয়টের মত সহজেই গ্রহণীয়, এরকম বিচিত্র রস নাটকে যতোদূর সম্ভব অন্য কিছুতেই তা সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার, এলিয়টের এই উক্তি নাটকের প্রসঙ্গে নয়, কবিতার সামাজিক সার্থকতা সম্বন্ধে। তাঁর মতে কাব্যের সামাজিক সার্থকতা, বর্তমানে, নাট্যরূপেই বৃহত্তম পরিমাণে সম্ভব। কয়েকটা প্রশ্ন এখানে অবশ্য

বিচার্য। প্রথম কথা, নাটকের মধ্যে কাব্যরস অন্যতম অঙ্গ হলে তার বিপরীত কথাটীও অনুরূপ সত্য কি না। কাব্যের মধ্যে 'আমি' যে প্রভাব তার সঙ্গে নাটকের সহজেই সংঘাত হতে পারে, এক্ষেত্রে প্রতীকী নাটক এবং রূপকের সন্ধান মিললেও প্রকৃত নাটকের সন্ধা কতদূর মিলবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য কাব্যের মধ্যে ব্যক্তিক প্রভাবের তারতম্য আছে, সে হিসেবে উপরোক্ত আশঙ্কা (সার্বজনীন সত্য কখনই নয়, শেক্সপীয়র তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, কি ওখান হতে একটা দ্বন্দ্বের উদ্ভব সম্ভব। এলিয়ট শেষে যে অদ্ভুত ম প্রকাশ করেছেন, বলেছেন যে নাটক দর্শকদের থামিয়ে রাখলে যথেষ্ট, তার উপরে ভাল কবিতা পাওয়া গেলে সেটা উপরি পাওনা— এ-কথা সুস্থ মনের কথা নয়। সমাজবোধকে অস্বীকার করা চলে অথচ স্বীকার করাও চলে না এরকম একটা মানসিক দোটানার ফলে ঐ কথা বলা চলে। কাব্যনাট্য সামাজিক সেরিব্রাসের মুখবন্ধে মাংসখণ্ড, কিন্তু তাতে ভালো কাব্য সম্ভবতঃ মিলবে না—কথাটা শে পর্যন্ত এই-ই দাঁড়ায়। সেইজন্যে যাঁরা নাট্যামোদী তাঁরা এ ধরণে নাটকের নিশ্চয়ই অকুণ্ঠ সমর্থন করবেন না এবং বিচার করবেন (ইংরেজী সাহিত্যে সম্প্রতি কাব্যনাট্যগুলির উদ্ভব এবং সফলতার মূ এই মনোবৃত্তি ছাড়াও অন্য কিছু আছে কি না। বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ প্রশ্ন ওঠে—একালের জীবন নাটকের আঙ্গিকে কি ভাবে ফুটলো। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন ওঠে, কাব্যও নাট্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসুক কি না, কাব্যনাট্য বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলো কি না।

কাব্যনাট্য কথাটার বিশেষ উল্লেখের কয়েকটা প্রয়োজন আছে। শেক্সপীরীয় প্রতিভায় এবং সে যুগের পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাকে ওভাবে নাটকে সংহতিবদ্ধ করা সম্ভব হলেও কাব্যনাট্যে সে কাজ কঠিনতর। সংলাপ নাটকরসের অন্যতম অঙ্গ। বিভিন্ন পাত্রপাত্রী বা বিভিন্ন স্তরের পাত্রপাত্রী একধরণের কথাবার্তা বলে না, সংস্কৃত নাটকেও কোনো কোনো চরিত্র প্রাকৃতে এবং কোনো কোনো

চরিত্র সংস্কৃতে কথা বলার নিয়ম আছে। কবিতায় এ কৌশলটীর ব্যবহার কঠিনতর। রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র মতো একটী নাটকীয় কবিতার উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। রানী এবং পরিচারিকাদের কথাবার্তা হতে খুব বেশী স্বরবৈষম্যের আভাস মেলে। কাব্যনাট্য একটী বিশেষ জাতের নাটক না হয়ে শুধু নাটকীয় কবিতা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যরস বা কাব্যরস দুয়েরই হানি ঘটার ভয় আছে। সুতরাং কাব্যনাট্যেই কবিতার শ্রেষ্ঠ সামাজিক সার্থকতা এ কথা মানা চলে না।

বাংলা নাটকের বিচিত্র ইতিহাসের সম্পূর্ণ আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়, দু-একটী কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা নাটকের ইদানীং একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী গড়ে উঠেছিলো যার সঙ্গে 'নাটুকেপণা' কথাটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অস্বাভাবিক সাজ, অস্বাভাবিক কথাবার্তা, চড়াগলায় চাৎকার, সস্তা রং চং, হৈ চৈ, 'রিয়লিস্টিক' সীন,—ইত্যাদি সব মিলিয়ে এমন একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিলো যেটী রঙ্গমঞ্চের ক্রমশঃ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছিলো। বাংলার রঙ্গমঞ্চ আজও এ নাটুকেপণা থেকে মুক্ত নয়, বরং সিনেমার সমাদর বৃদ্ধির ফলে রঙ্গমঞ্চ যে অনাদরের অন্ধকারে রইলো তাতে ওসব আগাছাগুলির শিকড় আরো মজবুত হবার সম্ভাবনা। অথচ বাংলা নাটকের আদি ঐতিহ্য তা নয়। দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আজও হয়নি, কিন্তু বাংলার যে নাট্যকারদের জয়গানে সমালোচকেরা সাধারণতঃ মুখর তাঁদের চেয়ে দীনবন্ধুর রচনা অনেক সময়ই শ্রেষ্ঠতর ও বহুগুণে সার্থকতর এ কথা বুঝবার সময় এসেছে। নীলদর্পণের ব্যবহারিক মূল্য দীনবন্ধুর নাটকের সাহিত্যিক মূল্য আবৃত করে রেখেছে, কিন্তু সেই সাহিত্যিক মূল্য যাচাই হওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে। দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল।

তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না।··· কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই-চারিখানা পল্লীগ্রাম, বা দুই-একটি ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই।·· এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য কি?"

"কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না।··· কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে; সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি।··· সকল কবিরই এ সহানুভূতি

চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। ... তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।"

রুচির মানদণ্ড প্রত্যেক যুগে এক নয়, কিন্তু দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বর্তমান পটভূমিকায় একটা গভীরতর সার্থকতা বহন করে। গর্ভিণী নারীর বস্ত্রাকর্ষণ, নারী-ধর্ষণ—এগুলি একালের রুচির মানদণ্ডে অচল কি সচল সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু প্রযোজনার ক্ষেত্রে এগুলির রসবত্তা কতদূর সে বিচার অসঙ্গত নয়। সেদিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ সত্য, কেন না এগুলি নাটকীয় রুচির ব্যাঘাত জন্মাতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। অবশ্য এরকম দৃশ্য সেকালে এতো অচল ছিল কি না সেকথা বর্তমানে বিচার করা কঠিন, তবুও এক্ষেত্রে দীনবন্ধু একটু অতিশয়-ধর্মী এ কথা স্বীকার করাই সঙ্গত। কিন্তু দীনবন্ধুর এই বাহুল্য নাটুকেপণার দিকে নয়, ঠিক বিপরীত। বাস্তব জীবনকে যথাযথভাবে কাব্যের অঙ্গীভূত করাতেই এ দোষ ঘটেছে —অর্থাৎ কাব্যের কৌশল এখানে বজায় থাকে নি, বিষয়বস্তুর দিকেই নজর বেশী। কিন্তু এ ত্রুটি সত্ত্বেও দীনবন্ধুর সংলাপ রচনা এবং রচনাকৌশল প্রচুর প্রশংসার দাবী রাখে। চাষা ও অন্যান্য সাধারণ শ্রেণীর কথাবার্তা যথাযথ বজায় রাখার ফলে তাঁর নাটকের উৎকর্ষ বেড়েছে, আর যে সমাজজীবনের চিত্র তাঁর নাটকে মেলে সে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর নাটকীয় সফলতার মূল ভিত্তি।

বাংলা নাটক দীনবন্ধুর পরে প্রায় বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছিলো। তার ফলে আমরা হয়তো নানা নতুন আঙ্গিকের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু নাটকের মধ্যে আমাদের জীবনের ছবি ও আমাদের জীবনের গভীর

বিচিত্র স্পন্দনের পরিবর্তে অস্বাভাবিক স্ফীতি ও অদ্ভুত কাহিনীর পরিচয় বেশী মিলেছিলো। আমাদের ছায়াচিত্রগুলির অধিকাংশই এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ওগুলির নায়কনায়িকার আচরণ এবং কাহিনী হতে মনে হয় না কৈশোরক হেলাফেলা ছাড়া জীবনের অন্য কোনো দিক্ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলা চলে "নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙালী যুবা—কাজ কর্ম্ম নাই, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও কোর্ট-শিপ।" আর নাট্যকারদের সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি প্রযোজিতব্য।

বাংলা নাটকের এই দুরবস্থার কয়েকটী ঐতিহাসিক কারণ আছে। গানে ও কবিতায় বাঙালার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তার রুচিবোধ যথাযথ ও কান অভ্যস্ত। এ ক্ষেত্রে গানে বা কবিতায় আপেক্ষিক অগ্রগতি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাঙালার এই উচ্ছ্বসিত প্রতিভা নাটকীয় বন্ধনে বাঁধা পড়তে স্বতঃই বিমুখ, সেই কারণে নাটক বলতে আমাদের সুদূর অতীতের পৌরাণিক যুগ বা মোগল যুগে ফিরে যেতে হয়, একটা অস্বাভাবিক চড়া সুরে গলা সাধতে হয়, না হয় কৈশোরক প্রেম-লীলায় আবদ্ধ থাকতে হয়, না হয় 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে অস্বাভাবিক নিউরটিক হতে হয়। সাহিত্যে এবং নাটকে এগুলির স্থান নেই এমন নয়, কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা ছাড়া স্বাভাবিকতার কোনো স্থানই যখন নাট্যসাহিত্যে মেলে না তখন নাটকের স্বাস্থ্যেই সন্দিহান হতে হয়। বাংলা কবিতার বর্তমান স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তর্ক চললেও এটুকু সর্ববাদিসম্মত যে সেক্ষেত্রে যদি বা অস্বাস্থ্য ঘটে থাকে তা হলেও সেটা জীবন সম্বন্ধে সচেতনতার ফলে, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে উদাসীন থাকার ফলে নয়। একালের বাংলা নাটকের প্রধানতম দুর্ঘটনা এই যে, জীবন সম্বন্ধে কোনো সচেতনতার পরিবর্তে একটা অস্বাভাবিক 'নাটকীয়' জগৎ রচনাই তার চরম লক্ষ্য। সিনেমা রেডিও রঙ্গমঞ্চ—কোনোটাই এ দোষ হতে মুক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে এই দুরবস্থা হতে নাটককে মুক্তি

দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নাটক তাঁর কাব্যের ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তাঁর নাটকগুলি বহু সময়ে সামাজিক বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হলেও তার প্রকাশরূপ একটা বিশিষ্ট ভাবগত ভঙ্গীর। তাঁর নাটকগুলি নাটকের পুঁথিগত লক্ষণ কতদূর মেনে চলেছে সে কথা পণ্ডিতদের বিচার্য, তবে সম্ভবতঃ এ কথা বলা চলে যে তাঁর নাটকগুলি মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ-নির্বহণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নয়, তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে একটা ভাবকেই নানা রঙে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা প্রবলতর। এর ঝোঁক নাটকের চেয়ে কবিতার দিকেই বেশী এ কথা বলা চলে।

এইখানে তাঁর কাব্যনাট্য অর্থাৎ নৃত্যনাট্যগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। নৃত্যনাট্যগুলি নৃত্য, নাট্য এবং কাব্যের ত্রিবেণীসঙ্গম, এবং এ তিনটাই সমান অপরিহার্য হওয়ার ফলে এর কোন্ অঙ্গটা প্রধান সে কথা বলা কঠিন হয়ে ওঠে। 'বিশুদ্ধ' নাচের দিক্ থেকে বলা চলে নাচ এখানে কথার অধীন, যদিও অনেক সময়ে নাচের সঙ্গে তাল রেখে কথা রচিত হয়েছিলো বলে প্রসিদ্ধি আছে। নাচের বাঁধা চালকে অস্বীকার করার ভঙ্গীই সম্ভবতঃ এর জন্য দায়ী। কিন্তু কবিতার দিক্ থেকে এর মধ্যে একটা নতুন বাঁধন মুক্তির আভাস মেলে। কবিতার দিক্ হতে বলা যায় 'বলাকা'য় ছন্দের যে বন্ধন মোচন হয়েছিলো, 'পরিশেষ'-পরবর্তী যুগে তাতে আরো একটা নতুন সুর লেগেছিলো—সে রস এখানে সম্পূর্ণ বর্তমান। বরং এগুলির মধ্যে আমরা আরো বেশী কিছু পাই, লাইনগুলি আরও ভাবসমৃদ্ধ, সংহত, তীক্ষ্ণ, তাদের চিত্ররূপ আরও নিবিড়তর, কবিকর্ম আরও চমৎকার। তার সঙ্গে সুরের রস সংযুক্ত, কবিতার সঙ্গে গানের মিলন ঘটলো অথচ এমনভাবে ঘটলো যাতে নাট্যরূপের সহায়তাই হলো, বিরুদ্ধতা হলো না। অবর দর্শকের জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধুর্য এবং অভিনয়ের রস নেই তা নয়, আর যে সহজ অথচ তীক্ষ্ণ লাইনগুলি এর উপাদান সেগুলি কেবল অনুকম্পায়ীরই বোধগম্য তাও নয়। এগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দান, এ ত্রিবেণীসঙ্গম

সহজলভ্য নয়, কিন্তু তবুও এগুলি প্রচলিত নাট্যরীতির বিরুদ্ধে উজ্জ্বল বিদ্রোহ হয়েই থাকবে কিন্তু ভবিষ্যৎ ঐতিহ্যের জন্ম দেবে না।

রঙ্গমঞ্চের বর্তমান ভাবালুতার মোড় ফিরিয়ে বলিষ্ঠ ঐতিহ্যে দাঁড় করানোর প্রয়োজন ঘটেছে। শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর নাটকগুলি, বিশেষতঃ "মৌচাকে ঢিল", সেদিকে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। আর নাট্যকারদের সঙ্গে অভিনেতা ও অভিনয়ের রীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখও বাহুল্য।

৪

অবনীন্দ্রনাথের আগে বাংলায় এবং ভারতবর্ষে ছবি বৈদেশিক অনুকরণে ব্যস্ত ছিলো। সে যুগে বৈদেশিক প্রতিভাতেও ভাঁটা ধরেছিলো, ভিক্‌টোরীয় যুগে কেবল বাহ্য সৌন্দর্যে আর্টের অপমৃত্যু ঘটতে বসেছিলো। এই অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ইম্‌প্রেসনিস্টিক চিত্রকলার রূপ গ্রহণ করে—কোনো একটা দৃশ্যের সমগ্রতার চেয়ে আসলে তার যে অংশগুলি চোখে পড়ে সেগুলির দাম বেশী এ সত্য তখন স্বীকৃত হলো। রেমব্রাঁর ছবিতেও এই ধরণের আভাস মেলে, কিন্তু এ সত্য তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন নি, তাই তাঁর মধ্যে আলো ছায়া আছে কিন্তু রঙের পুনরাবিষ্কার নেই। ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রকরেরা রঙের পুনরাবিষ্কার করেছিলেন, কেন না আপাততঃ যেটা একরঙা তার মধ্যে যে নানা রঙের খেলা চলছে সেই কথাটীকে ধরাই তাঁদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো। তারপর ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিল্পকলায় যে বিবর্তন দেখা দিলো সেগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের বিবর্তনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রকলার পরেই উদ্ভব হলো পোস্ট-ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রকলার। তাঁদের মতে প্রথম দর্শনেই দৃশ্যগুলির সত্য রূপ পাওয়া যায় না, প্রথম দর্শনের পর মনে যে ভাবের উদয় হলো সেই ভাবটিই প্রথম দর্শনের চেয়ে অধিকতর সত্য। এর ফলে বর্ণসমারোহ এবং নিবিড়তর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া গেলো, কিন্তু সংহতির অভাব

ঘটলো। সেই সঙ্গে কবিশিক্ষার অস্বীকৃতির ফলে ব্যক্তিক স্বৈরাচারের সুযোগও ঘটলো। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মনোবিকলনতত্ত্বের প্রচলন একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিল্পীরা স্বকীয় মনের গহন হতে নানা জিনিস আবিষ্কার করতে শুরু করলেন, যে দর্শক ওগুলি অনুভব করেন নি তাঁর পক্ষে সেগুলির যথাযথ সংস্থাপনা সম্ভব নয়। পোস্ট-ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রকরেরা আবার কোনো সময় সংগঠনের পুনঃপ্রচেষ্টা করেছিলেন, মাতিসে, রুসো প্রভৃতির decorative ও জ্যামিতিক চিত্রকলা এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ—কিন্তু তাঁদের প্রধান ধারা সে পথে অগ্রসর হয় নি। মনের গহনে কি আছে, সংহতির মূলে কিসের বিচিত্র সমাবেশ আছে তারই অনুসন্ধানে আর একদল চিত্রকর কিউবিস্ট চিত্রকলায় হাজির হলেন, আর এক দল চিত্রকর গতিবেগের চিত্ররূপ দিতে ভবিষ্যৎপন্থী দলে নাম লেখালেন। তাঁদের প্রথম ঘোষণা-পত্রিকায় এই নীতি প্রচার করা হয়েছিলো—

1. Our desire for the truth no longer contents itself with form and color as heretofore understood.

2. What we wish to reproduce on the canvas is not an instant or a moment of immobility of the universal force that surrounds us, but the *sensation of that force itself*.

3. As a matter of fact everything moves, everything runs, everything transforms rapidly. A profile is never before us, but it appears and disappears without ceasing. Given the fact of the momentary persistence of the image on the retina, objects in movement multiply, change form and follow like vibrations in space. A running horse has not four legs, but twenty, and their movements are triangular.

4. Nothing is absolute in painting . . . we declare, for example, that a portrait should not resemble its sitter, and that the painter carries in his own imagination the landscape he wishes to place upon the canvas.

5. To paint the human figure it is not necessary to paint the *figure* but simply to give its *envelopment.* Space does not exist. . . . In our work we can secure effects similar to those of the X-ray. Opacity does not exist . . .

6. The construction of pictures up to this time has been stupidly traditional. Painters have always shown things and persons *before* us. We place the spectator *in the midst* of the picture.

Heretofore we have looked *at* pictures ; it is the idea of the Futurist that we should look *through* them, that the pictures should give us *new vision* of life and thigns new sensations, new emotions . . .

এঁদের বিদ্রোহ আপাততঃ শ্রুতিমধুর, কিন্তু এর ইঙ্গিত আশাপূর্ণ নয়। কার্যক্ষেত্রে এঁরা এক ধরণের force-line আবিষ্কার করলেন, এঁদের প্রচেষ্টা ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রকলার বিপরীত ভঙ্গার, দ্বিতীয় নীতিতে তার আভাস মেলে, কিন্তু আসলে এঁদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিক মনের অন্তস্তল হতে নানা অসংলগ্ন জিনিসের রূপ দেবারই প্রচেষ্টা। পশ্চিমী কাব্যের মতো চিত্রকলাও এ দিকে আরো অগ্রসর হয়েছিলো, সুর-রিয়ালিস্ট চিত্রকলা, দাদা-পন্থা, তাৎলিন-পন্থা প্রভৃতি তার প্রমাণ। দালির চিত্রকলাও এই পন্থারই অন্যতম, নতুন আঙ্গিক হলেও নতুন ঐতিহ্য তার অন্তর্গত নয়। দাদা-পন্থা বিশেষ কৌতূহলজনক। চিত্রকর

ৎসারার উদ্দেশ্য ছিলো নতুন নতুন উত্তেজনার প্রবর্তন। শুধু চিত্রকলাতে নয়, কাব্যেও। একটা দাদা-পন্থী কবিতার নমুনা এই—

a e ou o youyouyou i e ou o youyouyou
drrrdrrrdrrrgrrrgrrrgrrr
bits of green duration flutter in my room
a e o i ii i e a ou ii ii belly
ambran bran bran and restore
center of the four
beng bong beng bang . . .

—*Tristan Tzara*

এই ধরণের কবিতা ও চিত্রকলার বাস্তবিক কোনো উদ্দেশ্য ছিলো, কি একটা বিরাট্ ব্যঙ্গ ছাড়া এগুলির আর অন্য কোনোই উদ্দেশ্য ছিলো না সে সম্বন্ধে এখনও কেউ নিঃসন্দেহ ন'ন। আসলে, গত মহাযুদ্ধের কাছাকাছি পশ্চিমী শিল্পীরা যে ক্রমেই অন্তর্মুখীন হয়ে চলেছিলেন এগুলি তারই নানা চিহ্ন। অত্যন্ত সাম্প্রতিক চিত্রকলায় এবং বিশেষতঃ ভাস্কর্যে এই ক্ষয়িষ্ণুতা হতে উদ্ধার লাভের চিহ্ন মেলে, নতুন স্থাপত্যেও নবজীবনের সন্ধান মিলেছে।

আমাদের দেশের চিত্রকলায় এই ভাঙনের ছোঁয়াচ লাগেনি তা নয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে সময় ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন তখন বাংলা দেশ ভাববন্যায় সঞ্জীবিত, বৈদেশিক সংস্পর্শ পরিহার করে স্বদেশী ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টাই তখন প্রবল। অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথায় অবস্থাটা এই,—

> স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হোলো আমার ছবির জগতে। তখন বাজনা করি, ছবিও আঁকি—গানবাজনাটা আমার ভিতরে ছিল না, সেটা গেল—ছবিটা রইল। ছবি দেশী মতে ভাবতে হবে, দেশী মতে দেখতে হবে। রবিবর্মাও তো দেশী মতে ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু

> বিদেশী ভাব কাটাতে পারেন নি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হোলো আমার পালা। বিলিতী পোর্টেট আঁকতুম, ছেড়েছুড়ে দিয়ে পটপটুয়া জোগাড় করলুম। যে-দেশে যা-কিছু নিজের-নিজের শিল্প আছে, সব জোগাড় করলুম। তারপর দেশী মতে দেশী ছবি আঁকতে শুরু করলুম। বিলিতী আর্ট দূর করে দিয়ে দেশী আর্ট ধরলুম। তারপর স্বদেশী যুগ, দেশের আবহাওয়া, এ-সব হচ্ছে সুবাতাস। সেই সুবাতাস ধীরে ধীরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলল। (ঘরোয়া, ২১ পৃষ্ঠা)

অবনীন্দ্রনাথ তার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ এগিয়ে চল্‌লেন রঙের, বিষয়বস্তুর, কৌশলের,— নানা ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম যুগের ছবির রঙের ঔজ্জ্বল্য শেষের যুগের ছবিতে নেই। অবশ্য গগনেন্দ্রনাথ শুরু হতেই এ ভাববিপ্লবের বাইরে। তাঁর চিত্রকলায় পশ্চিমী প্রভাব আরও সুস্পষ্ট ; সেই প্রভাবের সঙ্গে একটা নিজস্ব আঙ্গিক মিশিয়ে তিনি ছবির যে নতুন পদ্ধতি রচনা করেছিলেন সেটি চমৎকার হলেও এই ভাবাদর্শ হতে বিভিন্ন। অবনীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ নন্দলাল বসুর চিত্রকলায় বিবর্তিত, বরং অগ্রসর। আরও অনাড়ম্বর সরলতা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা decorative রেখাভঙ্গী, এগুলি যেখানে আমাদের প্রাচীন চিত্রাদর্শ হতে সংগৃহীত সেখানেও একটা নতুন ঐতিহ্য রচনার সহায়তা করেছে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা যে মনোভঙ্গী হতে উদ্ভূত ছবিতেও তার সন্ধান মিলেছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা উল্লেখযোগ্য। হুমায়ুন কবিরের মতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ভাব-উৎস তিনটা।

> "অবচেতনার গহ্বর থেকে সংবেদনা ও অভিজ্ঞতাকে সচেতন প্রকাশের ক্ষেত্রে আবিষ্কারই প্রতিভার কাজ, এবং সে অর্থে জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রতিভার মধ্যেই শিল্পীস্বভাবের পরিচয় মেলে। এ আবিষ্করণ সর্বত্র সজ্ঞাগ বা সচেতন নয়, কিন্তু তার ক্রীড়ায় অবচেতনকেও চেতনার সীমানায় নিয়ে আসে। স্বভাব-

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনায়ও যে তারই পুনরাবৃত্তি হবে, তাতে বিচিত্র কি ? তাই রবীন্দ্র-চিত্রে গণমানসের অন্তর্লীন যে চিত্রকথা মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাদের বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা কেটে গেলে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনও কঠিন নয়। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের পদ্ধতি আদিম মানুষের চিত্রাঙ্কনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকে আবার সবিস্ময়ে বলেন যে, এ চিত্রাঙ্কন-রীতি ইয়োরোপের অধুনাতন শিল্পীদের নতুনতম পরীক্ষা ও প্রয়াসের সমধর্মী। ··· ইয়োরোপে সংস্কৃতির আজ যে সঙ্কট, আত্মবিভক্ত শ্রেণীবিদ্বেষের জাতীয় সংগ্রামে যে সংহার মূর্তি, তার ফলে শিল্পীচিত্ত বহুস্থলে সে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত বহিঃপ্রকাশ ও রূপকলাকে অস্বীকার করে সভ্যতানিরপেক্ষ আশ্রয় খোঁজে। বর্তমান ইয়োরোপের অধুনাতন চিত্ররীতির সঙ্গে আদিম মানুষের চিত্রপদ্ধতির সাদৃশ্য তাই একেবারে আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়া নয়, এবং প্রতিক্রিয়া নয় বলেই তার মধ্যে আশ্বাস ও ভরসা এত বেশী। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম-বিলাসী ও মোগল ভারতের পৌরসভ্যতাসিঞ্চিত চিত্ররীতি ভিন্নও ভারতবর্ষে যে সনাতন লোক-শিল্পের ধারা, স্বভাব শিল্পীর প্রতিভায় তার মূলসূত্র তাঁর মনে ধরা পড়েছে। ত্রিধারার এই সমন্বয় জাতির চিরন্তন জীবনের মধ্যে প্রোথিত বলেই তাই তাঁর চিত্ররীতিতে এত শক্তি এবং দার্ঢ্য।"

(বাঙলার কাব্য, ৭৯ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথের চিত্রে ঐ ত্রিধারার সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে হয় না, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বিশেষতঃ লোকশিল্পের ধারা তাঁর ছবিতে রূপায়িত এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যামিনী রায়ের অভিমত "রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন ইউরোপীয় আঙ্গিকে"—এবিষয়ে অধিকতর সত্য। তাঁর 'চিত্রলিপি'র ছবিগুলিও এই কথার সাক্ষী। অনুভূতির তীব্রতা বাড়ানোর জন্য নতুন আঙ্গিকের আমদানি হয়েছে, কিন্তু শেষে আঙ্গিকেরই প্রাধান্য স্থাপিত হলো, আর দেখা দিলো অবচেতন মনের

নানা অসংলগ্ন রূপ, যেগুলির সংযোগসূত্র কেবলমাত্র রূপকারের মনে 'চিত্রলিপি'র পাঁচ সংখ্যক ছবি কোনো পশ্চিমী চিত্রকরের আঁকা বলে ভুল হওয়া অন্যায় নয়। এই ছবিটী সম্বন্ধে তাঁর কবিতাও অর্থবহ। "ভ্রমণকারী মন, ভ্রমণকরার তীর্থ তাহার আপন ঘরের কোণ।" পরের ছবি ও তার কবিতাটীও একই ভঙ্গীর, স্বপ্নের কথা বাইরে প্রকাশেই তাদের সার্থকতা। এগার সংখ্যক ছবি সম্বন্ধে কবি স্পষ্টই বলছেন—

কে জানে কার মুখের ছবি কোথার থেকে ভেসে
ঠেকল অনাহূত আমার তুলির ডগায় এসে।
সাইকো এনালিসিস যোগে ইহার পরিচয়
পণ্ডিতেরা জানেন স্পষ্ট, আমার জানা নয়॥

দ্বিতীয় ছবিটী সম্বন্ধে কবির ব্যাখ্যা এই—

বাউল বলে খাঁচার মধ্যে আসে অচিন পাখী,
তেমনি, মনের পোড়ো বাসা
সেথায় করে যাওয়া আসা
অচিনরূপের কোন্ রহস্য ডাকি নাই-বা ডাকি।

এতোখানি আঙ্গিকসর্বস্বতা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো সৃষ্টিতে নেই। তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যের সঙ্গে তাঁর ছবির তুলনা সম্পূর্ণ অচল। তাঁর কাব্যের শেষ পর্যায়ে নেতিবাদের চরম রাবীন্দ্রিক অতিক্রমণের পরিচয় আছে, কিন্তু ছবিতে তা নেই। কবিতার বেলা রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেন নি,—

টুকরো যত রূপের রেখা
সঞ্চিত রয় মনের চিত্রশালে।
কখন ছবির আকার নিয়ে
জোড়া লাগায় শিল্পকলার জালে॥

—চিত্রলিপি, ১৬নং চিত্র

রূপের রেখা জুড়ে শিল্পকলার জাল রচনা তাঁর কাব্যের পদ্ধতি নয়, সেখানে পদ্ধতি বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের রচনায় আঙ্গিক

অলংকার ও ভাব যদি "অহংপূর্বিকয়া" ভিড় করে আসে তবুও আঙ্গিককে-ই ভিত্তি করে ফাঁক পূরণের কাজ তাঁর কখনই নয়। কিন্তু ছবিতে সেই ভঙ্গীরই আভাস মেলে। এমন কি, বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন্‌টীতে সবচেয়ে অ-ভারতীয় এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর ছবি। এই ছবিগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় তার মধ্যে কবির-বর্ণিত ত্রিধারার কোনোটীই নেই। প্রাচীন ভারতীয় যে ধারার আভাস অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' প্রভৃতি ছবিতে মেলে, মোগল বা রাজপুত ছবির ধারাও যে নানা সাম্প্রতিক চিত্রকরের মধ্যে পুনরাবিষ্কৃত, তাদের কোনোটীই এদের মধ্যে নেই। আর ভারতীয় লোকশিল্পের ধারাও এগুলিতে দেখা দেয় নি, বরং এগুলির মধ্যে বিদেশী ছবির সাম্প্রতিক ঐতিহ্যই প্রবলতর এ কথা নন্দলাল বসু বা যামিনী রায়ের ছবির পাশাপাশি এ ছবিগুলি স্মরণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবু রবীন্দ্রনাথের ছবি আমাদের ছবির ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। গগনেন্দ্রনাথ পশ্চিমী ভঙ্গীর সঙ্গে এদেশী মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংমিশ্রণে যে নতুন ধরণের ছবি এঁকেছিলেন তার পরে রবীন্দ্রনাথ ছবিকে এদেশী মিস্টিক প্রভাব হতে মুক্তি দিয়ে তার মধ্যে বিদেশী ভঙ্গীর প্রবর্তন সহজতর করেছিলেন। যদি পশ্চিমী ভঙ্গীর ভাঙন-ধরা ছবির বহুলতর প্রচলন এদেশে ঘটবার সম্ভাবনা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের ছবির গুরুত্ব বাড়বে এ ভবিষ্যৎ-বাণী কঠিন নয়।

কিন্তু আপাততঃ বাঙালী ছবির ধারা সেদিকে নয়। ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত প্রথম ভঙ্গী ছাড়িয়ে আসার প্রয়োজন ঘটেছে এ কথা অনেকেই অনুভব করেছেন, এমন কি অবনীন্দ্রনাথও করেছেন। বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলির অবনীন্দ্র-সংখ্যায় (May-Oct., 1942) প্রকাশিত তাঁর কয়েকটী একালের ছবি হতে সে কথা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার যে ছবিটী তাতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে একটী নতুন ভঙ্গীর চিহ্ন সুস্পষ্ট। আর কতকগুলি দেওয়াল-চিত্র হতেও এ কথাটা অনুভব করা যায়। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর তাঁর

'কুটুম-কাটুম'গুলি। অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ করার জন্যে তাঁকে ক্যাণ্ডিন্স্কি প্রমুখ চিত্রকরের Improvisation প্রভৃতি ত্রয়ী পরিকল্পনার শরণাগত হতে হয় নি, কিন্তু এমন একটী বাহুল্য-বর্জিত প্রকাশদীপ্ত ভঙ্গী এগুলির মধ্যে আছে যেগুলি বিশ্ব-চিত্রের দরবারে নতুন। ভারতীয় লোকশিল্পের সন্ধান এইখানে মেলে। আমাদের পট ও মূর্তি প্রভৃতিতে বহুসময় এমন একটী অনাড়ম্বর সারল্য অথচ অসাধারণ ভাবদ্যোতনার পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির ঐতিহ্য মনে থাকলে ঐরকম একটী নতুন পন্থা আবিষ্কার সম্ভব। কিন্তু এদিকে অসাধারণ নৈপুণ্য ও স্থায়ী গৌরবের দাবী যামিনী রায়ের। মোগল রাজপুত প্রভৃতি কোনো সাড়ম্বর চিত্রকলাতেই তাঁর মন মজে নি, লোকশিল্পের পুনরাবিষ্কারই তাঁর মহত্তম কীর্তি। আমাদের লোকশিল্পের মধ্যেও সময়ে সময়ে আশ্চর্য কলাকৌশল থাকে, সেগুলির দিকে চোখ খুলে দেওয়া যথার্থ শিল্পীর কাজ। ফিউচারিস্ট চিত্রকরেরা বলেছিলেন ছুটন্ত ঘোড়ার কুড়ি পা; আমাদের দুর্গা-প্রতিমা দশভুজা কিন্তু তার কাঁধ দশটা নয় একটাই কাঁধ, এর অর্থ কি? তা ছাড়া নানা বাহুল্যবর্জনের ফলে লোকশিল্পে একটা intensity দেখা দেয় যেটাকে একালের ছবিতে লাগাতে পারলে প্রকৃত নতুন চিত্র সম্ভব। যামিনী রায়ের চিত্রকলায় এগুলির সন্ধান মেলে। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর খ্যাতির অন্য কারণ আছে। বর্তমান সমাজে যে ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন নানা দিকে প্রবল হয়ে উঠছে, যার ফলে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতিতে একটা নতুন সুস্থ আদর্শ স্থাপিত হবার পূর্বে নানা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, সাময়িক পদস্খলন, অন্তর্মুখীনতা, অসংলগ্নতা ও অন্যান্য অনিবার্য বিপদ দেখা দিয়েছে, যামিনী রায় আশ্চর্য কৌশলে সেগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। ফলে তাঁর চিত্রে নবজন্ম আছে কিন্তু নবজন্মের বেদনা নেই। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা কি ভাবে ঘটলো বলা চলে না,—সম্ভবতঃ অতি-পাণ্ডিত্যের হাত হতে অব্যাহতি, লোকশিল্পের আসল রহস্যের সঙ্গে গভীর একাত্মতা এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পীমনই

তার জন্য দায়ী। কিন্তু যে সুস্থ আদর্শ তিনি চিত্রে রচনা করেছেন কবিতা গান বা অন্যান্য আঙ্গিকে সাম্প্রতিক শিল্পীরা ততোদূর অগ্রসর হন নি, বা হলেও ওরকম নির্বেদনায় অগ্রসর হতে পারেন নি। এ মত হয়তো সর্ববাদিসম্মত নয়, কিন্তু বিচার করলে এ মতে পৌঁছনো ছাড়া উপায় থাকে না। যামিনী রায়ের সার্থকতা আরো বেশী এই কারণে যে তিনি যে আদর্শ রচনা করেছেন সেটি পলায়নী মনোবৃত্তির ফল নয়, ভবিষ্যৎ কালেরই আদর্শ। সুতরাং এ আদর্শ কেন বৈদেশিক আমদানি নয়, ভারতীয় লোকশিল্পেরই আত্মীয় একথা সহজেই বোঝা যায়। কোনো ভারতীয় চিত্রকর ক্যাণ্ডিনস্কি বা দালির নব সংস্করণ আঁকলে তাঁকে নতুন চিত্রকর বলা হয়তো চলে, এদেশের মানস আদর্শ ঐ ভঙ্গীর হলে ঐ চিত্রকর কিছু সার্থকতার দাবীও করতে পারেন, কিন্তু যামিনী রায়ের মতো সার্থক তিনি নিশ্চয়ই ন'ন। নবযুগের আগমনের সময় নানা পথবিভ্রান্তি ও মতবিরোধ স্বাভাবিক, তাতে নানা পরীক্ষা এবং নানা উদ্ভাবনও স্বাভাবিক, তাতে ভবিষ্যৎকালের দরকারী জিনিসও হয়তো বহু পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে, তবু তার বাঁধন ভবিষ্যতের চেয়ে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গেই বেশী। সাম্প্রতিক কবিতা বা অন্যান্য ভাবরূপে যে নতুন হাওয়ার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেগুলির মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকলেও অনেক সময়েই নবযুগের ঊষার আলোর চেয়ে গতযুগের রাত্রিশেষের অন্ধকারের ছায়াই বেশী। যামিনী রায়ের ছবির মধ্যে সে ঊষার নিঃসন্দেহ সন্ধান মেলে একথা ক্রমেই নিঃসংশয় হয়ে উঠবে, যদি না যামিনী রায় অকারণে সাম্প্রতিক বৈদেশিক ভঙ্গীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঙালীসুলভ আত্ম-অপ্রত্যয়ের আর একটা পরিচয় দেন। বৈদেশিক গুরু আমাদের অনেক সময় নিষ্প্রয়োজন নয়, কেন না আমাদের সমাজগঠনও ক্রমশঃ সেইদিকে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও বিদেশ আমাদের কাছে ভবিষ্যতের পাঠ গ্রহণ করতে পারে, যামিনী রায় তার অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং যেখানে বৈদেশিক পণ্ডিতেরা বাস্তবিকই

তুলনায় প্রতিবিপ্লবী বা পশ্চাৎপদ শুধু পশ্চিমের মোহে তাঁদের অনুকরণ বা অনুসরণ আরো সার্থক এবং আরো অগ্রসর শিল্পীর পক্ষে অপমৃত্যুর কারণ একথা বলা বাহুল্য। যামিনী রায়ের কোনো কোনো ছবিতে এরকম দুর্ঘটনার সামান্য আভাস দেখা গিয়েছে আশঙ্কা হয়, সেই জন্যেই একথার অবতারণা।

৫

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা, ছবি, গান ইত্যাদি আলোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই ফরমূলা প্রযোজ্য না হলেও তাদের গতি ও ভঙ্গীর মধ্যে কতকগুলি জায়গায় মিল এবং কতকগুলি কারণে অমিল আছে। এগুলির মধ্যে প্রধান মিল এই যে, আমাদের সমাজে নতুন ভঙ্গী ও নতুন হাওয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে এগুলিতেও নতুন হাওয়া লেগেছে, পরিবর্তনটা আকস্মিক নয়, তার একটা মৌলিক কারণ আছে। এই পরিবর্তনের প্রধান নায়ক আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ, মধ্যবিত্ত মানসেরই বিভিন্ন প্রকাশ ঐ আঙ্গিকগুলিতে। অমিলের কারণও যথেষ্ট, কেন না এ আঙ্গিকগুলিরও এক একটা স্বকীয়তা আছে, তাছাড়া প্রত্যেক দেশের মতো এদেশেও ওগুলির এক একটী বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে। এ ছাড়াও প্রত্যেক দিকে সমান প্রতিভাবান শিল্পীও জন্মান নি, সাম্প্রতিক ভাস্কর্যে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায় দূরে থাক্ ক্ষুদ্রতর প্রতিভার সন্ধানও মেলে না। দু-একজন ছাড়া একালে বাঙালী ভাস্কর কেউ আছেন কি না জানা নেই। আর বাঙালী স্থপতিদের রুচিগত বর্ণসাংকর্য সময়ে সময়ে অত্যন্তই দৃষ্টিকটু। সমাজ বিবর্তিত হচ্ছে, সাহিত্যও বিবর্তিত হচ্ছে, প্রতিভা অন্য ভঙ্গীতে প্রকাশিত হচ্ছে, রুচিবোধ বদলাচ্ছে—এগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। আর তার মধ্যে কবিরা শিল্পীরা স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়ও দিচ্ছেন, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে তাঁরা প্ল্যাটিনাম খণ্ড হয়ে যান নি বরং ত্রিশির কাঁচই আছেন—সেই

কারণেই আমরা একাধারে এককালে বিভিন্ন ভঙ্গীর শিল্পীর সন্ধান পেয়েছি।

সুতরাং একটা বিষয়ে নৈরাশ্যবাদীরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। বর্তমানে কবিতা বা শিল্পের যদি সমগ্রভাবে কিছু দুরবস্থা ঘটে থাকে সেটার প্রধান কারণ সমাজ। কবিরা এখনও অচেতন হননি সচেতনই আছেন, তাঁদের সচেতনতা এই ভঙ্গী ছাড়া প্রকাশ না পেলে অন্য কথা। তার মূল সমাজে। নানা পথভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাহতে প্রমাণ হয় পথখোঁজা চলছে। অচেতনতার চেয়ে এ অবস্থাও ভালো সন্দেহ নেই।

তা হলে এখন একটা কথা বিবেচ্য : আমাদের শিল্প ও কাব্যের ভবিষ্যৎ কি? সামাজিক বিবর্তনে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? সাহিত্যের নবজন্ম কিভাবে ঘটে, এখন তার সম্ভাবনা কতটুকু? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বারবার নবজন্ম ঘটেছে, এবারকার নবজন্ম সম্বন্ধে পূর্ব ইতিহাস থেকে কোনো নির্দেশ মেলে কি না।

সাহিত্যের নবজন্ম

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যে সময় তার মনের গাঙে হঠাৎ জোয়ার দেখা দেয়—নতুন নতুন দিকে তার চিত্তের উন্মীলন হতে থাকে। এই উন্মীলন শুধু সাহিত্যে নয়, তার চিত্তবৃত্তির সব ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। সব দিক্ দিয়ে একটা নতুন সাড়া জাগে, প্রতি দিকেই নতুন নতুন রূপ দেবার চেষ্টা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই রকম সন্ধিক্ষণকে শুধু যুগ-পরিবর্তন বলা চলে না, তাকে বলতে হয় যুগান্ত। কিন্তু সাধারণ যুগান্তের সঙ্গে এ যুগান্তের একটি পার্থক্য আছে। প্রত্যেক যুগের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিবর্তনের অলঙ্ঘ্য নিয়মে আর একটা যুগ দেখা দেবেই, কিন্তু তাতে এই চিত্তবৃত্তির উন্মীলন হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই উন্মীলনের জন্য কতকগুলি বিশেষ ঘটনার প্রয়োজন যা সব সময়ে পাওয়া যায় না। এই জন্যই এই রকম যুগান্ত সমাজবিবর্তনের সাধারণ নিয়মে আসে না, তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষ একটা ঘটনা-সংস্থান না হলে তা সম্ভব নয়।

এই রকম বিস্ময়কর যুগান্ত পৃথিবীর সমস্ত প্রাণবান্ জাতির ইতিহাসে কখনও না কখনও এসেছে। মধ্যযুগের পর পশ্চিমে রেনাশাঁসের যে স্রোত এসেছিল, কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতি দিকেই তার প্রতিফলন অনিবার্য। বরং বলা চলতে পারে সে যুগে জীবনের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুযোগ মিলেছিল, অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যিক প্রথার শুরু হল, মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধ ভেঙে পড়ল কিন্তু একটা নতুনতর সংহতি ক্রমশঃ গড়ে উঠছিল—ঠিক এমনি একটা মুহূর্তে নীরস ধর্মযাজনার পরিবর্তে প্রাচীন রসধারার দিকে নজর পড়াতেই রেনাশাঁস সম্ভব হয়েছিল। সমষ্টি ও ব্যষ্টির জীবনে পরিবর্তন

না হলে এদিকে পুনরুজ্জীবন হয়তো সম্ভবই হত না, চিত্রকলা অনাদৃত পড়ে থাকতো, স্থাপত্যে কোন নতুন ধারার আশা করা চলতো না। বস্তুতঃ সে হিসেবে সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ বিচিত্র। এ দুয়ের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নিখুঁত ভাবে নিরূপণ করা সব সময়ে সহজ নয়।

সেইজন্য সমাজের অগ্রগতি চক্রপথেই হোক্ বা কম্বুরেখায় হোক্, কখনো কখনো এমন একটা সময় আসে যে সময় অগ্রগতির জন্য মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সমাজের ভিত্তি নাড়া খায়। ঠিক সে সময় যদি কোন নতুন জীবনের আস্বাদ আমাদের সামনে উপস্থিত হয় আমরা তখন আমাদের সমাজের গোড়ার কথা সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করি। এই চিন্তা সব সময়ে সজ্ঞানে হয় না, কিন্তু পরিণামে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। ক্রমশঃ বোঝা যায় ইমারতের ভিতে ফাটল ধরেছে, আর মেরামতে চলবে না, এবার ইমারতটাই বদলানো প্রয়োজন। কিন্তু যে ইমারত নতুন গড়ে তুলতে হবে তার গঠন-সৌষ্ঠব নির্ভর করে ভালো কারিকর পাওয়া গেল কি না তার উপরে। পূর্বেই বলেছি ভাল কারিকর সব সময় মেলে না। কোনো কোনো যুগান্তের মধ্য দিয়ে একটা বৃহত্তর যুগের সূচনা কি ভাবে বা কোন্ সময়ে সম্ভব হয় বাংলা সাহিত্যের এ কালের ইতিহাস থেকে তার আলোচনা করা চলতে পারে। এই আলোচনা পূর্বে নানাপ্রসঙ্গে কিছু কিছু করা হয়েছে, কিন্তু তা ধারাবাহিক নয়। কিছু কিছু পুনরাবৃত্তির ভয় থাকা সত্ত্বেও এ আলোচনা সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয় হবে না।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলে আমরা মোটামুটি যে বাংলা সাহিত্যের আওতায় মানুষ তার গোড়াপত্তন ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে। প্রাচীনকালের বাংলার যে যে বিশেষত্ব ছিল এই সময়ে তা পরিবর্তিত হল—একটি নতুন সাংস্কৃতিক আদর্শ ক্রমশঃ রূপ নিতে

শুরু করল। যে সময় মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহারথীদের জন্মগ্রহণ হয়তো সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। নবোদ্ভিন্ন প্রতিভা কাব্য, নাটক, উপন্যাস সব দিকেই তার পরিচয় দিতে শুরু করেছে। তা ছাড়া সে যুগে রঙ্গালয়ের প্রসার ঘটেছিল তা হতে এই কথাটা অন্ততঃ প্রমাণিত হয়, সে সময় বাঙালী সমাজে একটি নতুনতর সংহতির আভাস ছিল। তা না হলে শুধু নাটক রচনা নয়, রঙ্গালয়ের প্রসার সম্ভব হত না। ভাষার সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের কথায়

> "নতুন যুগের জোয়ার আসে কোন এক একজন মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মনে জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র ··· বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক-প্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে।"[১]

বাস্তবিক, সে যুগের এই বিকাশ বিস্ময়কর। সে যুগে যে গোড়াপত্তন হল সে কেবল সাহিত্যে নয় সমাজেও নিজের আসন বহুদিন দৃঢ় রেখেছিল,—এমন কি তার প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ নয়। সে সময় বাংলা সাহিত্যে ও সমাজের প্রতি দিকেই নতুন যুগ ও নতুন প্রতিভার ছাপ পড়েছে; সে সময় চিত্তবৃত্তির উন্মীলন প্রায় সম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য শুধু ঔপন্যাসিক ন'ন, সেকালের ভাববিদ্রোহের সর্বাঙ্গীণ মূর্তি।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে নিরুদ্বিগ্ন ছিলাম, এমন সময় এলো রবীন্দ্রনাথের যুগ। ভাষার আদর্শে রবীন্দ্রনাথও বহুদিন বঙ্কিম-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন যদিও তাঁদের ভাবগত ঐক্য প্রথম হতেই খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ্য করার জিনিস, যে সময়ে

১। বাংলা ভাষা পরিচয়, ৩৭ পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথের যুগ শুরু হল সে সময় বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আর একটী পর্বের শুরু হয়েছে। জাতির স্তিমিত মনে স্বাদেশিকতার জোয়ারের যে কলরব শোনা যাচ্ছিল সে ধ্বনি যেন রবীন্দ্রনাথের কলমের অপেক্ষায় ছিল। তাই সে সময় রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গান, কবিতা, প্রবন্ধের সূচনা হল, সেই সঙ্গেই আমরা চিত্রকলায়, স্থাপত্যে আবার আর একটী নতুন আদর্শের সন্ধান পেলাম, আমাদের রুচি, কার্যক্রম নবতর পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, নাট্যকার, সুরকার, গীত-রচয়িতা, রাজনীতিক, জননেতা—একাধারে সবই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এলেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সেই সময় দেখা মিললো অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পালের—যাঁরা স্বদেশী আন্দোলনের মূল প্রদেশের মাটীতে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালার জীবনপ্রবাহে আর একটী মোড় দেখা দিল, তার সামনে নতুন নতুন দৃশ্য, তার দু পাশে নতুন তটভূমির অভিঘাত।

সেই সময় থেকে সমাজবিবর্তনের পথে আমরা বর্তমানে যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে আবার আমাদের থামতে হয়েছে। এ যুগের নিদারুণ সংঘর্ষ আমাদের সমাজকে যে গভীর আঘাত করেছে তাতে আমাদের সমাজের ভিত্তি টলমল। এই সংঘর্ষের অবসানে আমরা দু-একটী ক্ষতচিহ্ন নিয়েই মুক্তিলাভ করব—এ আশা দুরাশা। এর সুদূরপ্রসারী ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে—এ শঙ্কা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। সেই জন্য আমরা পুনরায় একটা যুগান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি, যে যুগান্তের পর আমাদের সাহিত্য ও সমাজ কি রূপ ধারণ করবে তা প্রত্যেক সাহিত্যরসিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরই আলোচনার বস্তু। সে হিসেবে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দুটী পুনরুজ্জীবনের পরিচয় মেলে। প্রথমটী উনিশ শতকের গোড়ায়, এবং দ্বিতীয়টী উনিশ শতকের শেষ ভাগ হতে বিশ শতকের গোড়ায়। এই দুটী পুনরুজ্জীবনের রূপায়ন ও কারণ হতে তৃতীয় সংকটের উপর কিছু আলোকপাত হতে পারে।

৩

ম্যাক্‌স ওয়েবার বা ফ্রান্‌জ্‌ ওপেনহাইমার প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকদের মতে সমাজবিন্যাসের কতকগুলি আদর্শ রূপ আছে। এই রূপগুলি হয়তো বাস্তব জগতে খুঁজে না পাওয়া গেলেও তারা সমাজ-বিশ্লেষণে সহায়তা করে। তাঁদের মতে এই রূপগুলির মধ্যে দুটী খুব বড়ো—একটী গোষ্ঠীমূলক সমাজ, অপরটী ধনতান্ত্রিক সমাজ। এ দুটীর আদর্শ অবস্থায় এরা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। কারণ, গোষ্ঠীমূলক সমাজের আদর্শ রূপায়নে গোষ্ঠী বা সমষ্টির অধিকার বৃহত্তর। ধনতান্ত্রিক সমাজের মত তাতে ব্যষ্টির অধিকারই চরম কথা নয়। চিরাচরিত রীতি বা ঐতিহ্য তখনও বিতাড়িত হয় নি, চুক্তিবদ্ধ সমাজের নিদর্শন তখনও পাওয়া যায় না। এই সংহতির শ্রেষ্ঠতাই গোষ্ঠীমূলক সমাজের মূলসূত্র। কিন্তু গোষ্ঠীমূলক সমাজের অবনতির সময় দেখা যায় সংহতির নামে শ্রেণীস্বার্থ বদল-চেহারায় রাজত্ব করছে, বৃহত্তর কল্যাণের প্রকৃত অনুভূতি নেই কিন্তু সেখানে বৃহত্তর কল্যাণের নামে দুর্বলের উপর অত্যাচার আছে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষীণভূয়িষ্ঠ অবস্থায় অর্থনৈতিক দুর্দশাও তীব্রতর, কেন না যে ছোট ছোট বাণিজ্যগোষ্ঠী সমাজের হিতসাধনে তৎপর ছিল, লুকোনো শ্রেণীস্বার্থের অত্যাচারে তার সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকদের এক সময়ে ধারণা ছিল যে, গোষ্ঠীমূলক সমাজের পর ধনতান্ত্রিক সমাজেরই অভ্যুদয় হবে, কেন না জন্মগত অধিকারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত অধিকারই প্রগতির পরিচায়ক। কালক্রমে এ মতবাদের দুর্বলতাও আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু এর আংশিক সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। মার্কস লিখেছিলেন, ইতিহাসে বুর্জোয়ারাই সবচেয়ে বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু সে আরও পরের যুগের কথা। আমরা যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করছি সে সময় শুধু বাংলায় নয়,—প্রায় সারা জগতেই

এই দু রীতির সমাজবিন্যাসে জীবনমরণ সংঘর্ষ বেধেছে। তবুও বাংলা বা ভারতবর্ষে এ সংঘর্ষের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম ঢেউ যখন এদেশে এসে পৌঁছল তখন গোষ্ঠীসমাজ এদেশে মৃতপ্রায় নয়। বরং পশ্চিমে রাষ্ট্র যে কাজের ভার গ্রহণ করেছিল সে ভার এখানে সমাজের উপর ছিল, তাই রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ভাবেও আমাদের অভাব অভিযোগ পরিপূরণ করা বহুদিন সম্ভব হয়েছিল। সেইজন্য এই বিভিন্ন রীতির সভ্যতার সংঘর্ষ এদেশে প্রবলতর। সেইসঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। যাঁরা এদেশে পশ্চিমী সভ্যতার দূত হয়ে এলেন তাঁরা আমাদের নিজের দেশের লোক নন, তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় এদেশে বসবাস করেছিলেন। সেজন্য যদি বা সে যুগে অন্তরের তাগিদে পশ্চিমী সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা কোন কারণে সম্ভব হত, এক্ষেত্রে তা হল না, বিদেশীর সাম্রাজ্যলিপ্সা তাদের সভ্যতার বাণীকে রক্তরঞ্জিত করে তুলেছিল।

আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলার সামাজিক অবস্থা মোটামুটি এই। প্রাচীন যুগের সামন্ততন্ত্র তখন ধ্বংস-প্রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেও সেকালের বাবুদের বর্ণনা করতে হলে বলতে হত "ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"[২] সে সময় সাংস্কৃতিক অধঃপতনও চূড়ান্ত। আর্থিক ঋদ্ধিই সামাজিক প্রতিপত্তির একমাত্র ছাড়পত্র।

> কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না।[৩]

প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের এই দুরবস্থার সময়ে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন।

২। ১৮২১ সালের বর্ণনা। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

৩। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

সে সময় নানা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজে যে বিভিন্ন আঘাত লেগেছিল তার মধ্যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্ভবতঃ প্রধানতম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে কর্নওয়ালিসের সময়ে নয়। এর প্রথম আবিষ্কর্তা হেস্টিংসের মন্ত্রণাদাতা ফ্রান্সিস। ৫ই নভেম্বর, ১৭৭৬ তারিখে ফ্রান্সিস যে স্মারকলিপি রচনা করেন তার কিছুদিন পূর্বেই অ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nations প্রকাশিত হয়েছে। সেইজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে একটা নতুন সামন্ততন্ত্র গড়বার চেষ্টা থাকলেও বাস্তবিক পক্ষে সেটা পুরোনো সামন্ততন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তি নয়, দুয়ে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমটা সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় উদ্ভূত, দ্বিতীয়টা সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট। প্রথমটার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের দোষগুণ সবই আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা জন্ম হতেই পঙ্গু, তার মধ্যে এমন কি প্রকৃত বলিষ্ঠ অনাচারের চিহ্নও কখনো পাওয়া গেল না। প্রথমটার অর্থ-নৈতিক ভিত্তি আধা-সামাজিক, কিন্তু দ্বিতীয়টার মূলে চুক্তির প্রাধান্য, প্রাচীন সামাজিক ভিত্তির বিপর্যয়েই তার জন্ম। সে কারণে তার মধ্যে শুরু হতেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। যে গ্রন্থের ফলে অন্য দেশে শিল্পযুগের আবির্ভাব হয়েছিল সেই গ্রন্থ এখানে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে জমিদার-শ্রেণী সৃষ্টি করলে, অর্থনীতির নবসূত্রকে বিকৃতভাবে কাজে লাগবার চেষ্টা হল। সেইজন্য নব সামন্ততন্ত্র কখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায় নি। তার পরিচয় বহুপূর্বেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

> সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহ পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি হইত এক্ষণে বৎসর ২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ··· কলিকাতাস্থ অনেক বড় বড় ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাঁহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নাম মাত্র আছে।[৪]

৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩৭—১৩৮ পৃষ্ঠা।

কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা যায়—

> শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাসলীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেবলোকের দিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল … ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কএক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্রণ্ডীয়েরা সে স্থানে একত্রিত হইতেন তাহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম … ক্রমে ক্রমে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশীল হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।"

সেইজন্য সেকালে

> "সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটীর মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতেন আমাদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন না।"

সেইজন্য আয়ার্ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষের জন্য কলিকাতায় চল্লিশ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া গেলেও সেকালে যাঁরা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঙ্গাযাত্রা করতেন তাঁদের আশ্রয়ের জন্য গঙ্গাতীরে কোন ঘর ছিল না।[৫]

এই যে যুগের কথা আলোচনা করা হল সে যুগ বঙ্কিমচন্দ্রের এবং তার সহকর্মী ও সমধর্মীদের অনেকেরই জন্মের আগে। কিন্তু সে সময়েই দেখতে পাওয়া যায় একদিকে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও প্রাচীন সমাজ ধ্বংসপ্রায়, অন্যদিকে যে নতুন সামন্ততন্ত্র গড়বার চেষ্টা হল সে সামন্ততন্ত্রও অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল, সাম্রাজ্যবাদ হতে উদ্ভূত,

৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড—১৫০ পৃষ্ঠা।

যুগধর্মের বিরুদ্ধগামী। কাজেই সে সামন্ততন্ত্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিয়মে—কেবলমাত্র কিছু কিছু অর্থবিতরণ ছাড়া—সমাজের অগ্রগতির কোনো অপরিহার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। এই সময় ভারতবর্ষের সমাজের সামনে ঘন অন্ধকার। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিক নির্ণয় হচ্ছে না—ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ান ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। প্রাচীন সভ্যতা লুপ্তপ্রায়, কেন না তার ভিত্তি ভেঙে পড়েছে অথচ পশ্চিমী সভ্যতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ তার ভিত্তিও এদেশে গড়ে ওঠা তখন সম্ভব ছিল না। এর পরেই মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগরের জন্ম। তাঁদের সাহিত্য রচনাই শুধু যে জাতির অন্তর্নিহিত আকুলতার বাণীমূর্তি তাই নয়, তাঁরা যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যে পারিপার্শ্বিকে দিন কাটিয়েছিলেন তাতে সে সময় সমস্ত জাতির মানসিক পুনরুজ্জীবন ঘটানো তাঁদের পক্ষে সহজ হয়েছিলো। এর জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

পূর্বে যে দুটি ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সে ছাড়াও কয়েকটা শ্রেণী ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল। এঁদের মধ্যে কেউ বা সরকারী চাকুরে, কেউ বা নতুন ধনী হয়েও কেন্দ্রচ্যুত হননি। এঁদের সামনে তখন প্রসারের যুগ, বিস্তৃতির সম্ভাবনা। কথাটা শুধু অর্থনৈতিক দিক্ দিয়েই প্রযোজ্য নয়। ইংরেজী শিক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছে, চারপাশে ক্ষয়িষ্ণুতার কালো ছায়ার পরিবর্তে নবদিনের নতুন উষা। এই প্রসারের উল্লাসই এই নবশ্রেণীর অন্তর্নিহিত প্রেরণা। কিন্তু সেই উল্লাসের বিভিন্ন রূপ। কখনও সেই উল্লাস উচ্ছ্বসিত, হয়তো একটু বেশী পরিমাণে উচ্ছ্বসিত, এমন কি, সন্দেহ ধরায় তার ভেতর ফাঁকা কি না। কোথাও বা সেই উল্লাস সংযত গম্ভীর, বরং তার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পারায় উপহাস বক্রোক্তির অপ্রাচুর্য নেই, সেইজন্য সংস্কারের চেষ্টাও পদে পদে। ভবিষ্যতে বিশ্বাস হারালে সংস্কারের চেষ্টা দেখা যায় না।

সম্প্রতি কোনো সমালোচক লিখেছেন, "রামমোহন নূতন বাংলার প্রথম মানুষ, আর মধুসূদন নূতন বাংলার প্রথম কবি।"[৬] কথাটি একাধিক দিক দিয়ে সত্য। মাইকেলের কাব্য আলোচনা করলে দেখা যাবে এই নতুন যুগের সমস্যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, যেখানে অনুপ্রাণিত করেনি সেখানেও বিরোধমুখে তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মীলনে সহায়তা করেছে, কাব্যরচনায় উপাদান যুগিয়েছে। তাঁর দুটী নাটকের মধ্যে তিনি স্পষ্টতঃই প্রশ্ন তুলেছেন সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে, কাকে সভ্যতা বলে সে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা জেগেছে। অর্থাৎ সমস্যাটা মৌলিক। তাঁর কাব্যকলার মধ্যেও এই সমস্যার ছায়া আছে। সংক্ষেপে বলতে হলেও তাঁর কাব্যের কয়েকটী জিনিসের উল্লেখ করতেই হয়। প্রথমতঃ মাইকেল মহাকাব্য লিখবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, মহাকাব্য রচনাই তাঁর কবি-জীবনের আদর্শ। কিন্তু মহাকাব্য রচনা সেই কবির পক্ষেই সম্ভব যাঁর প্রাণধারায় সমুদ্রের মহোচ্ছ্বাস আছে, যাঁর ভাবাবেগ গীতিকবি-দের চেয়েও গভীরতর, বিশালতর, বিস্তৃততর। তা ছাড়াও, মহাকাব্য রচনার জন্য প্রয়োজন একটী আত্মপ্রত্যয়ের যা স্বকীয় কবিধর্মের প্রতি আস্থা এনে দেবে, জীবনের মূল কেবল নেতিবাদেই লুপ্ত হতে দেবে না। কিন্তু এর প্রথম কথা প্রাণধারার মহোচ্ছ্বাস। এ কবিধর্ম মাইকেলের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, কেন না, সে যুগে এদেশে যে নবঅরুণোদয়ের আশা হয়েছিল মাইকেল কেবল সেইটাকেই দেখেননি, যুগ-দুর্লভ সংস্কৃতির যে আস্বাদ তাঁর ছিল তার ফলে তিনি সেই প্রেরণাকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন। এই জন্যই মহাকাব্যের প্রয়োজন। তাঁর দ্বিতীয় বিস্ময়কর আবিষ্কার অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এর আঙ্গিকের কৌশল বা ধ্বনিমাধুর্যের কথা এখানে বিচার্য নয়, কিন্তু যে ভাব তাঁর মহাকাব্যে কল্লোলিত হতে

৬। মাইকেল মধুসূদন : জীবন ভাষ্য—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত—১ পৃষ্ঠা

চেয়েছিল তাঁর ছন্দ তার উপযুক্ত বাহন। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার এবিষয়ে বিস্তৃত এবং সুগভীর আলোচনা করে দেখিয়েছেন এর মধ্যে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও তা বস্তুতঃ খাঁটি বাংলা —সেটী তাঁর ভাবগৌরবের অত্যন্ত সংহত কিন্তু শালীন আধার। আমাদের প্রচলিত ধারণা, পশ্চিমী শিক্ষায় উন্মত্ত মাইকেল বাংলা কাব্যে কেবল বিদেশী কাব্যের আস্বাদ চালাতে চেয়েছিলেন। এ ধারণা যদি আংশিক সত্য বা হয়, সম্পূর্ণ সত্য কখনই নয়। 'মেঘনাদ বধ' রচনার সময় তিনি এদেশী কাব্যরীতির একনিষ্ঠ অনুবর্তন সব সময়ে করেননি, কিন্তু সে যুগের পণ্ডিতসমাজ সব সময়েই একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে ছিল—তাঁদের তিনি কখনই ভুলতে পারেননি। কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়। লক্ষ্য করার কথা, তিনি পশ্চিমী কাব্যের আস্বাদ চালাতে চাইলেও তাঁর কাব্য বাংলার নাড়ীর টান থেকে বিচ্যুত নয়; ভাষার গঠন, শব্দবিন্যাস, বলার ভঙ্গী,—বহুদিক থেকে তার এমন বৈশিষ্ট্য আছে যাতে মনে হয় সেকালের লেখার ভাষায় ও কাব্যে বা সাহিত্যে যে আড়ষ্ট ভাব এসেছিল মাইকেল হঠাৎ বৈপ্লবিক শক্তিতে সেই বাঁধ ভেঙে দিলেন, ওদেশের ঢেউ মাথায় করে এদেশের বাণীবন্যা উদ্দাম হয়ে উঠল, অমিত্রাক্ষরের তটভূমিতে তার উচ্ছ্বাস ধরে কি না ধরে।

এই পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ের চেষ্টা শুধু যে একাধারে মাইকেলের শক্তি ও দুর্বলতার উৎস তাই নয়, সেযুগের সমাজ-সমস্যারও মূল রহস্য। কারণ, শুধু যদি ভাঙনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলে অবক্ষয়ের কবিরই সন্ধান মিলবে, মহাকাব্যের কবির নয়। কিন্তু কোন নতুন সমন্বয়ের আশা কবি বা সমাজের সামনে থাকলেই রসধারার পুনঃপ্রবাহ সম্ভব, মহাকাব্য রচনা সম্ভব, সমাজমনের পুনরুজ্জীবন সম্ভব। মাইকেলের জীবনের রহস্যও সম্ভবতঃ এইখানে। তিনি যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন সেগুলি সেকালের ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন। মোহিতলালের ভাষায় "মধুসূদন যে অর্থে আমাদের দেশের

প্রথম আধুনিক কবি, সে অর্থে আধুনিক ভাবাপন্ন পাঠক ঐ যুগের শেষেও দেখা দেয় নাই।" ৭ সেইজন্য মধুসূদনের কাব্যে সর্বদাই একটা অদৃশ্য বাহ্বাস্ফোট আছে। তিনি লিখেছিলেন "As for the old school nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit", কিন্তু যে সহৃদয় পাঠক-সমাজের মধ্যে কবি তাঁর স্বরূপ খুজে পান সে সহৃদয় পাঠকসমাজ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। "As for the new school, the poor devils do not know Bengali enough to understand what they read." সেইজন্য মাইকেলের কাব্যে বিদ্রোহী বলিষ্ঠতা বা নতুন সৌরভ থাকলেও তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ হবার অবসর পাননি—সে যুগে যে সংকট দেখা দিয়েছিল সেই সংঘর্ষে তিনি স্ফুলিঙ্গের মতই জ্বলে উঠলেন কিন্তু কোন গভীর বা ব্যাপক সমন্বয় সম্ভব হল না। তবুও বাংলা সাহিত্যের নবযুগে সেই প্রথম স্ফুলিঙ্গ, তার মধ্যে সংহতি বা শান্তি না থাকলেও তেজ আছে, শক্তি আছে, হয়তো একটু অনাবশ্যক পরিমাণেই শক্তি আছে—যদিও বহুকালের আবর্জনা দূর করার জন্য সে শক্তির সবটুকুই দরকার ছিল কি না কালের ব্যবধানে সে সম্বন্ধে নির্ভুল মতপ্রকাশ আমাদের পক্ষে নিতান্তই কঠিন।

সে যুগের সমাজেও এই দ্বন্দ্ব চলেছিল। সে যুগের সংবাদপত্রে তার প্রচুর নিদর্শন ছড়ানো আছে। একটা নতুন সভ্যতা ও নতুন যুগের আভাস মিলছে কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে তা সফল হচ্ছে না। সেইজন্য সেসময় সমাজনেতৃত্বে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অর্থাৎ এমন একটা শ্রেণী পাওয়া গেল যার চিৎ-প্রকর্ষ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অনাবিল দৃষ্টি এই সমন্বয়ের অনুকূল। তা না হলে বাঙালার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন হয়তো সম্ভব হত না।

৭। শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৪৯২ পৃষ্ঠা

সেইজন্য মাইকেলের পরই বৃহত্তম পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। এক হিসেবে সে যুগের মধ্যে তিনি অনন্য, কেন না সেই যুগের প্রকৃত স্বরূপ অন্য কোন সাহিত্যিক বা নেতার কাছে এরকম স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নি। বঙ্কিমের সমাজ মাইকেলের সমাজ হতে বিভিন্ন। সে সময় পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা চলছে, সন্দেহ জেগেছে যে ধারায় সমাজপদ্ধতি বা জীবনপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তার সবটাই হয়তো গ্রহণীয় নয়, কোথায়ও ফাঁক থেকে গেছে। এই সন্দেহ এবং আত্ম-জিজ্ঞাসাই বঙ্কিম-যুগের বড়ো কথা। সে সময়কার রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যার ছাপ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে। সে যুগের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ইতিহাসের কথা সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৫৭ হতে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের নির্লজ্জ বণিক্-বৃত্তির যুগ। কিন্তু ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই কথাটা প্রকট হয়ে উঠল যে, শোষণ যদি করতেই হয় তবে তার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাই ভালো, আপাততঃ স্বর্ণডিম্বের আশায় মুরগীর বিনাশ সাধন পরিণামে ক্ষতিকর। সেইজন্য ১৭৯৩ সাল হতে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে সমস্ত আইন হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য জমিদারের সহায়তা করা। ১৮১৯ সালের পত্তনী রেগুলেশন, তার একটা বড়ো উদাহরণ। কিন্তু ক্রমশঃ এই শ্রেণীস্বার্থ এরকম আত্মপ্রকাশ শুরু করলে যে, শ্রেণীনির্মাতাদেরও থমকে দাঁড়াতে হল, মনে হল এভাবে চললে সেই মুরগীরই বিনাশলাভের সম্ভাবনা। গত শতকের মাঝামাঝি রেণ্ট য়্যাক্ট ও তারপর গ্রেট রেণ্ট কেস এইদিকে সবপ্রথম নজর ফেরালো। কিছুদিন পরেই এলো দাক্ষিণাত্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, যার ফলে ডেকান রায়তস্ কমিশন। বাংলাদেশে রেণ্ট ল' কমিশন নিযুক্ত হল ; পরে ঐ কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়ায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন রচিত হল (১৮৮৫ সাল)। ইতিমধ্যে রাস্তা ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের জন্য সেসের প্রবর্তন আর একটা

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কর্নওয়ালিশ আশা করেছিলেন জমিদারেরাই জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করে চাষের সুবিধা করতে উৎসাহিত হবেন, কিন্তু দেখা গেল সে আশা সফল হয় নি। সেইজন্য গবর্নমেণ্টকে সে ভার গ্রহণ করতে হল, যদিও এই সেসের প্রবর্তন একদল আইনজ্ঞের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলনীতির সঙ্গে আইনতঃ মেলে না। কিন্তু ইতিহাসের চাপ আইনের চেয়ে বড়ো। সুতরাং সমাজে যে দাবী অগ্রাহ্য হবার উপায় ছিল না আইন কেবল সেই দাবীর ন্যূনতম পরিপূরণেই ব্যস্ত ছিল, তার বেশী কিছু সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই ঘটনাবলী হতে দুটী কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, উনিশ শতকের গোড়ায় যে আশা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে সে আশা ভঙ্গ হয়েছে, সেইকারণে সামাজিক চিন্তাধারা আবার একটী নতুন মোড় নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বোঝা গেল, যে মূলনীতিতে সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদের সমাজবিবর্তনের অন্তর্নিহিত প্রেরণার সঙ্গে তার সংঘাত বেধেছে, ফলে সে মূলনীতিরও ব্যর্থতা, আমাদের সমাজেরও অঙ্গহানি। সেইজন্য সন্ধান পড়লো প্রাচীন যুগের সমাজের, তার মধ্যে এর কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কি না, তার সাহায্যে নতুন কোন সমন্বয় সম্ভব হয় কি না। ঠিক এমনি সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ও সাহিত্যরচনা।

সেকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও ঠিক অনুরূপ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি। বুদ্ধিমান লোকদের কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে সকৌতূহল উচ্ছ্বাসের মোহ না থাকলেও সাধারণ পাঠকসমাজ সে মোহ কাটাতে পারে নি। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে পরানুকরণস্পৃহার উপর তীব্র আঘাত করতে হয়েছে। সেকালের বাবুদের বিদ্রূপ করতে হয়েছে, সেকালের প্রচলিত সাংস্কৃতিক আদর্শকে পরিহাস করতে হয়েছে। 'লোকরহস্য'-এর উচ্চশিক্ষিত বাবু স্ত্রীকে বলেছিলেন, "ছাইভস্ম বাঙ্গালাগুলো পড় কেন?" আর তাৎকালিক সমালোচনার উদাহরণ দিতে তিনি লিখেছিলেন, "বোধ হয়-রামায়ণ শব্দটী 'রামা যবন' শব্দের

অপভ্রংশ মাত্র।" এগুলি শুধু নিছক পরিহাস নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক ধারায় যে নিষ্প্রয়োজন যবনতা প্রবেশ করেছিল এগুলি তাকেই উপহাস। এ দৃষ্টিভঙ্গীই বঙ্কিমযুগের রেনাশাঁসের মূলতত্ত্বের সন্ধান দেয়। মাইকেল আমাদের পৌরাণিক কাব্যকাহিনীকে ব্যবহার করেছিলেন কোন আত্মিক ভাবসাদৃশ্যের জন্য নয়, কেবল তাঁর বক্তব্যের উপলক্ষ্য হিসেবে, তাঁর আবেগের আধার স্বরূপে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তা নয়। বৈদেশিক সভ্যতাকে এদেশের মাটীতে মেলাবার পূর্বে তিনি একটা নতুন কেন্দ্র খুঁজেছিলেন এবং সেই কেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির নব্যরূপে। তার আনন্দমঠের পরিকল্পনা এই মানসিক সংকট হতে উদ্ভূত। তাঁর বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, তিরস্কার, উপহাসের কারণ এইখানে খুঁজে পাওয়া যায়। "পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু?... তখন হিন্দুকে মনে পড়ল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি"—এ সমস্ত উক্তি শুধু আকস্মিক নয়, বঙ্কিম-সাহিত্যে এগুলি গভীর অর্থবহ।

কিন্তু আমাদের সেইসঙ্গে সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন সংস্কৃতিকে যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন তা নিছক প্রাচীন রূপ নয়। বস্তুতঃ সে চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মত সমাজ-সচেতন লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না—তাঁর পারিপার্শ্বিকও সে প্রচেষ্টার অনুকূল ছিল না। সেইজন্য তাঁর মধ্যে দুটা বিরোধী ধারার সমন্বয়ের চেষ্টা। তিনি তাঁর স্বকীয় ভিত্তি খুঁজে পেলেন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে, কিন্তু সেই ভিত্তিতে যে ইমারত গড়ে উঠল তার মধ্যে বিদেশী স্থাপত্যের আভাস ছিল। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বর্তমান সম্বন্ধে কখনই উৎসাহী নন, সে যুগের সমাজের উপর তার কটাক্ষ

অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে। ঠিক এই কারণেই কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে, কি ধর্মতত্ত্বে তাঁর দৃষ্টি অতীত হতে ভবিষ্যতে যাওয়া-আসা করছে, একদিকে সেই মোহময় উচ্ছ্বাস অপর দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী —এ দুয়ের সন্ধানই তার মধ্যে মিলবে। সমাজবিবর্তনের ধারায় জাতি একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতির ভাঙন অন্যদিকে বিদেশী সংস্কৃতির আক্রমণে দিকভ্রান্ত হচ্ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিবর্তন ধারার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন তাঁর সমন্বয়ে। তাঁর রচনা হতে দু একটা ইতস্ততঃ উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। প্রথমে তাঁর ধর্মতত্ত্ব।

> To return to my definition of Hinduism. It will exclude as I have advanced, much that is popularly considered to be a portion of Hinduism even by Hindus themselves ··· It is precisely popular delusions of this sort that have encrusted Hinduism with the rubbish of ages ··· the noxious parasitic growth must be exterminated before Hinduism can hope further to carry on the education of the human race. Hinduism is in need of reformation ··· but reformed and purified, it may yet stand forth before the world as the noblest system of individual and social culture available to the Hindu even in this age of progress ··· to such reformation, it is by no means necessary that we should revert, like the late Dayananda Saraswati to old and archaic types. That which was suited to people who lived three thousand years ago, may not be suited to the present and future generations. Principles are immutable but the modes of their application vary according to time, to cirmumstances ·· let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new

> life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life.
>
> (*Letters on Hinduism, Letter No. II*)

সেইজন্য কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতায় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানব চরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।" উদ্ধৃতি বাহুল্যের অনবসর, কিন্তু সম্ভবতঃ এই কথাগুলি হতেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। তেমনি তাঁর রাষ্ট্রনীতি। তিনি যে সময়ে আনন্দমঠ রচনা করেছিলেন সে সময় আনন্দমঠের ধর্মরাজ্যের পরিকল্পনায় স্বদেশপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হলেও তার মূলে আছে প্রাণের আবেগ, কিন্তু সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

> সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"
>
> তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।" সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

'জলধারা বহিতে লাগিল' হয়তো এইটাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণের কথা। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি-বৈকল্য তাঁর প্রাণের কথাকে পরিপূর্ণ প্রাধান্য লাভ করতে দেয় নি, সেইজন্য তাঁর অন্য প্রবন্ধগুলিতে রাষ্ট্রনীতির নতুন রূপ। সেখানে তিনি নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদেশী শাসক ও স্বদেশী শোষকের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, ফলে মিল, বেন্থাম, কোঁতের শিষ্য হয়েও তাঁকে 'সাম্যে' পৌঁছতে হল। "সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান।" এই অপ্রাকৃতিক বৈষম্য শুধু জেতা ও বিজিত, জমিদার ও চাষীর মধ্যে নয়, স্ত্রীপুরুষের অধিকারভেদে, বর্ণ বৈষম্যে— সব স্থানেই। কিন্তু "আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে,

সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়।” তিনি আরও লিখেছিলেন “প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সংস্কার যে সম্ভব হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না।··· দ্বিতীয়তঃ, সমাজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ।” (সাহিত্য-পরিষৎ-কৃত বঙ্কিম শতবার্ষিক-সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা) এই তাঁর সমন্বয়ের নবরূপ। নতুনের জোরকে অস্বীকার করা তখন আর সম্ভব ছিল না, কিন্তু তার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য তখনও নাড়ীতে বাধে, তাই সে প্রাধান্য স্বীকার করতেও আটকানো স্বাভাবিক। সেইজন্য কোনো যুক্তিতর্কেই প্রাচীনের যেটুকু সমর্থন করা চলে না সেটুকু বঙ্কিমচন্দ্র ছেঁটে ফেললেন, তার সঙ্গে মেলালেন নতুনকে। এ যেন এ দেশের মাটির উপরে ওদেশী বন্যা বহানো। তার ফলে উর্বর পলিমাটী পড়বে, না, পুরোনো মাটীও বালি-চাপা পড়ে রুক্ষ ধূসর হয়ে উঠবে এইটেই পরের যুগের সমস্যা হয়ে উঠলো। স্বদেশী যুগের ভাবরূপের বীজ এই সমস্যার মধ্যে।

৪

পূর্বে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কি সংকট এসেছিল এবং সেই সংকট মাইকেল ও বঙ্কিমের প্রতিভাকে কি ভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল তারই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এইখানে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, সে যুগের সংকটের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা এবং একটী নতুন সমন্বয়ের সন্ধান দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় সম্ভব হলেও তাতে শুধু তাঁরই চিত্তের পুনরুজ্জীবন না ঘটে সমাজের মনেও একটী পুনরুজ্জীবন

আসবে কেন ? অর্থাৎ কি সে কারণ যার ফলে কবির হৃদয়শতদলের উন্মীলন সমাজের মানসিক অবস্থারই প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় ; কি সে সামাজিক ঘটনাসংস্থান যার ফলে কবি সমসাময়িক যুগের কেবল স্রষ্টা না হয়ে প্রতিভূরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন ? ব্যক্তিমানসের উজ্জীবন কি ভাবে সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করতে পারে ? এই কথাটা বিশেষ ভাবে আলোচ্য, কেন না, তা না হলে আমরা হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পেতে পারি কিন্তু জাতির অন্তরের সঙ্গে তাঁদের কি সম্বন্ধ তা সঠিক বুঝতে পারবো না।

বলা বাহুল্য, মধ্যে মধ্যে জাতির মনে যে পুনরুজ্জীবন ঘটে, সেই পুনরুজ্জীবনের চেহারা বিভিন্ন সময়ে এক নয়। কোন একটা সময়ে কোন একটা বিশেষ ঘটনাবিন্যাসে কোন একটা বিশেষ প্রতিভার আবির্ভাবে সংস্কৃতির যে রূপায়ন হয়—সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে তার অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়তো কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেন না ঠিক ঐরকম যোগাযোগও বারে বারে হওয়া প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য সেকালে যা ঘটেছিল, পরবর্তী যুগের উপর তার প্রভাব পড়লেও সম্ভবতঃ তার নিখুঁত পুনরাবৃত্তি আর হবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় সামাজিক গঠন এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যক্রমে একটা নতুন ধারা দেখা দিয়েছিল। সামাজিক দিক দিয়ে তার সার্থকতা যথেষ্ট। কারণ একদিকে পঙ্গু সামন্ততন্ত্র, অন্যদিকে অত্যাচারিত কৃষকশ্রেণী—এ দুয়ের মাঝখানে ক্রমশঃ এমন একটা শ্রেণী গড়ে উঠল যারা ইংরেজ-সাম্রাজ্যের সেই প্রসারের যুগে বাংলা হতে পাঞ্জাব পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রের অবাধ সুযোগ পেয়েছিল তাই নয়,—তারা এই পূর্ব ও পশ্চিম, প্রাচীন ও অর্বাচীনের সংঘাতের মানসপুত্র। সেইজন্য একদিকে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা ছিল না, সামন্তযুগের পিতৃপুত্রাদিক্রম ছাড়িয়ে তারা স্বকীয় বুদ্ধির জোরে সমাজপ্রাধান্য লাভ করেছে। অন্যদিকে তাদের মনে সে যুগের সংকট সর্বাপেক্ষা বেশী সাড়া তুলেছে, কেন না

সেই সংকটেই তাদের জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।" এ কথা শুধু সাহিত্য নয়, সে কালের সমাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় পুরাতনের গর্ভে যখন এই নতুনের জন্ম হয়, তখন সেই জন্মশেষে কেবল যে পুরাতনই ক্রমশঃ লোপ পায় তাই নয়, নতুনের চোখ ফুটতেও কিছু সময় লাগে। ফলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকা সত্ত্বেও নতুন কিছুদিন দিশেহারা—সে এক মুহূর্তেই তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝে যাত্রাপথ খুঁজে নিতে পারে না। এই সময়ে যদি কোন মনীষার আবির্ভাব হয় যিনি এই দৃষ্টিবিভ্রমের মধ্যে পথ নির্দেশ করতে পারেন, তা হলে সেই মনীষার রচনায় জাতি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, আবার জাতির প্রাণস্পন্দ সেই মনীষাকে উদ্বুদ্ধ করে,—সেইজন্য প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকেই একাধারে তাঁর যুগের স্রষ্টা ও প্রতিভূ; এ দুটা দিকের কোন্‌টা বেশী হয়ে উঠবে বাস্তবিক সেইখানেই প্রতিভার পরিমাপ।

বঙ্কিমচন্দ্র যে জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে সে যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি-সংকটের আভাস মেলে। পক্ষান্তরে তিনি যা রচনা করলেন সেই রচনা সেকালের নবজাত মধ্যবিত্ত সমাজকে তার স্বরূপ খুঁজে পেতে সাহায্য করল, দিশেহারা অবস্থায় একটা ভিত্তির সন্ধান দিলে। এই ভিত্তিটাও অবশ্য সেকালের চিন্তাধারার ঠিক অনুযায়ী। যে সমন্বয়ের কথা সে যুগে জাতির মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল আশা জাগিয়েছিল, সে সমন্বয়ের মূল এ যুগের দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের সমন্বয়ের মত বাহ্য বস্তুতে নিহিত ছিল না, তার মূল ছিল প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তিতে। অর্থাৎ শ্রেণীসংঘর্ষ তখনও খুব প্রখর হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রও লিখেছিলেন, "যাঁহারা জমাদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।" (সাম্য, শত-বার্ষিক সংস্করণ, ২৪ পৃষ্ঠা) সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে এ সমন্বয়ের গলদ ধরা পড়লেও সেকালের

সমন্বয়ের মূল কথাটা এই ছিল যে, সংকটের প্রধান কারণ আমাদের সমাজবিন্যাসে তত নয় যতটা আমাদের চিত্তবিভ্রমে। সুতরাং সামাজিক সংস্থানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বদলে বুদ্ধির স্তরে দুটী বিরোধী ধারার সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হলেই সংকট হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এই ধারণা ছিল। সেইজন্য "সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত"; সেইজন্য শ্রেণীসংঘর্ষ আবেদন-নিবেদনে মিটবে এই ধারণা—"জমীদারসম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পবিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিনজনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারাও সেইরূপ করুন ... আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ।" সেইজন্য আমরা একাধারে পাইঃ "যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়; হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে; ... বাংলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না"; "অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই ... অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি ... অতএব বাঙালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।" সে যুগের সমন্বয় এ যুগে যতই অচল হোক্ না কেন, সে যুগের সমাজ—বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজ—ঠিক এই রকম একটী ভাবধারাই অপেক্ষা করছিল। তাদের বিভ্রান্ত চিত্তকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ করার পক্ষে এই সমন্বয় মহৌষধির কাজ করেছিল,

সেইজন্য এ সমন্বয়ের মধ্যে যুক্তিতর্কের প্রাধান্য, rationalism-এ প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা। সামাজিক ঘটনাসংস্থানের ফলে কবিদের মনে যে সাড়া জাগলো তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল দেশের চতুঃসীমা পর্যন্ত, একপ্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেয়ে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে গেল দ্রুতবেগে। গিরিশচন্দ্রের নাটক বা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে যদি কোনও সাংস্কৃতিক স্খলন থাকে, মনে রাখতে হবে সে স্খলনের মূলে আছে এদেশী দেওয়ালে ওদেশী পলেস্তারা দেওয়ার অক্ষম চেষ্টা। কিন্তু সে-ও সে যুগের স্বাধর্ম্যের দিক্‌নির্দেশ করে। যে ধারা মাইকেলে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধি-দীপ্তিতে ঝিকমিক্ করছে, সেই ধারাই ক্ষীণ হতে হতে নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রে পৌঁছল—তাঁরা কেউ বাংলার বায়রণ, কেউ অন্য কোন আখ্যায় ভূষিত হতেন, তাঁদের সেই আখ্যাগুলি যুগধর্মের ও যুগমানসের পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল তার মধ্যে, এ কারণে, কয়েকটা লক্ষণ অনায়াসলক্ষ্য। প্রথমতঃ, তাঁরা যে রীতিতে সমন্বয় করেছিলেন তা সমস্ত জাতির পক্ষে সমান প্রযোজ্য নয়—তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী সেকালের উদীয়মান শ্রেণীর উপর। অবশ্য তাঁরাই যখন সমস্ত সমাজকে বিচলিত করতে পারতেন,—যদিও স্বদেশী যুগের ভঙ্গীতে নয়, কেবলমাত্র যুক্তিতর্কে আলাপ আলোচনার সাহায্যে। দ্বিতীয়তঃ সে যুগে একটা নতুনতর সংহতি গড়ে উঠেছিল, যার জন্যে চিন্তাধারার সংক্রামণ সহজ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের যুগনিয়ন্তাদের গোষ্ঠীপতি ছিলেন—এমন একটী পরিবারবোধ এ যুগেও বিরল।[৮] তৃতীয়তঃ সে সময় কবিপ্রতিভার সঙ্গে সমাজের

৮। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়,—"আমরা কিশোরকালে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের সমারোহ দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম · · · বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্ব্বব্যাপী

গতির আশ্চর্য মিল ঘটেছে, তা না হলে সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে শুধু অবিশ্বাসী বৈহাসিকের বক্রোক্তি এবং ক্ষুব্ধ বিচলিত কবির গজমোতিমিনারে বাস—এ ছাড়া হয়তো অন্য কিছু মিলত না।

৫

এই হলো বাংলা সাহিত্য ও সমাজের প্রথম পালা। তার পরের অধ্যায় সুরু হলো বিশ শতকের গোড়ায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে। বাঙালীর হৃদয়-দুয়ার আর একবার খুললো, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে অন্যদিকে। দুয়ের পার্থক্য অদ্ভুত। এক হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়টা প্রথম অধ্যায়েরই ফল, কিন্তু দুয়ের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। বাস্তবিক পক্ষে এই দুই যুগের মাঝের সময়টাতে বাঙালীর মনে যে সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছিল, তাতে স্বদেশী যুগের নতুন আবহাওয়ায় খুব বিস্মিত হবার কারণ নেই। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসার আগে তার সূচনাটা দেখা দরকার। যদি উনিশ শতকের প্রথম ভাগকে বাঙালীর নতুন আশার যুগ বলতে পারা যায়, তাহলে উনিশ শতকের শেষভাগে আছে সেই আশাভঙ্গের ইতিহাস। আমি চুলচেরা তারিখ বিচার করছি না—সে যুগের মানসিক আবহাওয়ার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি মাত্র। মানবহৃদয়ের নানা তরঙ্গের স্থানকাল-পরিমিতির নিখুঁত বিচার সব সময়ে সম্ভব নয়—একটার ঢেউ অপরটার উপর ভেঙ্গে পড়ে, দুয়ের সামানা খোঁজা কঠিন হয়।

পূর্বেই বলবার চেষ্টা করেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যে সমন্বয়টা হলো তার মধ্যে "প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি" থাকলেও তার

প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে ... সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম একহস্ত গঠনকার্য্যে একহস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন ... একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইতেছিলেন।"

—রচনাবলী, নবম খণ্ড, ৪০০-৪০৩ পৃষ্ঠা

মূল প্রধানতঃ ছিল বুদ্ধিবৃত্তিতে। আশা ছিলো সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে কি জেতা কি বিজিত, কি শোষক কি নিষ্পেষিত, প্রত্যেকের মধ্যেই একটা শোভন সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন হবে না, তার জন্য সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই, যুক্তিতর্কই যথেষ্ট। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধি লোভকে পরাভূত করবে এই আশাই সেকালের গোড়ার কথা।)

কালক্রমে এই আশা ভঙ্গ হলো।) আর সেই আশাভঙ্গ এমন সময়ে ঘটলো যে সময় বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে সঙ্কোচন এবং সেই সঙ্গে অসন্তোষের সূত্রপাত হয়েছে। আরও লক্ষ্য করার কথা, সরকারী আইনের ফলে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যই হোক্‌ বা যে কোন কারণেই হোক্‌, এ যুগের শেষ দিকে জমিদার সম্প্রদায়ও আগের মত সরকারভক্ত নেই,—মধ্যবিত্ত সমাজ তো নেই-ই। স্যর স্যুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর A Nation in Making-এ লিখেছেন এ যুগের প্রথম দিকের কথা—

> The Indian Association was established on July 26, 1876. . . it supplied a real need. It soon focussed the public spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of the educated community in Bengal. . . . the idea that was working in our minds was that the Association was to be the centre of an all-India movement. For even then, the conception of a united India, derived from the inspiration of Mazzini, or, at any rate, of bringing all India upon the same common political platform, had taken firm possession of the minds of the Indian leaders in Bengal

সেইজন্য যখন Vernacular Press Act রচিত হলো সে সময় the

feeling was deepened by the inaction of the British Indian Association. . . . it was fortunate that the Indian Association had been formed five years before . . . it (the protest meeting convened by the Indian Association) sounded the death-knell of the Vernacular Press Act, and, what is more important, it disclosed the growing power of the middle class, who could act with effect for the protection of their interests, even though the wealthier classes were lukewarm and official influence openly arrayed against them.

যাঁরা এদেশে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হতে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং তারপরে কংগ্রেসের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন ক্রমশঃ কি করে জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি হলো এবং কি ভাবে তার চেহারা বদলালো। এ যুগের কি মানসিক আবহাওয়া ছিল সে সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> In the sixties of the last century, and even earlier, the efforts of our national leaders were directed to securing for the people of India an adequate share of the higher offices of trust and responsibility under the Government . . . the ground was now to be shifted . . . it was not enough that we should have our full share of the higher offices, but we aspired to have a voice in the councils of the nation.

এ হলো কংগ্রেসের জন্মের পূর্বের কথা। এ যুগের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই, কেবল কয়েকটী জিনিষ স্মরণীয়।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় রাজনীতির সুর পরিবর্তিত হয়েছিল। একধারে ভিক্টোরিয়ার বাণী ঘোষণা করে জনমত শান্ত করার চেষ্টা হলো বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা দিল ভারতীয়দের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। ফলে এলো আর্মস্ অ্যাক্ট এবং তাতে ভারতীয় এবং অভারতীয় সম্বন্ধে পৃথক্ ব্যবস্থা,—এলো ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, খোলাখুলি অত্যাচারের যুগ শুরু হলো। কিন্তু অন্যদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বাধিকার-সচেতন হয়ে উঠলো—কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। সেসময় হতে একটার পর একটা আঘাত পড়তে লাগলো সমাজ-সংহতির উপরে, জনমনের উপরে (যদিও জনমন বলতে প্রকৃত জন-আন্দোলন বা প্রলেটারিয়াট আন্দোলন সে সময় ছিল না), বেদনার সঙ্গে অপমান সংযুক্ত হলো। ফলে সেকালের নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগুলির মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, সন্দেহ জাগলো যুক্তিতর্কের সাহায্যে যে সমন্বয় গড়ে তোলা গিয়েছিল স্বার্থের সংঘাতের দিনেও সেই সমন্বয় বজায় রাখা সম্ভব কি না। এ সময় জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা ক্রমশঃ জাগরিত হচ্ছে, যদিও তা এতো প্রখর হয়নি যে জনসাধারণ মধ্যবিত্ত-নেতৃত্ব দূর করে নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। তারা তখন শ্রোতা ও দর্শক, তাদের মনে আন্দোলনের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি আছে, পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু তারা নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারছে না। কিন্তু তবুও অগ্নিগর্ভ অবস্থা, কারণ জাতির সেই প্রথম সর্বাঙ্গীণ জাগরণ। তারপর এলো কার্জনের আমল আর সেই সঙ্গে এলো এদেশের লোকের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি নির্মম উপহাস, এলো অপমান অত্যাচার, ফলে হঠাৎ চমক ভাঙলো, শুধু শ্রেণীবিশেষের নয়—সকল শ্রেণীরই। রাজরোষের কশাঘাত স্মরণ করিয়ে দিলো এখান হতে কিছু গ্রহণ ওখান হতে কিছু বর্জন করে যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল সে সমন্বয় অচল,—স্বার্থের প্রথম ঝড়েই সে তাসের দেশ ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে এ অভিজ্ঞতা নতুন। সেইজন্য শুধু

স্বার্থের সংঘাত বলে এটাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলো না, এ আঘাত হৃদয়ে আঘাত। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতার আভাস সে সময় মিলেছিল। ১৮৮৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেস সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—All parties combined ··· what was remarkable was that the British Indian Association, representing the landed interest, and what I may call the conservative conscience of the Community, threw themselves heart and soul into the matter ১৮৮৫ সালের ন্যাশন্যাল কনফারেন্স was convened by the three leading Associations of Calcutta—The British Indian, representing the landed interest, the Indian, the Association of the middle classes, and the Central Mohamedan Association. (হৃদয়ে আঘাত পড়ার জন্য যে জাগরণ হলো তার মূল কথাটা বুদ্ধির কথা নয়,—তার মূল কথাটা ভাবের উদ্দীপনা। সমস্ত জাতি উদ্দীপিত হলো, দিকে দিকে নব জাগরণ দেখা দিল। যে আশা পঞ্চাশ বছর আগে দেখা দিয়েছিল সে আশা ধূলিলুণ্ঠিত হলো, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা দিল একটা গভীর এবং পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির চেষ্টা, আর একবার আমাদের স্বরূপসন্ধান, আর একবার হৃদয়-শতদলের উন্মীলন।) When the public mind has been roused by some great event, it struggles for expression in all directions, in melodious songs, in passionate utterances in the Press and in enterprises which bear on them the ineffaceable mark of daring and originality ··· the moral atmosphere bceomes fruitful under the pressure of new ideas; for the mind of the whole community is at work and makes its contribution to the sum total

of national thought. (Surendranath Banerjea : *A Nation in Making*, pages 79 and 191)

৬

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে বেঁচে ছিলেন সে যুগে, বা তার পরেও, সামাজিক বা রাজনীতিক সভা পরের যুগের তুলনায় নিতান্ত মামুলী ব্যাপার ছিলো, সেখানে কড়া কলারে আর সান্ধ্যকোটের কম্পনে জাতির হৃৎ-স্পন্দনের সাড়া মিলতো না। তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নানা তীব্র উপহাস করে গিয়েছেন। আমরা এখন যে যুগে বাস করি সে যুগে রাজনীতি একটী বিশেষ আর্ট—তার মধ্যে আছে নানা প্যাঁচ, কৃত্রিমতা, দেশবিদেশের লোকের তার টানাটানি, যার ফলে সহজ মানুষের হৃদয়ের সহসা উদ্দীপন ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। রাজনীতির ধারা সে হিসেবে কোন না কোন বাঁধা খাতে বইছে, হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের দিন অতীতপ্রায়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে এ দুয়েরই বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। বর্তমানের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করলেও তার কয়েকটী বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা। এর একটী প্রেরণার উদ্ভব হলো সে সময় যে সময় জাতি বুঝলো আবেদন নিবেদনে স্বার্থের গতি রুদ্ধ হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথায় "ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবার চর্চ্চা করি নাই।" সেইজন্য এই আন্দোলন শুধু রাজনীতিক আন্দোলন নয়, এ নিজের মধ্যে এমন একটি শক্তি খুঁজে পাবার চেষ্টা যে শক্তির বলে সরকারী সাহায্য নেবার আর প্রয়োজন হয় না। যুক্তিতর্ক বুদ্ধিবিচারের অতীতে মানুষের যে একটী সত্তা আছে স্বদেশী যুগে তারই জাতিগত আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে

যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নতুন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে ··· দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি-কাব্যপুরাণ-ইতিহাসদর্শনের প্রাচীন গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি ··· আমাদের মনে যে একটা ধিক্‌কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে।" এই কথাটাই এই আন্দোলনের মূলসূত্র।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বোক্ত কারণে এর দুটা বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী দেখা দিয়েছিল। প্রথম, তার আকস্মিকতা এবং উচ্ছ্বসিত বেগ। যে জিনিষটা যুক্তিতর্ক হতে উদ্ভূত নয়, ভাবের পূরোৎপীড়ের ফল, সে বাঁধা নিয়মের খোঁজ রাখে না। "আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে ··· কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারও চলৎশক্তি আছে। ··· যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।"

এর প্রকাশভঙ্গীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সর্বাঙ্গীণতা। সেযুগের আন্দোলনে শুধু একটা নতুন রাজনৈতিক অস্ত্র খুঁজে পাবার চেষ্টাই হয় নি, প্রত্যেক দিকে নিজেদের শক্তিকেন্দ্রের সন্ধান চলেছিল। সেইজন্য পুনরুজ্জীবন প্রত্যেক দিকে। "সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

কাহারও কি অভিমান মনে আসে—মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারও কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে।” “আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধন বুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটী আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মতো দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল।” (সেইজন্য সে আন্দোলনের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ ছিল যা আজকের দিনে হয় বাতুলতা নয় ভাবালুতা বলে মনে হবে। তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা, জাতীয় শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা গভীর ঈঙ্গিতময়। তা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মীরা স্বদেশসেবা জীবনের ব্রত বলেই গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁদের সত্তার গভীরতম স্তর পর্যন্ত অনুরঞ্জিত করেছিলো।) টাউন হলে সভার সময় টাউন হল কালো কাপড়ে মোড়া হত শোকচিহ্ন হিসেবে, ন্যাশনাল ফণ্ডের জন্য আহূত সভায় সকলে উপস্থিত হলেন খালি পায়ে, কেন না মাতৃ-অঙ্গে আঘাত হলে অশৌচ পালন অবশ্যকর্তব্য। গ্রামে গ্রামে প্রচারকেরা গেলেন অশৌচের বেশে—এ কথা আজ অদ্ভুত শোনায়। আর রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তিত হলো—রবীন্দ্রনাথের গানে তার অভিষেক হলো, একথা তো প্রত্যেক বাঙালীই জানে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ এযুগের রাজনীতির আবর্তে নেমেছিলেন তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই, কেন না আন্দোলনের যে রূপ ছিল সে রূপ ফুটিয়ে তোলা অন্য কারো পক্ষে এমন শোভন ভাবে সম্ভব হত না। লক্ষ্য করার বিষয় এদের সর্বাঙ্গীণতা—রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, আর্ট, কোনটীই পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়—এদের মূলে একই প্রবাহ। নিবিড় মানবিকতা এবং গভীর সমাজবোধ ছাড়া এ সম্ভব হয় না। একদিকে ছিল গভীর কলঙ্কবোধ (‘আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!’), অন্যদিকে একটী পরিপূর্ণ ভাবসংহতির বিকাশ (‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন জননী’)—ফলে প্রত্যেক দিকে নতুন ভবিষ্যৎ

উন্মোচিত হলো। রবীন্দ্রনাথ তার প্রতীক ও স্রষ্টা—একাধারে দুই-ই।)

কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাণের কথার প্রাধান্য হলেও তার মধ্যে শুধুই ভাবালুতার উচ্ছ্বাস ছিল এ কথা বলা চলে না। বাস্তবিকপক্ষে বিক্ষিপ্ত চিত্তে কোনও সৃষ্টি সম্ভব হয় না, ফসল ফলবার জন্য বন্যার উচ্ছ্বাসের পর পলিমাটীর প্রয়োজন। বাংলার ভাবরাজ্যে যে বন্যা এসেছিল তাতে পূর্বের মাটী ধুয়ে গেলেও যে নতুন পলিমাটী পড়লো তাতে সম্পূর্ণ নতুন ফসল ফললো। সেইজন্য সে আন্দোলন শুধু ভাবের সন্ধান নেয় নি, কর্মের প্রেরণাও জুগিয়েছিল। এর কার্যক্রম এবং সামাজিক বিন্যাস সেই কারণে পূর্বকালের পটভূমিকায় আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই বলা যেতে পারে, এই ভাববন্যার পর রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিবর্তিত হলো। কমিটী-কমিশন, আলাপ-আলোচনা, প্রটেস্ট-ডেপুটেশনের পালার বহুল পরিসমাপ্তি এইখানে। বোঝা গেল নিজের শক্তিতে দাঁড়ানো ছাড়া অপরের অনুগ্রহে কোনও ভরসা নেই। সেইজন্য সে সময় সকল শ্রেণীকে একত্র করার চেষ্টা হয়েছিল, ধনী-দরিদ্র, হিন্দুমুসলমান নির্বিচারে রাখীবন্ধন করা হলো। সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্বে এ প্রচেষ্টা অচল, কেন না প্রত্যেক শ্রেণীই বিবর্তনের ধারায় এক জায়গায় এসে না পৌঁছলে এরকম রাখীবন্ধন নিষ্ফল। তবু এ চেষ্টা সে সময় হয়েছিল কারণ সমাজবিবর্তনে এমন সময় আসে যে সময় বাইরের আঘাত হতে বাঁচবার জন্য ভিতরের সংঘর্ষ গৌণ হয়ে পড়ে—অর্থাৎ প্রচলিত বুলি অনুসারে সম্মিলিত ফ্রণ্টের প্রয়োজন। সে সময়ে এরকম একটা সম্মিলিত ফ্রণ্টের (অবশ্য ঠিক আধুনিক অর্থে নয়) উদয় হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের আঘাত হতে বাঁচবার জন্য সংহতির প্রয়োজন। দেশের সৌভাগ্যবশতঃই সে সময়ে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সম্মিলিত ফ্রণ্ট রচনার চেষ্টা হয় নি, কারণ সমাজ-বিবর্তনের ধারায় যে চেষ্টা সফল হতো না (কোন কোন সম্প্রদায়

সে যুগেই বেসুরা গাইছিলেন)। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ যুগের আন্দোলন এত প্রসার লাভ করেছিল তার কারণ সে সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তি ছিল হৃদয়ের আবেগ। "কতকাল ধরিয়া আমাদের দেশের প্রধান পক্ষেরা বলিয়া আসিয়াছেন, এক না হইতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই, কবিরা ছন্দেবন্ধে ঐক্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন, নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন, তৃণ একত্র করিয়া পাকাইলে হাতিকে বাঁধা যায়—তবু দীর্ঘকাল হাতি বাঁধিবার কাহারও কোন উদ্‌যোগ দেখা যায় নাই। কিন্তু শুভলগ্নে ঐক্যের দানা বাঁধিবার যখন সময় আসিল, তখন হঠাৎ একটা আঘাতেই সমস্ত দেশে একটা কী টান পড়িয়া গেল,—যে যেখানে পারে সেইখানেই একটা কোন নাম লইয়া একটা কিছু সংহতির মধ্যে ধরা দিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। এখন এই আবেগ থামাইয়া রাখা দায়।" (রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)। এই আন্দোলনের একদিকে ছিল স্বকীয় শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদকে পরাহত করার চেষ্টা, অপরদিকে ছিল রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ একটা শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ'-এ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—এ দেশের শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্র নয়, সমাজ। সেইজন্য পুনরুজ্জীবন দরকার আমাদের চিরকালের সমাজের ও আমাদের সমাজ-মনের, আমাদের গ্রামগুলির। সেই সময় হতেই নজর পড়ল গ্রামগুলির দিকে, দাবী উঠলো বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসনের, রাজনীতির মূল শহরের শৌখিন শ্রেণী ছেড়ে ক্রমশঃ দেশের মাটীতে প্রবেশ করলো। "এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।" (রচনাবলী, দশমখণ্ড, ৫২৫ পৃঃ) এ চেষ্টা সহসা সফল হওয়া সম্ভব নয়, সেইজন্য "দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কী ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?"—কিন্তু সেই-ই সূচনা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৭৯৩ সাল হতে শাসক ও শাসিত-সম্প্রদায়ে যে চিন্তাধারা চলে আসছিল,

সে চিন্তাধারা প্রথম মোড় ফিরেছিল উনিশ শতকের প্রথম ভাগে, কিন্তু এবার যে মোড় এলো সে একেবারেই অন্যধরণের। শাসক সম্প্রদায় বুঝলেন বেশী প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়, শাসিত সম্প্রদায় বুঝলে বল লাভ ছাড়া দুর্বলের অন্য কোনও গতি নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না।" নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রথম অনাস্থা দেখা দিল এই যুগে। সেইজন্য এ সময়ে যেমন একদিকে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মতো জনহিতের কোন সরকারী চেষ্টা হয় নি, এবং ম্যাকেঞ্জি আইন, বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি অত্যাচারই হয়েছে—অন্যদিকে তেমনই দেখা দিল আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বাভাস, বিদেশী বর্জন আর সন্ত্রাসবাদ। "চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে, এক দিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়।" তাই রাজনীতির মূলে দেখা দিল নতুন করে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার, রাজনীতির পিছনে দাঁড়ালো সদ্যজাগ্রত জাতির বল, রাজনীতির কৌশল উঠল নতুন হয়ে—তার চেহারা এ যুগে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত।

সে কারণে আমাদের সামাজিক আচারেও আশ্চর্য পরিবর্তন সে সময় এসেছিল। বিদেশী পোষাক বর্জন, খদ্দরের প্রচলন, সভায় বাংলায় বক্তৃতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই হাওয়া বদলের ছবি পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে ও অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়ায়।

সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুর বদলানোর ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করার কারণ এই যে, সাহিত্যে বা চিত্রকলায় বা ভাবের অন্য রূপায়ণে যে পরিবর্তন ও প্লাবন দেখা দিয়েছিল তার মূল কারণ ও মূল কথাটা ওগুলি হতে পৃথক্ নয়। সাহিত্যে যে নব উজ্জীবন হলো তার মধ্যেও কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ স্মরণীয়। প্রথমতঃ বিদেশী বর্জন, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে সুর লাগালেন সে সুর সে মিলটন, বায়রণ হতে ততোটা সংগৃহীত নয়, যতোটা সে সুর পূর্বে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বৈষ্ণব কবি ও

বাউলদের বীণায় বেজে এসেছে। কবিতার মধ্যে কোন বিদেশী ছন্দকে—যথা গ্রীক ষট্‌পদী বা সনেট—বাংলা ভাষায় লাগাবার তেমন বিশেষ চেষ্টা নেই, যেমন আছে বাংলা ভাষা ও অক্ষরের মূল প্রকৃতি বুঝে নতুন ছন্দের উদ্ভাবন। এ যেন সাহিত্যেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। সে তার স্বরূপ খুজে পেল, ফলে মহোচ্ছ্বাস সমারোহে বিদেশী সংস্কৃতির কারাবরোধ ভাঙবার উদ্যম। অবশ্য এইখানে প্রশ্ন উঠে বৈদেশিক সংস্কৃতি বর্জন ছাড়া স্বকীয় শক্তির উদ্বোধন সম্ভব কিনা। সে প্রশ্ন পরে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে বিদেশী সংস্কৃতি বিতাড়িত করার ইচ্ছা না থাকলেও তার জন্য আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতিকে ব্যাহত হতে দেবার ইচ্ছাও সে সময় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ। তোমরা না হয় কল চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। ··· বিধাতা বোধ করি আমাদিগকেও ইংরেজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছেন ··· ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের উন্নতি, ··· অতএব সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্ত্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া।" (রচনাবলী, দশম খণ্ড, ৩৯৩-৪০২ পৃষ্ঠা) পূর্বেই বলবার চেষ্টা করেছি, সে সময় গান, নাটক বা চিত্রকলাতেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার দেখা গেল। এরকম মহাসমারোহ বাঙালীর মনে বেশী দেখা যায় নি। হঠাৎ সাহিত্য, গান, নাচ নবজন্ম লাভ করলে, বহুদূর এগিয়ে গেল, এমন একটা উচ্চ শিখরে এসে পৌঁছল যা কিছুদিন পূর্বেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। বাস্তবিক, সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যের ও আর্টের যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো তারপর হতে তার ধারা বিস্তৃততর হয়ে চলেছে, হয়তো শেষকালে

তার গতি মন্থর হয়েছে কিন্তু বিশালতাও বেড়েছে। পূর্বেই বলেছি, চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথের পর নন্দলাল, যামিনী রায়ের সন্ধান পাওয়া গেল, নৃত্যেও এরকম ঘটনা বিরল নয়; আর ভাষা, ছন্দ, গান, কবিতা, প্রবন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অজস্র নতুন ভঙ্গী সৃষ্টি করলেন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সে সময়ে এই বিরাট প্রেরণার জন্য সে যুগের সমাজ-সংস্থান যতটা দায়ী এই বিরাট প্রতিভা তার চেয়ে কম দায়ী নয়। তার পরেও তার চেয়ে গুরুতর সংকট আমাদের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে এসেছে কিন্তু অনুরূপ তাব্রতা ও বিস্তারের নতুন কোন প্রেরণারই সন্ধান মেলে নি, যে প্রেরণা শুধু সাহিত্য বা শুধু রাজনীতি নয়, আমাদের সমস্ত জাবনে একটা সম্পূর্ণ নতুন যাত্রাপথ খুলে দেবে। অবশ্য সমাজের ধারাও তার অনুকূল ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটা বিস্ময়কর যোগাযোগ। রচয়িতা ও উপকরণের এমন মিলন জগতের ইতিহাসেও বিরল। বাংলার সাহিত্য, সমাজ, জনমন আধার রূপে তাঁর বাণীবন্যা গ্রহণ করল, উজ্জীবিত হল, নতুন দৃষ্টিতে নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেল, পথের জন্য প্রচুর পাথেয় মিললো। আমাদের আরও সৌভাগ্য, সেই চলার পথে আমরা এতকাল শুধু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশই পাইনি, তিনি যে বারে বারে নিজকে নবরূপে প্রকাশ করেছেন তার সাক্ষীও হতে পেরেছি। সেইজন্য যে প্রেরণা সে যুগে প্রথম দেশে ছড়িয়ে পড়লো সে আজ পর্যন্ত ভাবরাজ্যে আমাদের নতুন নতুন দিকে সঞ্জীবিত করেছে, সংকটে ব্যাহত হয়নি, অবশ্য যদিও তার জন্যও প্রধানতঃ দায়ী রবীন্দ্রনাথই। আজ রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি বৃহত্তম সর্বনাশ। উনিশ শতকের সংকটের অন্ধকার দূর করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তারামণ্ডল নিয়ে উদয় হয়েছিলেন, পরবর্তী সংকটে রবির উদয়ে আলোক-উদ্ভাসিত দিনের সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু এবার রবির অস্তের পর অন্য কোনও চন্দ্র তারার সন্ধান নেই যাদের দীপ্তি স্বসমুথ এবং দৃষ্টিহারী প্রখর।

৭

সুতরাং আমাদের গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের মূলতত্ত্বটী তা হলে কি? বাংলা দেশের যে দুটী পুনরুজ্জীবনের কথা আলোচনা করেছি তা হতে মনে হয় পুনরুজ্জীবনের প্রধান প্রধান সূত্র এইগুলি—

প্রথমতঃ, জাতীয় জীবনে সংকট এবং জাতীয় মনে সংকটবোধ থাকা প্রয়োজন। আর এই সংকট ও সংকটবোধ এতই গভীর হওয়ার প্রয়োজন যাতে আমরা একেবারে গোড়ার কথা সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করি, আমাদের ভিত্তি বিচলিত হয়; আমাদের সমগ্র সত্তা নাড়া যায়। সংকটের এ রকম গভীরতা না থাকলে অল্প স্বল্প পরিবর্ত্তন হতে পারে কিন্তু নবযুগ দেখা দেয় না।

দ্বিতীয়তঃ এই সংকটবোধ হতে একটী সমাজবোধের উদ্ভবের প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যষ্টির গণ্ডীর বাইরেও একটী সামাজিক সত্তায় আমরা পরস্পর মিলিত এবং সে হিসেবে তখন নতুন ভিত্তি রচনার জন্য সকলের সমান দায়ভাগ। যে সংকটে এই সংহতির অভাব ঘটে সে সংকট শুধু ভাঙনের ধারাকেই বাড়িয়ে দেয়,—পুনরুজ্জীবনের সহায়তা করে না। জাতি সে আঘাতে নুয়ে পড়ে কিন্তু নতুন দিকে নতুনরূপে জন্মগ্রহণ করে না।

তৃতীয়তঃ পুনরুজ্জীবনের জন্য দরকার সমগ্র সত্তার নাড়া খাওয়া। আংশিক আঘাতে চিত্ত বিক্ষিপ্তই হয়, কিন্তু সম্ভবতঃ নবযুগ সৃষ্টি হয় না।

চতুর্থতঃ, এসময় এমন সমাজ-সংস্থান ও এমন যুগপুরুষের প্রয়োজন যাতে একটী নবজন্ম সামাজিকভাবে সম্ভব হতে পারে এবং কবি সেই সংকটের সুযোগে নতুন ভবিষ্যৎকে ভাবরূপে সঞ্জীবিত করতে পারেন। ইমারত গড়তে হলে শুধু মালমশলা থাকলেই চলে না, তার জন্য ভাল কারিকরেরও প্রয়োজন। এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়েই গঠনসৌষ্ঠবের পরাকাষ্ঠা।

৮

এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা চলতো, কিন্তু আবার যখন আমরা একটী নতুন এবং গভীর সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছি তখন সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মূলসূত্রগুলির পুনর্বিচার অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমরা যে যুগে বাস করেছি সে সময়ে একটা অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছে সে বিষয় কারও সন্দেহ নেই। বিশ্বজগতে এবং আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে এ রকম সংঘর্ষ পূর্বে দেখা যায় নি। সভ্যতার ভিত্তি কেঁপে উঠেছে। এত বড় যুগসন্ধি জগতের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব্ব। আমাদের পক্ষে এই সংকটের স্বরূপ কি, আমাদের আবার উজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃই জাগে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি অলোচনার আগে এই পিছনের ইতিহাস একটু আলোচনা করা দরকার, কেননা বঙ্গভঙ্গের সময়ের সামাজিক সংস্থান ও চিত্তবৃত্তির সন্ধান পরের যুগে মেলেনা। ভিতরের ও বাইরের অনেক পরিবর্ত্তন।

সম্প্রতি শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন "স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের যে-বীণা রুদ্রস্বরে বেজেছিলো, অসহযোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তার তারগুলি একবার কেঁপেও উঠলো না এর কি কোনো কারণ নেই ?" শ্রীযুত বসুর মতে "এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে এই দুই আন্দোলনের তফাৎ বুঝতে হবে······স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের একটা ইতিহাস জড়িত, কিন্তু সংস্কৃতির প্রতিও অসহ-যোগের সহযোগিতা ছিলো না······কার্যকারী হবার জন্যেই অসহযোগ আন্দোলনকে বড়ো বেশি না-ধর্ম্মী হতে হয়েছিলো। চারদিকে 'না' দিয়ে ঘেরা ব'লেই এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এত বেশি 'না' সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয়।" কথাটা যোগ্য। অবশ্য "অসহযোগের বাণী স্বদেশপ্রেমের নয়;

সর্বাঙ্গীন বিদেশিবর্জনের; তার মধ্যে এমন একটি শক্তি ছিলো যা দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু হৃদয়ের এমন একটি শুষ্কতা ছিলো যা সাহিত্যের প্রেরণা যোগাতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বদেশি আন্দোলন আবেগপ্রবণ আর অসহযোগ কর্মপ্রধান।" এর সব কথা অবশ্য মেনে নেওয়া চলে না। স্বদেশি আন্দোলনের তুলনায় অসহযোগ হয়তো কর্মপ্রধান, কিন্তু তাতে স্বদেশপ্রেমের বাণী নেই এ কথা স্বীকার করা কঠিন। সম্বন্ধটা কেবল বাইরের সঙ্গে তা নয়, দেশের সঙ্গেও তার যোগ আছে। স্বদেশপ্রেমের বাণী সে নিশ্চয়ই, কিন্তু ও ভাবে আত্মপ্রকাশ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। কেন ছিল না, সেই কথাটাই বিচার্য, কেননা সেখানেই অসহযোগের 'ঝোড়ো হাওয়ার' কারণ নিহিত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে রাজনৈতিক অস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল, সেটা শুধু রাজনৈতিক অস্ত্র নয়; সেটা একটা সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থার রাজনৈতিক প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বর্জনের মূলে ছিলো নিজেদের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা, কি রাজনীতিতে, কি সামাজিক আচারে, কি সাহিত্যে। বিদেশী বর্জনের মূলে স্বার্থবুদ্ধি ততো ছিল না যতো ছিল আহত অভিমান, বিদেশী প্রভাবকে পরাহত করার যতো চেষ্টা পরাভূত করার চেষ্টা ততো নয়। তার গোড়ার কথাটা নিজের শক্তি বাড়ানো, অপরকে দুর্বল করা নয়; আশ্চর্যের কথা, যে সভায় বয়কট নীতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় সে সভায় গৃহীত প্রস্তাবটা এই ছিল—

> That this meeting fully sympathizes with the resolution adopted at many meetings held in the mofussil to abstain from the purchase of British manufactures so long as the Partition Resolution is not withdrawn, as a protest against the indifference of the British public in regard to Indian affairs

and the consequent disregard of Indian public opinion by the present Goverment. (Surendranath Banerjea ; *Nation in Making*, p. 192)

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।" (কালান্তর, ৯ পৃষ্ঠা) ক্রমশঃ এই আন্দোলন দাঁড়ালো নিজের শক্তিবৃদ্ধির আন্দোলনে, পরমুখাপেক্ষিতা ভেসে গেল। "বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না......আমাদের এই আবিষ্কারটা অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারের ন্যায় প্রথমে একটা সংকীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি।.....শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশী-বর্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনোই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই।" (রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৫০৭ পৃঃ) সেজন্য সাহিত্যে, সমাজে, লোকের মনে যে হাওয়া বয়েছিল সেই সর্বাঙ্গীনতা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে স্বদেশী আন্দোলনের এবং বয়কটের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না।

কিন্তু যখন অসহযোগ আন্দোলন এলো সে সময় যুগ বদলে গেছে, সে সময় এটা হওয়া আর সম্ভব ছিল না। তার পূর্বে ইউরোপে মহাযুদ্ধ ঘটেছে। যুগ যুগ হতে সঞ্চিত লোভ নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ করল, অন্যায়ের উপর পশ্চিমা সভ্যতা এতদিন যে ন্যায় বিচারের পর্দা ফেলে রেখেছিল, সে পর্দা ছিঁড়লো। সেইজন্য পশ্চিমী সভ্যতার সুবুদ্ধিতে আমাদের যদি বা কিছু আস্থা ছিল তার সমূলে বিনাশ ঘটলো, সভ্যতার আবরণে যে পাশবিকতা লুকিয়েছিল তা আর আমাদের

চোখের আড়াল রইল না। তার পরে এলো বহুবিঘোষিত যুগান্তর রচনার পালা, কিন্তু কাজে দেখা গেল "য়ুরোপের বাইরে আত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটী আলো দেখবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।" সেই সময় সভ্যতার সংকটের সূচনা। সেই সঙ্গে আরও দেখা গেল জগৎ স্বতঃই শোভনতার দিকে এগিয়ে চলবে একথা মনে করার কোনও হেতু নেই। সে সময় হতে এমন একটী যুগের সূত্রপাত হল যার মধ্যে লোভ নিরাবরণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যুদ্ধের পরেও তার কোনও প্রতিকার হল না। সুতরাং যারা অত্যাচারিত, তাদের মনের ধারা পরিবর্তিত হল। বোঝা গেল মানবতার ভবিষ্যৎ আপাততঃ অন্ধকার, আবার বহ্নিস্নান ছাড়া এ মালিন্য ঘুচবে না। সেই কারণেই এর পরে যে আন্দোলন এলো তার মধ্যে নিজের শক্তি নিঃশব্দে বাড়ানোর চেয়ে অপরকে দুর্বল করার চেষ্টাই বেশী, কেননা একদিকে প্রবলের কোথায় দুর্বলতা তার সন্ধান মিলেছে, অন্যদিকে এই নির্লজ্জ লোভ শুভবুদ্ধি দূর করে চিত্তে আগুন ধরালো। এই হলো অসহযোগের আমলের মানসিক আবহাওয়া।

সেইসঙ্গে সে যুগে যে নতুন সমাজবিন্যাস হচ্ছিল তাতে কেবলমাত্র এই মানসিক আবহাওয়াই সম্ভব। স্বদেশীযুগে জাতির প্রথম সর্বাঙ্গীন জাগরণ, তার মধ্যে একটী বৃহত্তর সংহতি ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল সমাজ-বিবর্তনের কঠিন দাবীকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এক শ্রেণী যদি ইংরেজ-বিরুদ্ধতার আগ্রহে প্রজ্জ্বলিত হন এবং অপর শ্রেণী যদি সামাজিক কারণে ততদূর অগ্রসর না হতে পারেন তা হলে প্রথম শ্রেণী অসহিষ্ণু হতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীরও বাস্তবিক কোনও দোষ নেই। সন্ত্রাসবাদ এক হিসেবে ঐ অসহিষ্ণুতারই ফল। কিন্তু "রেলযানে ফর্ষ্টক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক্, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ডক্লাস গাড়ীকে কোনমতেই এগিয়ে যেতে পারে না।" সেইজন্য একটী অখণ্ড সংহতির পরিবর্তে দেখা দিল বহু শ্রেণী-বিভাগ,—স্বদেশী বিদেশী, অত্যাচারী অত্যাচারিত, ধনিক

শ্রমিক। ফলে শুধু যে আমাদের মধ্যেই নানা শ্রেণী-বিভাগ সৃষ্টি হল তাই নয়—জগতে এ রকম শ্রেণী বিভাগ প্রবলতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করলাম শুধু যে ইংরেজই এদেশের একমাত্র সমস্যা তা নয় অপর সমস্যাও এদেশে আছে। ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের একমুখীনতা নষ্ট হতে বাধ্য। একালে আমরা যখন দেখি কোন বিরাট জাতীয় আন্দোলনেও জাতি এক সঙ্গে সাড়া দিয়ে ওঠে না, তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি নানা অনৈক্যের সুর বেজে ওঠে তখন বিস্মিত হবার কোন কারণ থাকে না—সেইটেই আমাদের সামাজিক বিবর্তনের আপাততঃ স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু এর অপর একটী দিক আছে। এই রকম অবস্থায় রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির মধ্যে যে একটী সর্বাঙ্গীন যোগ পূর্বে ছিল সেই সর্বাঙ্গীনতা ভেঙে যায়, সেইজন্য রাজনীতির আবর্তে সাহিত্য উদ্বেলিত হতে পারে না।

তার সঙ্গে দেখা গেল কর্মকৌশলেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সংঘাতের তীব্রতা প্রবলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহিষ্ণুতার সীমাও খর্ব হয়ে এসেছে। পূর্বে ভয় ছিল আত্মশক্তির প্রকৃত উদ্বোধন না হলে বাস্তবিক কোন ফল হয় না। এ কথাটী চরমে সত্য হলেও যুদ্ধের পর দেখা গেল অসহিষ্ণুতাও অবস্থাবিশেষে স্থায়ী সাফল্য এনেছে, শাসকদের তীব্র অক্ষমতার যুগে দুঃসাহসিকতার পুরস্কার যথেষ্ট। এই দুঃসাহসিকতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় রুশ বিপ্লবে, ছ্যা'নুনৎসিয়োর ফিউম অধিকারে, তুর্কীর নবজন্মে। যখন এদের নবজন্মের প্রথম সূচনা তখন সবক্ষেত্রে জাতি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। এমন কি রুশ বিপ্লবের বেলাও একথা সম্ভবতঃ খাটে। সেইজন্য ধীরে ধীরে ভিত্তি হতে গড়ে তোলার মত সময়, সামাজিক অবস্থা ও মানসিক আবহাওয়া সে সময় ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন এই কারণেই 'না'-ধর্মী হতে বাধ্য। তার মধ্যে দ্রুত সাফল্য লাভের চেষ্টায় গোড়ার কথা হয়তো কোথায়ও কোথায়ও ব্যাহত হয়েছিল।

না-ধর্মী আন্দোলন এবং দ্রুত সাফল্যলাভের চেষ্টার মধ্যে অনেক সময় যে গলদ থাকে সে কথা সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন বলেই, মনে হয়, গান্ধিজীর অহিংসাবাদের প্রতি পক্ষপাত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকেল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে তাকান নি···এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটী গরীবের দ্বারে—তাদেরই সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত কারণে, এ প্রেমেরই প্রতিষ্ঠা হল না। অত সময় নেই, এগিয়ে চলতে হবে, আর ধৈর্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় "দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ঙ্কর তাগিদ দিয়েছে।" সেইজন্যে কবির মনে প্রশ্ন জাগলো: "মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটা মাত্র সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে। তিনি বল্লেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা!" (কালান্তর, ১৬৬-১৭১ পৃষ্ঠা)। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক সর্বতঃ স্বাহার ডাক নয়, কিন্তু বোধ হয় তার উপায় ছিল না—ঘরে বাইরে যে অমঙ্গলের হাওয়া বইছিল তা সর্বতঃ স্বাহার অনুকূল নয়। এই নীতির পরিণাম-দুর্বলতা বুঝেই সম্ভবতঃ গান্ধিজী আবার প্রেমকে বড় করে ধরতে চেয়েছিলেন হরিজন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জগতে আবার সংঘাত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, এদেশের শাসন কর্তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, ফলে এদেশে প্রেমের ধারায় নব সঞ্জীবন আসার পরিবর্তে এলো আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব। তাতে শুধু চার পাশ পুড়ে যায় তাই নয়, আগ্নেয়গিরিরও অঙ্গহানির সম্ভাবনা। কিন্তু তবুও সে অগ্নিস্রাব বন্ধ হবার নয় কেননা সে আইনমাফিক চলে না—তাকে চাপা দিয়ে বন্ধ রাখাও সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই অগ্ন্যুৎপাতে যদি কেউ মনে করেন স্বদেশপ্রেমের যা চিরন্তন আদর্শ সেটা এই উগ্র স্বাজাতিকতার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাহলে আক্ষেপের কারণ ঘটে। কেননা সমাজ-বিবর্তনের ধারায় বিশ্বাস করলে মানতেই হবে এ ছাড়া এ সময় অন্য কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না, উচিতও ছিল না। যে প্রীতির সম্বন্ধ স্বদেশপ্রেমের চরম আদর্শ, সে সম্বন্ধ, জগতের বর্তমান অবস্থায়, সবলে দুর্বলে হয় না। দ্বিতীয়তঃ যখন সংঘাতের মধ্য দিয়ে ছাড়া স্বার্থবোধ লোপ হবার কোন স্থায়ী সম্ভাবনা নেই তখন তার উপরে প্রেমের পলেস্তারা লাগাবার চেষ্টা শুধু যে নিষ্ফল তাই নয়, রীতিমতো বিপজ্জনক। খাদক যতদিন খাদক থাকবে ততদিন তার সঙ্গে প্রেম করা ছাগ শিশুর পক্ষে প্রাণান্ত। সুতরাং গ্রীষ্মের দহনের মধ্য দিয়েই আমাদের বর্ষার ধারাস্নানে পৌঁছতে হবে। বসন্ত হতে একলাফে বর্ষায় পৌঁছবার চেষ্টা বিফল তা এদেশেও প্রমাণিত হয়েছে।

সেইজন্য যখন স্বদেশী যুগের পর আবার সংকট এলো তাতে সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবনের কোন সম্ভাবনা ছিল না, একটি নতুন সংহতি-বোধ গড়ে ওঠে নি। ইদানীং আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই ভাঙনের প্রাদুর্ভাব। জীবনের পরিপূর্ণ সংহতি হতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করো, তাকে একটা স্বতন্ত্র আর্ট করে তোলো যেখানে অদীক্ষিতেরা দাবার চালের ঘুঁটা হতে পারে কিন্তু চালক নয়, প্রবহমান ছন্দকে ভাঙো, টুকরো টুকরো করো, পরিপূর্ণতার উচ্ছ্বাস দূর করে অসম্পূর্ণতার বক্রহাসি হাসো। মানুষের মনে যে নানা বিরোধী ধারা আছে অবচেতন মন পর্যান্ত খুঁজে তার সংঘাতকে আবিষ্কার করো, তারই প্রকাশ দাও চিত্রের মধ্যে—বাহ্য জীবনের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ না থাকলেও ক্ষতি নেই। বলা বাহুলা, এ উন্মত্ত শ্রেণিসংঘর্ষের সময়ের কথা, নিঃশ্রেণীক সমাজের চিত্তবৃত্তি নয়। এই ভাঙনের ধারায় চলতে চলতে আমরা আমাদের গভীরতম সত্ত্বাকেও ব্যবচ্ছেদ করে দেখবার চেষ্টা করছিলাম, ফলে কাব্যের যা ভিত্তি তাও ভেঙে

পড়ার আশঙ্কা হচ্ছিল, কেন না আঙ্গিক, ভঙ্গী ও মুদ্রাদোষই যেন তার সর্বস্ব হয়ে উঠছিল। এমন সময় এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এলো। তার দুটী প্রভাব। একদিকে সে ভাঙনের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে, যে সমস্ত পরিবর্তন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাও সম্ভব হল। অন্যদিকে সে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আবার সচেতন করে তুললে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ভবিষ্যতের স্বার্থে একটা সংহতিবোধও যেন গড়ে উঠছে। ফলে আমরা আর একটা মোড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম বলে মনে হচ্ছে।

আমাদের দেশেও মহাযুদ্ধের এই প্রভাব অল্পবিস্তর দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সুদূর-প্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হবার পর আমরা যে গভীর নাড়া খেয়েছি তাতে আমাদের ভিত্তিতে কাঁপন লেগেছে। এ যুদ্ধের পর শুধু যে মানসিক হাওয়াবদল হবে তাই নয়—সামাজিক কাঠামোও যথেষ্ট পরিবর্তিত হবে। সুতরাং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যেটা প্রথম সূত্র তার উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে অপর সূত্রগুলি সম্বন্ধে। আমাদের একটা নতুন সমাজবোধ গড়ে উঠেছে কি? সম্ভবতঃ নয়; অন্ততঃ যথেষ্ট পরিমাণে নয়। কংগ্রেস আন্দোলনে দেশ একযোগে সাড়া দেয় নি এই তার একটী পরোক্ষ প্রমাণ। কংগ্রেসকে যে এই নেতিমূলক আন্দোলন আরম্ভ করতে বাধ্য হতে হল তাও তার আর একটা পরোক্ষ প্রমাণ। সুতরাং যে ভিত্তিতে নতুন সংহতি গড়ে উঠতে পারতো সে ভিত্তিও নেই। আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে বিক্ষোভে দেশ মন্দ্রিত হলেও চিত্তের সর্বাঙ্গীন সঞ্জীবন হবার কোনো আশা আপাততঃ নেই। আর পরিশেষে এখন এমন কোনও বৃহৎ পুরুষের সন্ধান নেই, অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে নেই, যিনি এই সর্বাঙ্গীন সঞ্জীবন ঘটাতে পারেন, কালবৈশাখীর বিদ্যুৎগর্ভ মেঘকে আষাঢ়ের স্নিগ্ধ মেঘমালায় পরিবর্তিত করতে পারেন। কিন্তু তবু যেটুকু আশার আভাস মিলছে তারই আলোচনা করে এ প্রবন্ধ শেষ করবো।

৯

বাংলা অতি-আধুনিক কবিতা কিছুদিন ধরে যে পথে চলছিল তাতে যুগধর্মের স্বাক্ষর ও যুগমানসের প্রকাশ এবং বৃহত্তর জগতের মানসিক আবহাওয়ার সঙ্গে দৃঢ়তর যোগ থাকলেও তার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক দুর্বলতা দেখা যাচ্ছিল, আশঙ্কা হচ্ছিল সে ইতিমধ্যেই কাব্যের ধর্ম হতে বিচ্যুত হতে চলেছে। এর বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু যখন জাপানি বোমার ভয়ে বাংলার নাড়া বিচলিত হল সে সময় এই আধুনিক কবিরাই দু একটী কবিতা রচনা করলেন যেগুলি শুধু যে তাঁদের পূর্ব রচনার তুলনাতেই ভালো তাই নয়, সেগুলি এমনিতেই ভালো কবিতা। তার বক্তব্য ক্ষীণ নয়, বিশাল—সে শুধুই বক্রোক্তিজীবিত নয়—তার মধ্যে বৃহত্তর সমাজের ও মানবিকতার চেতনা ও প্রেরণা আছে। শ্রীযুত বিষ্ণু দে'র নবতম গ্রন্থ ২২শে জুন হতে দু-একটী কবিতা উদ্ধৃত করছি—

কতোবার এল কত না দস্যু! কতো না বার—
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার
অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,—
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।
দীর্ঘকালের ধারাজলে জলে
চেতনার বালি সোনালি ফসলে
এ দেশে বন্ধু কতকাল ফলে।
মাটীর টান
দিকে দিকে জ্বলে, পু'ড়ে ছারখার তানাকা-সান।

হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তি দ্বার,
দেশে আর দেশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতা ছার।

এ কবি এখন আর 'মোর কুরুবক জেবলী কেবল ঝরে জবা-সঙ্কাশে'-র কবি ন'ন, 'উন্নাসিক ও উপত্যকায়' আনাগোনা তাঁর যথেষ্ট হয়েছে।

এখানে অজেয় প্রাণের কঠিন গানের সামনে মৃত্যু মূঢ় হয়ে গেছে। সেইজন্য একদিকে যখন পলাতকের ভীড় তখনও কবি প্রাণের উদ্বোধনের গান গাইছেন—

চাই তবু দূরাহত আশা
ভয়হীন নির্মানের ভাষা।

যদিও সে সময় সমাজে তালভঙ্গ হয়েছে, দেশে দেশে গান ভঙ্গ হয়েছে, কবির নিজের সত্তাও আঘাত পেয়েছে—

সমাজের সমে কাটে গান,
দেশে দেশে থেমে যায় মীড়।
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।

যে ছন্দ এবং ভাষায় এই দুরাহত আশার গান গাওয়া হয়েছে তা বাস্তবিকই এ যুগের মানুষের প্রাণের অভিব্যক্তি—বক্তব্যের ঋজুতায়, ছন্দের সংহতিতে, দৃশ্য ও অদৃশ্য মিলে এর বলার কথাটা সুন্দর হয়ে উঠেছে। এ রকম উদাহরণ এ গ্রন্থে আরও আছে। যাঁরা কবিতার সার্বকালিক আদর্শেই অনবদ্য কবিতা উপভোগ করতে চান তাঁরাও সে কবিতাগুলি হতে রস পাবেন। তেমনি এ সংকটে আর এক কবির প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য, যদিও সে কবির মধ্যে এত গভীর সমাজবোধ, ভবিষ্যতে এমন দৃঢ় আশা, প্রাণের এমন উদ্বোধন নেই।

এই তো প্রথম
লভিলাম তোমারে আমার প্রাণে
হে বাংলা আমার বাংলা।
অন্ধকার যুগসন্ধিকালে
অন্তহীন মৃত্যুর মশালে
রক্তের ইন্ধন ঢালে
পূর্ব ও পশ্চিম;
জ্বালায় পিশাচ-আলো নগরের নির্বাপিত দীপে
আকাশে সমুদ্রে দ্বীপে
শিল্পে কর্মে প্রেমে।

সে আলোয় তুমি এলে নেমে
হে বাংলা, আমার বাংলা
আমার নিভৃত ধ্যানে।

কী যে অনির্বচনীয়—
হৃদয়-মন্থন-করা তোমার অমিয়—
সেখানে দুর্বল তুমি সেখানে দুঃখের অন্ত নেই,
যেখানে তোমার শক্তি সেথা তুমি অনাক্রমনীয়।

(বুদ্ধদেব বসু : উপলব্ধি। কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৯

কিছু ঘোষণা-ঘেঁষা সুর আছে, অতীতই এখানে বড়ো, গড়বার বেদনার চেয়ে হারাবার আশঙ্কাই প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবুও এ কবির সঙ্গে 'বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীতান, আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন'—এর কবির অনেক তফাৎ। এ তফাৎ শুধু মনোবৃত্তিতে নয়, বলার ভঙ্গীতে, আঙ্গিকে, সবদিকেই। ছন্দে গভীরতা নেমেছে, শুধু সস্তা টুং টাং নেই। বক্তব্যটাই প্রধান, সেইজন্যে শুধু বলার কৌশলটাকেই বড়ো করবার দরকার হয়নি।

আর একটী কবিতার উল্লেখ করবো। দেখা যাবে, এ কবিতাটীর মধ্যে আছে যৌবনের অসহিষ্ণুতা, কপটতার প্রতি ধিক্কার, অথচ মানুষের প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং আমাদের দেশের পুনরুজ্জীবনের আশা। এইটাই কবির চিরন্তন ধর্ম। সুতরাং এই সংকটে যদি কবিরা আবার এ যুগের ভঙ্গীতে, একালের মানসিক কাঠামোর উপযুক্ত সুরে, সেই গান গাইতে শুরু না করেন তাহলে তাঁরা 'আত্মরতির সম্মোহনে' দিন কাটান, তাঁদের সঙ্গে পাঠকসমাজের বা বৃহত্তর জগতের কোন যোগও নেই, প্রয়োজনও নেই। কবিতাটী কংগ্রেসের ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পূর্বে লেখা।

মহাত্মা স্তব্ধপ্রায়, ওয়ার্ধায় ঊর্ধবাহু ;
এদিকে আসর জমায় অন্যান্য বেনিয়ার দল।

যদিও দিগ্বিদিকে লোকক্ষয়, সহর গ্রাম উজাড়
তামাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার
তবু আমাদের স্বার্থ শুধু নিঃস্বার্থ কারবার।
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেক দিনই করেছি বরবাদ
শুধু সঙ্গোপনে রসদ জোগানোয়
মিলে মিলে অন্ধকার বোম্বাই, আমেদাবাদ

আসমুদ্র হিমাচল হে হিন্দুস্থান,
কানে বাজে
ক্ষুরধার নদীসঙ্কুল চীনের আহ্বান,
কৃষ্ণ সাগর থেকে বল্টিক পর্য্যন্ত
বিপর্য্যস্ত সোভিয়েট ভূমির মৃত্যুঞ্জয় গান,
পোড়ামাটীতে কি চিড় ধরে, সবুজ অঙ্কুর ভিড় করে,
হে হিন্দুস্থান ?
... ...
গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্য্যে ;
এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হবো
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স্ গানে,
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

(সমন সেন : বসন্ত। কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৯)

যে ভণ্ডাচার আমাদের ক্ষুব্ধ করে, যে আহ্বান আজ আমাদের কানে পৌঁচচ্ছে, যে দৃঢ় আশা আমাদের পাথেয়, তারই কথা আছে এ কবিতায়। এর মধ্যে ছন্দ নেই, কিন্তু একটা দোলা আছে। নিগূঢ় মিলের সুনিপুণ কারিকুরী আছে, অথচ বলার ঋজুতার অভাব হয়নি। বক্তব্যের সঙ্গে আঙ্গিক অতি সুন্দর মিলেছে। সেইজন্য যখন কেউ বলেন,

চলো না কবি মিছিলে মিশি—অসৎ ঋষি-সঙ্গ
পতনে পথ করেছে ঢালু গড়েছে বালুসৌধ।

আমরা দেবো বোবাকে ধ্বনি, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ,
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ ॥

(সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কাব্য জিজ্ঞাসা। কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৯)

তখন কোন সাধু সমালোচকেরই বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় যে এই সংকটও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত কবিতা সঞ্জীবিত করেছে, এমন কবিতা অন্ততঃ দুই একটাও রচিত হচ্ছে যার মধ্যে কবিধর্মের ও কবিকর্মের সাক্ষাৎ সহজেই মেলে। মনে হয় সংকটের তাপে যে মাটী পুড়লো তাতেও চিড় ধরে, সবুজ অঙ্কুর আবার দেখা দেয়। আশা হয়, গণ সাহিত্যের নামে যে সঙ্কীর্ণ হতে সঙ্কীর্ণতর সাহিত্য রচিত হচ্ছিল, সেখানে বাধা পড়েছে। অনুকূল হাওয়া বইলে কাব্যতরীর আবার নতুন মোড় ঘোরাও আশ্চর্য নয়, কেননা কাব্যের প্রকৃত ধর্মের দিকে কবিদের নজর পড়ছে তার কিছু নিদর্শন এই সংকটে আমরা পেয়েছি। এ অবশ্য নজর পড়ার বেশী কিছু নয়, তবু সেটুকুও আশাজনক।

১০

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অতীতটা সাধাধণতঃ মহাকায়দের যুগ, ভবিষ্যৎ তা নয়। একথা আজ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে এসেছে, যে এ যুগে পিরামিড হবার সম্ভাবনা নেই, কলোসস দেখা যায় না, মহাকাব্য রচিত হয় না, মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন না। কোনও সমালোচক যেন বলেছিলেন আধুনিক কবিতার আলোচনার সময়ে যদি এমন একজন কবির নাম করার দরকার হয় যাঁর কাব্য আলোচনা করলেই আধুনিকতার সম্পূর্ণ তত্ত্ব বোঝা যাবে, তা হলে আমাদের নিরাশ হতে হবে। সে রকম অসাধারণ বড়ো কেউ-ই নেই। কিন্তু এঁদের সকলকে মিলিয়ে একটী নতুন কাব্যভঙ্গী গড়ে উঠছে যার সমষ্টিকে নাম দেওয়া হয় আধুনিক কাব্য। সেইজন্য এই সংকটের দাবদাহ থেকে আমাদের শীতল করবার জন্যে বনস্পতি কেউ নেই,—যে বিশাল

বনস্পতি আমাদের রক্ষা করে এসেছিলেন তাঁকে আমরা হারিয়েছি—কিন্তু তবু দেখা যাচ্ছে পোড়ামাটীতেও অঙ্কুর গজায়। এই অঙ্কুর হতে বনস্পতি হয় না কেননা এরা সে জাতেরও নয়, সে সম্ভাবনাও নেই ; কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাচ্ছে এরা আলোকলতাও নয়, কেননা মাটীতে শিকড় সামান্যও না থাকলে ভূমিকম্পে তার চঞ্চলতা জাগে না। এইটে শুভলক্ষণ। এই সংকটের পর আমাদের কোন সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আসবে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। সামাজিক হাওয়া তার খুব অনুকূল নয়। কিন্তু মানুষের প্রাণ যে সত্যিই অমর, কোন আঘাতেই যে তাকে শেষবারের মতো নিঃশেষ করা যায় না, আজ এই গভীর অন্ধকারে তার ক্ষীণতম প্রমাণও আশা জাগিয়ে তোলে। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এই সংকটে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই বাণী স্মরণ করি।

কথাশেষ

"আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকে।...আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম-প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"

এটা রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা। এ কথাটাকে কবির ভাবোচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। বিদেশের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলেও জগতের বড়ো সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের কোনো আশা নেই। এর মধ্যে ইউরোপের আদর্শগত সংঘাত থাক্ বা নাই থাক্ প্রাচ্য দেশগুলির পক্ষে এ যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা এখনও সত্য। হয়তো কোনো কোনো ক্ষয়িষ্ণু দেশের অবনতি এ যুদ্ধের ফলে ঘটতে পারে, হয়তো লণ্ডনের চেয়ে নিউ-ইয়র্কের গুরুত্ব বেশী হতে পারে কিন্তু অধীন দেশগুলির পক্ষে এই দেশান্তরে কালান্তরের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ বিষয়ে মার্কসের কথাই সত্য মনে হয়,—The Indians will not reap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British bourgeoisie, till in Great Britain itself the now ruling classes shall have been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindus [Indians] themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether. এই কারণে ভারতীয় আন্দোলন জগতের অন্য

অত্যাচারিতদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে পারে, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ছেড়ে অলীক আন্তর্জাতিকতার অনুসরণই তার পক্ষে সম্ভব নয়। লেনিনের মতে এ ধরণের অধীন দেশগুলির বিবর্তনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।[১] তাঁর মতে অধীন দেশগুলিতে শুধু যে ফিনান্স-ক্যাপিটালের প্রসারের সুযোগ থাকে তাই নয়, বিপদের সময় মালিকদের সাহায্য সংগ্রহের ক্ষেত্রও ওখানে। সেকারণে অধীন দেশগুলিতে মুক্তিসংগ্রাম কঠিনতর। কিন্তু জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, অধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে এবং এর ফলে ধনতান্ত্রিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা। ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিবর্তনের পথে অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন এবং বিবর্তনের পথে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলন একই বৃহত্তর আন্দোলনের দুই দিক্, কেন না মালিক দেশগুলিতে শ্রমিকবিপ্লব না হলে যেমন অধীন দেশগুলির স্বাধীনতা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই তেমনি অধীন দেশগুলির স্বাধানতা আন্দোলন মালিক দেশগুলিতে শ্রমিক বিপ্লবের সাফল্যের সহায়ক। সুতরাং মালিক দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের উচিত হচ্ছে স্বদেশী ধনতন্ত্রের স্বার্থ অগ্রাহ্য করে অধান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করা, কেন না মার্কসের কথায় a people which oppresses another people cannot itself be free.

বলা বাহুল্য, এ মহাযুদ্ধেও এরকম কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি, বরং অধীন দেশগুলি সম্বন্ধে বিলেতী শ্রমিক দলের অদ্ভুত কার্যকলাপ হতে মনে হয় এ বিষয়ে তাঁরা ধনিকসম্প্রদায়ের সমান অংশীদার। ফিনান্স-ক্যাপিটাল ধ্বংসের কোনো চিহ্নই আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং রুশিয়া যুদ্ধে নেমেছে বলে ইংরেজের চেহারা বদলেছে এ ধারণা হাস্যকর। এ-রকম মৈত্রীবন্ধন রবীন্দ্রনাথের কথায় বর্ণনা করা যেতে

১। *Marx & Engels on India*—edited by Mulk Raj Anand, p 134 *et seq* দ্রষ্টব্য।

পারে—"ঝড়ের সময় দেখেছি কাক ফিঙে উভয়ই চরের মাটির উপর চঞ্চু আট্‌কাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে পাখা ঝট্‌পট্‌ করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহু দীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে।" (কালান্তর, ২০৩ পৃষ্ঠা) বরং এ মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে আরো সজোরে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা ইংরেজের প্রবল হবে একথা সহজেই বোঝা যায়। গত মহাযুদ্ধের ফলে আমেরিকা দেনদার হতে পাওনাদার হয়ে দাঁড়ালো, এ মহাযুদ্ধে তার পাওনার পরিমাণ আরো বাড়লো এবং ক্ষেত্র আরও বিস্তৃততর হলো। আর সেইসঙ্গে ইংরেজের দেনদার দেশগুলি, যথা— কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এমন কি, কিছু পরিমাণে ভারতবর্ষও, ইংরেজের পাওনাদার হয়ে উঠলো। তা ছাড়া এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজ রাজত্বের অন্য অধীন দেশগুলিতে শিল্পের যে প্রসার ঘটলো তারও প্রভাব যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যিক সম্বন্ধে পড়বে। ফলে ভারতবর্ষ বা অন্য যে অধীন দেশগুলি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর হয়ে রইলো এই বহু বিস্তৃত ফিনান্স-ক্যাপিটাল অন্য দেশে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঐ দেশগুলিতেই আসর জমাবার চেষ্টা করবে এটা বিচিত্র নয়। কিন্তু তার ফলে সংকটও গভীরতর হবার সম্ভাবনা, কেন না একদিকে আমাদের স্বাধীনতার দাবী যেমন প্রবলতর হয়ে উঠবে আশা করা যায়, অন্য দিকে তেমনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের (যথা—ইংরেজ ও আমেরিকা। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হলেও জাপানের ব্যবসায়ও এদেশ হতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে এ আশা দুরাশা) সংঘর্ষও দেখা দেবার সম্ভাবনা। জগৎ সভ্যতার প্রকৃত ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই অত্যাচারিত ও অধীন দেশগুলিতে নিরূপিত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

শ্রমিক বিপ্লবের জন্য ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ পরিণতির প্রয়োজন একথা আজ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। স্টালিনের রচনা হতে জানা যায়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদ সব চেয়ে দুর্বল সেখানেই বিপ্লবের সম্ভাবনা, এই

ছিলো লেনিনের মত। The capitalist front will be broken where the chain of imperialism is weakest, and it is there that the proletarian revolution (which follows upon the defeat of imperialism) must begin. It is likely enough, therefore, that the country where the revolution begins, the country where the capitalist front is broken, will be one where capitalist development is comparatively backward; and that, while the revolutionary movement is being successful in such a country, others, where industrial development is much farther advanced, will remain within the framework of capitalism.[২] (Works, Russian edition, vol. vi, p. 371) সুতরাং ভারতবর্ষে সংকট শুধু ভারতের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, এই সংকটের ফলে জগৎ সভ্যতার একটা নতুন চেহারার সন্ধান পাওয়াও কঠিন নয়; কারণ ভারতীয় সংকট জগৎ সংকটেরই একটা দিক্। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই আবার বলা চলে, "একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্চে এই,—ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্য্যধ্বনিতে আজ যুগান্তরের দ্বার খুলেছে।··· হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিৎ কেঁপে উঠল।" (কালান্তর, ১৭৭ পৃষ্ঠা) কোনো সংকটের সময় ভবিষ্যৎবাণী করার চেষ্টা একটা স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি, কেন না তাতে একাধারে চিত্তকণ্ডূয়ন নিবারণ এবং নানা আসন্ন ভয় হতে ত্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ-বাণীর মধ্যে নির্ভুলতার দাবী না থাকলেও তার এটুকুই বৈশিষ্ট্য যে তার ভিত্তি বিস্তৃত সমাজ-দর্শনে স্থাপিত বলে সামাজিক বিবর্তনের বর্তমান ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে ঐ

২। *Marx & Engels on India*, p. 139 হইতে গৃহীত।

ভবিষ্যৎ বাণীও অনেকাংশ সফল হবার সম্ভাবনা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে যে সূচনা বর্তমানে দেখা দিয়েছে সেগুলির স্বাভাবিক পরিণতি, অন্য কোনো বিপর্যয় না ঘটলে, সম্ভবতঃ ঐদিকে।

কিন্তু শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও ভারতের এই সংকটের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যে যেমন সমাজেও তেমনি এ একটা যুগান্ত। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সময় হতে আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য (আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই বুর্জোয়া অর্থে মধ্যবিত্ত এখানে নয়) দেখা গিয়েছিলো, তারই নানা ভঙ্গী আমাদের সমাজবিবর্তনের চিহ্নস্বরূপ একথাও বলা চলে। মনে হয়, সেই পর্বের সমাপ্তি আসন্ন, তাই প্রতি দিকে ভাঙনের প্রাচুর্য। কিন্তু সে ভাঙনের ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আর কোনো নবজন্ম সম্ভব নয় এমন কথা নয়। বরং ভাঙনের সময় ভাঙন-সচেতন রাজনীতিক, কবি, সাহিত্যিকের সন্ধান মিলছে। এ হতে বোঝা যায় জাতীয় মৃত্যুর দিন উপস্থিত নয়। নানা দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে ছাড়া নবজন্ম সম্ভব নয়, এ যুগে নানা অসুস্থ মতবাদ নানা পথভ্রান্তি দেখা দেওয়াও সেজন্য স্বাভাবিক, কিন্তু খুব স্বল্প হলেও একটা নতুন ঐতিহ্য আমাদের প্রাণকে পরিপুষ্ট করতে শুরু করেছে এ কথা সম্ভবতঃ আর শুধু সাহিত্যিক সত্যই নয়, সামাজিক সত্যও। অবশ্য সে ঐতিহ্য এখন আমাদের পরিপূর্ণ অঙ্গীকৃত নয়, সেটা এখনও জীবন্ত হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তবুও সেটা ধীরে ধীরে সত্য হবার সম্ভাবনা আছে, স্বদেশ ও বিদেশের ঘটনাপ্রবাহ এ পর্যন্ত তার বিরোধী নয়, আপাততঃ কোথাও কোথাও পশ্চাৎগতি হলে মূলতঃ তা নয়, একথা ভয়ে ভয়ে হলেও বলা চলে। আর অলাতচক্রে চংক্রমণ নয়, কম্বুরেখাতেই আমরা যেন আর একটা নতুন আরোহণের পর্ব শুরু করলাম, তার মধ্যে সাময়িক অবরোহণ অনেক সময়ই সর্পিলগতির নিদর্শন মাত্র। অবশ্য অবরোহণও যথেষ্ট, দোটানা প্রবল, একথাও আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা আলোচনা করলেই টের পাওয়া যায়।

সুতরাং একালে প্রকৃত নতুন ঐতিহ্যের কবিতার পরিবর্তে অবক্ষয়ের কাব্য প্রবল হয়ে উঠলো এবং ফলে কাব্যের অপকর্ষ ঘটছে এ অভিযোগ নিরর্থক। রাজনীতিতেও দেখি, সাম্প্রদায়িক সভা ও সাম্প্রদায়িক মতবাদ একালে যতো উগ্র অনেককাল সেরকম উগ্রতার সন্ধান ছিলো না। প্রাদেশিকতাও কমতির দিকে নয়, বাড়তিরই দিকে। এগুলি সাময়িক পদস্খলন হলেও দূরদর্শনে প্রতীপগতি হয়তো নয়। সংকোচনের যুগে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতম, দরাজ হাত পূর্ণ ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে। এই কারণেই গত শতকে ইংরেজের রাজনীতিতে 'লিবারেল' দলের স্থান ছিলো, কিন্তু শ্রমিক দলের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল দলের সংহতি ও স্বার্থসংরক্ষণ চেষ্টা প্রবলতর, আবার বৈদেশিক শোষণে উভয় দলই প্রায় সমান তৎপর। আমাদের দেশেও কংগ্রেস ক্রমশঃ জনগণাভিমুখী হবার ফলেই নানা সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের প্রাচুর্য। এগুলির মধ্যে একই সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন চেহারা দেখতে পাই। সাহিত্য ও শিল্প মানবমনেরই সৃষ্টি, তার মধ্যেও অনুরূপ গতি বিচিত্র নয়-ই, বরং স্বাভাবিক। এই পদস্খলন ও পশ্চাদ্‌গমন ওছাড়া কিছু নয়, কালান্তরের দোহাই দিয়ে ওগুলির অন্য চেহারা দেবার চেষ্টা এবং তাতে উল্লসিত হওয়া চলে না, ওগুলির ফলে আমরা নতুন সমাজ এখনই পাচ্ছি এমন কিছুও নয়—কিন্তু তবুও ওগুলির মধ্য দিয়ে ছাড়া যদি একটী সুস্থতর সুন্দরতর এবং আরো সজীব ঐতিহ্যের আগমন সম্ভব না হয় তা হলে ওগুলি নিদানের বিধান হিসেবেও অবশ্যগ্রাহ্য, ওগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন থাকলেও ওগুলির ফলে আমাদের স্থায়ী সর্বনাশ এবং শেষ যুগান্ত এ ধারণা গভীর মোহ অথবা যোগনিদ্রার ফল।

যে ভবিষ্যৎ আদর্শে সমাজ ও সাহিত্য আজ নবজন্মে সঞ্জীবিত হতে চায় তার একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, বর্তমানের সঙ্গে তার পার্থক্য আকারের যতো প্রকারের তার চেয়ে বেশী। মানবসভ্যতার আদিম

যুগে কবিতা ও শিল্প জীবনের বাস্তব অনুভূতি ছিলো এবং সমগ্র সমাজই ছিল তার বোদ্ধা। জীবনের সত্য হতে কাব্য ক্রমশঃ অবসর-বিলাসে পরিণত হয়েছে, অবসর সময় ছাড়া কাব্যালোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। সেই সঙ্গে কবির সামাজিক মূল্য ক্রমেই কমে চলেছে, 'কবি' কথাটীর সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর আজকাল প্রায় অবিচ্ছেদ্য। কবিরাও সেই অভিমানে স্বকীয় গণ্ডী রচনা করে জনসমাজকে বাইরে রাখতে চান, সেই কারণেই একালের কবিতা পড়বার সময় অভিধান কাছে রাখতে হয়। কাব্যের এই দুরবস্থা কাটাবার জন্যে নতুন হাওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে "বর্তমান কালে ভাবী সমাজের দুন্দুভি বাজান, কি তার তালে পা ফেলা যদি সকলের কর্ত্তব্য হয়, তবে সেটা সামাজিক কর্ত্তব্য, সাহিত্যিক নয়"—শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্তের এই কথা বিচারবিভ্রাটের চূড়ান্ত উদাহরণ।

আস্তিকতার এতদূর বিলোপ কি কবি কি পাঠক কারও হিতকরী নয়, স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নয়। এই রুগ্ন আবহাওয়া কাব্যের খাতিরে দূর করাই আশু প্রয়োজন। মানবধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা কাব্যের চরম ধর্ম, আজ সেই ধর্ম পালনে অনেক আবর্জনা সরাতে হবে, অনেক বাঁধন ছিড়তে হবে, এই ভয়ে যদি কবিরা সে ধর্ম হতে চ্যুত হন তা হলে তাঁরাও কবিপদবীচ্যুত হবেন আর কবিতার উৎসও বন্ধ হবে। যে দূষিত পরিবেশে এই নাস্তিক্যবুদ্ধির জন্ম, যে কারণে এই নাস্তিকতা সর্বব্যাপী সংহার-মূর্তি ধারণ করলো, সেই দূষিত পরিবেশ, সেই কারণের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আঁচড় লাগার ভয়ে দূষিত ক্ষত পরিপালন করা চলে না, নিছক ভদ্রতার খাতিরে মরা একটু কঠিনই, কিন্তু যাঁরা কবি তাঁদের পক্ষে অন্যায়ের কাছে মনুষ্যত্বের অপমান সহ্য করা আরো অসম্ভব। আজ যে আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত হতে চান বা হতে পারেন সে আদর্শ এখনও এদেশে ঘটে নি, কিন্তু তার আগমনী হাওয়ায় যদি সাহিত্যের প্রকৃত নবজন্ম দেখা দেয়

তবে সে আজকের দিনেও সাহিত্যিক সত্য। সভ্যতার একটা সুগভীর সংকট দেখা দিয়েছে, আজ মহানগরীতে বিবর্ণ দিন আর আলকাৎরার মতো রাত্রির পালা, দুর্মর আশাবাদীরও এই ধ্বংস হাহাকার আর পশুধর্মের তাণ্ডবে বিচলিত হবার সম্ভাবনা। মনে হয়, "মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে—বর্ব্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্ব্বরতা ?" "কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্যে পণ করতে প্রাণ এমন লোকও দুর্দ্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা।" আমাদের কাছে যে মহৎ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং বর্তমানে সমুপস্থিত তাতে ব্যাকুলিত হবার পরিবর্তে কবিরা যদি সেই ধর্মের সামান্য সন্ধানও পান যার স্বল্প আস্বাদও মহৎ ভয় হতে পরিত্রাণ করে, তা হলে এ সংকটও নবজন্মের সূচনায় অন্য আকারে প্রতিভাত হবে। এ কালের কবির কণ্ঠেও আবার মানুষের অজেয় প্রাণ এবং মৃত্যুঞ্জয় আশার গান লাগলো এটা বাঙালী পাঠক ও সমালোচকের পক্ষে আশাপ্রদ ঘটনা, আরো আশাপ্রদ এই কারণে যে তার মধ্যে বহুসময়ে ব্যক্তিগত বিলাসের পরিবর্তে শুধু বিপ্লববিলাস থাকলেও তার গতি হয় তো পিছন দিকে নয়, দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে আশা করি সামনের দিকেই।

পাষাণে বাঁধা কঠোর পথ
চলেছে তাহে কালের রথ,
ঘুরিছে তা'র মমতাহীন চাকা।
বিরোধ উঠে ঘর্ঘরিয়া
বাতাস উঠে জর্জরিয়া
তৃষ্ণাভরা তপ্ত বালু ঢাকা।
নিঠুর লোভ জগৎ ব্যেপে'
দুর্বলেরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তুলে হিংসা-হলাহল।

অর্থহীন কিসের তরে
এ কাড়াকাড়ি ধূলার 'পরে
লজ্জাহীন বেসুর কোলাহল।
হতাশ হয়ে যে দিকে চাহি
কোথাও কোনো উপায় নাহি
মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।
করুণাহীন দারুণ ঝড়ে
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে
অন্যায়ের প্রলয়ানল শিখা।
সহসা দেখি সুন্দর হে,
কে দূতী তব বারতা বহে
ব্যাঘাত মাঝে অকালে অস্থানে।
ছুটিয়া আসে গহন হতে
আত্মহারা উচল স্রোতে
রসের ধারা মরুভূমির পানে।
ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি'
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।
ভরিয়া ঘট অমৃত আনে
সে কথা সে কি আপনি জানে,
এনেছে বহি' সীমাহীনের ভাষা।
প্রবল এই মিথ্যারাশি,
তা'রেও ঠেলি' উঠেছে হাসি'
অবলা রূপে চিরকালের আশা॥

—রবীন্দ্রনাথ : বীথিকা

পরিশিষ্ট

সেকালের কাব্যকলা

আমাদের প্রচলিত ধারণা, সংস্কৃত কবিরা যে যুগে জন্মেছিলেন সে যুগে বোধ হয় একালের মত নানা ঝড়ঝাপটা ছিল না, 'জীবনতরী' শুধু মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে যেত, কবিদের কোন ভাবনা চিন্তাই ছিল না। মলয়-চকোর-চাঁদ-ইন্দ্র-কুবের-অলকা নিয়ে ছিল তাঁদের কারবার, রাজারাজড়ার নীচে তাঁদের চোখই পড়তে চাইত না। আর সেকালের কবিদের উপমায়, বর্ণনাভঙ্গীতে এমন একটি আবহাওয়ার আভাস আছে যাতে মনে হয় জগতে কি ঘটছে না ঘটছে সে কথা ভাববার দায় তাঁদের ছিল না। আমরা সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্য, সেইজন্য, অবসর মুহূর্তে ভেসে আসা সৌরভের মতো উপভোগ করার চেষ্টা করি; সে যেন একটা অলস মায়াময় অন্য স্বপ্নজগতের কথা। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এইরকম ধারণার সহায়তা করেছেন কোনো কোনো সংস্কৃত আলংকারিকেরা। শেষের যুগের আলংকারিকদের মতে কাব্য অন্যফলনিরপেক্ষ, কাব্যেই কাব্যের শেষ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্যজিজ্ঞাসা'তে লিখেছেন, "আলংকারিকেরা কাব্যরসকে লোকোত্তর বলেছেন সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক বস্তু লৌকিক জগতের কোনো হিতেই লাগে না, সমাজের বুকে থেকে এত বড় অসামাজিক কথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থারম্ভে অনেক আলংকারিক প্রমাণ করেছেন যে কাব্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। কাব্যরসের এই ফলশ্রুতি যে আলংকারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপসের কথা, তার প্রমাণ, ও-সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার

মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না।" 'দশরূপক'-কার লিখেছেন—

আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙমুখায়॥ ১।৬

সাহিত্যদর্পণের মতেও রস হচ্ছে 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য', অন্য কোনও জিনিসের ছোঁওয়া তার মধ্যে নেই।

কিন্তু এ যুগের নাস্তিক সমালোচকেরা এই ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসতত্ত্বে সাধারণতঃ বিশ্বাস করতে চান না। গত শতকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গানের পর যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এসেছে তার ফলে আমরা অনেকেই উগ্র সমাজবোধের দাবী ঘোষণা করছি। আমাদের কাছে সমষ্টি-রূপটাই, অন্ততঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে, বড়ো হয়ে উঠেছে। আমরা দাবা করছি, যে সাহিত্য আমাদের সমাজবোধের সহায়ক নয় সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়। বলা বাহুল্য, এ কথা সুস্থ মনের কথা নয়। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক কি তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেখানে বলবার চেষ্টা করেছি, সাহিত্য এক হিসেবে বাস্তবিকই অন্যফলনিরপেক্ষ, কেন না সে তো শিল্পীর মনের সৃষ্টি। কিন্তু শিল্পীর মন নিশ্চয়ই নির্বাতাস কাঁচের ঘরে থাকে না, পৃথিবীর জল-হাওয়াতেই তার পরিপুষ্টি, সেইজন্য চারপাশের ঘটনা-সংস্থানে তাঁর চিত্ত যে ভাবে স্ফুরিত হল, তার মধ্যে সমাজের ছায়া পড়া স্বাভাবিক। এইখানেই দুয়ের যোগসূত্র। সমাজ ও কবিমানস, সম্প্রতি ও চিরন্তন, বন্ধন ও অবন্ধনের ঠোকাঠুকিতেই কাব্যদীপ্তি চমকে ওঠে।

কবিমানসের স্ফুরণের জন্য সমাজ কতটা দায়ী, সে স্ফুরণ সমাজের সঙ্গে বিরোধমুখে, না অন্বয়মুখে হচ্ছে, এ নির্ভর করে নানা ঐতিহাসিক কারণের উপরে। যে দেশের সমাজই শক্তির আধার, যেখানে

রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা যে কোনো কারণেই হোক সমষ্টিবোধ দৃঢ়, সেখানে কবির সঙ্গে সমাজের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠ, যোগাযোগও দৃঢ় এবং সম্ভবতঃ অন্বয়মুখীন। এর নানা বৈচিত্র্য আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিন্তু মোট কথাটা এই যে, কাব্য অন্যফলনিরপেক্ষ হলেও অন্যপ্রভাব-নিরপেক্ষ নয়। তার আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর কি না জানিনে, তবে এ কথা নিশ্চিত যে সে রস ঊর্ধ্বমূল অবাঙ্‌শাখ নয়। ব্রহ্মের মতো সে রসের হঠাৎ স্ফুরণ হয় কি না জানা নেই, তবে তার বিভাব নিশ্চয়ই মায়া বা প্রতিভাস নয়। রসের অলৌকিকত্ব স্বীকার করি আর নাই করি, তার গোড়ার কথাটা লৌকিক এ কথা তো 'সাহিত্যদর্পণ'-এও স্বীকৃত হয়েছে। সেকালের ইতিহাস আমরা যথেষ্ট জানি না, কিন্তু সেকালের কাব্যের theory এবং practice আলোচনা করলে দেখা যায় তার মধ্যেও সামাজিক হাওয়াবদলের সঙ্গে কাব্যের ও কাব্য-শাস্ত্রের সুরবদলের চিহ্ন আছে। অন্ততঃ কয়েকটা বড়ো বড়ো লক্ষণ সুস্পষ্ট।

২

প্রথমে থিওরির কথা।

সেকালের আলংকারিকদের মধ্যে কেউ অলংকার, কেউ রীতি, কেউ ধ্বনি, কেউ বা রস প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। ফলে, কারও মতে কাব্য সার্থক হয় অলংকারের জোরে, সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারলেই কাব্য হলো। কেউ বললেন, কাব্য সার্থক হয় রীতি বা রচনাভঙ্গীর জোরে, স্টাইলের জন্যই কাব্য কাব্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্য আলংকারিকরা বলেছেন, অলংকার বা রীতি কাব্যের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও আসল কথা তা নয়, আসল কথাটা হচ্ছে ধ্বনি। যে অর্থ লুকিয়ে আছে সেই অর্থটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই কাব্য সার্থক হয়। পরের যুগের আলংকারিকরা বললেন, কাব্যের আসল ব্যাপারটা হচ্ছে রস; সে রসসৃষ্টির জন্য অলংকার,

রীতি, ধ্বনি যা কিছুর দরকার হোক না কেন, কাব্যের আত্মা হচ্ছে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস, তারই ফলে কাব্যের সার্থকতা।

এই মতবাদগুলির বিস্তৃত বিবরণ ও বিশেষ বিচার এখানে সম্ভবপর না হলেও এগুলি উল্লেখ করার কারণ এই যে, এগুলি থেকে সে যুগের মনের ক্রমবিকাশের এবং সেইসঙ্গে সমাজবিকাশের একটা হদিস মেলে। নানা মতবাদের পর যে মতটি সে যুগে শেষে প্রবল হয়ে উঠেছিল সে হচ্ছে রসের স্বপক্ষের মত। এ মতের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় 'সাহিত্যদর্পণ' ও 'রসগঙ্গাধর' নামে বই দুটাতে। এ বই দুটীর রচনাকাল আনুমানিক ষোল শতাব্দী ও সতের শতাব্দী। 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বলেছেন কাব্য হচ্ছে রসাত্মক বাক্য; কিন্তু রস বলতে আমরা বুঝি এমন একটি জিনিস যা পাঠক বা দর্শকদের সত্ত্বোদ্রেক করে, যা অখণ্ড, যা আনন্দচিন্ময়, যা বিষয়ান্তরের স্পর্শশূন্য, যা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন কর্মপ্রবৃত্তির মূলস্বরূপ রজঃ ও অজ্ঞানের মূলস্বরূপ তমঃ অভিভূত হলে মনে যে ভাবটীর উদয় হয় সেইটেই সত্ত্ব। অর্থাৎ কাব্যের রস আমাদের কর্মপ্রেরণা জোগাবার জন্যে নয়, সে হচ্ছে ব্রহ্মের মতো স্বপ্রকাশ ও চিন্ময়। তাতে অন্য কিছুর ছোঁওয়া থাকে না।

রসের স্বরূপ যদি এই হয় তা হলে কাব্য কি ভাবে আমাদের মনে আনন্দ জোগাতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটা বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'সাহিত্যদর্পণ'কার রসসৃষ্টির কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন, রসসৃষ্টির মধ্যে কি এমন কৌশল আছে যার ফলে আমাদের প্রতিদিনকার দুঃখ কষ্টও কাব্যে রমণীয় হয়ে ওঠে—

কিংচ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥ ৩।৫

যদি আমাদের লৌকিক জীবনের সুখদুঃখ দুই-ই কাব্যে রমণীয় না হয়ে ওঠে, তা হলে তো রামায়ণ প্রভৃতি করুণরসাত্মক গ্রন্থ আমাদের দুঃখই

দিত। কিন্তু সার্থক কাব্যে তা হয় না, দুঃখও সুখের কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, 'কথং দুঃখকারণেভ্যঃ সুখোৎপত্তিঃ'—দুঃখের কারণ হতে কি ভাবে সুখের উৎপত্তি হয়? এই কাব্যকৌশল বুঝতে হলে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন, মানুষের মনে নানা অন্তর্নিহিত ভাব আছে, যা সবসময়ে পরিস্ফুট না হলেও কখনই একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। এই ভাবগুলিকে বলা হয় স্থায়ী ভাব।

> অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
> আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥ ৩।১৭৪

এই স্থায়ীভাবগুলি তিরোধান করতে পারে না, এই ভাবগুলিই কাব্যাস্বাদের অঙ্কুরমূল। প্রধান প্রধান স্থায়ী ভাব নয়টি—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম। এগুলি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, সুতরাং এগুলি লৌকিক। কাব্যে 'বিভাব', 'অনুভাব' প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে এই স্থায়ী ভাবগুলি রসে পরিণত হয়। উৎসাহ-রূপ স্থায়ী-ভাব বীররসে পরিণত হয়, শোক করুণরসে পরিণত হয়, ভয় পরিণত হয় ভয়ানক রসে। এই রসে পরিণত হলেই স্থায়ীভাবের লৌকিকত্ব কেটে গিয়ে একটা অলৌকিকত্বের সৃষ্টি হয়, যে অলৌকিকত্বের ফলে শোকও করুণরসে পরিণত হয়ে আমাদের আনন্দ দিতে পারে।

> হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
> শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ॥
> অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
> সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥ ৩।৬-৭

শোক হর্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত লৌকিক ভাব আমাদের মনে আছে, কাব্যের সংশ্রয়ে অলৌকিক বিভাব প্রভৃতির সহায়তায় তা থেকে সুখ সঞ্জাত হয়।

এইখানে বিভাব, সঞ্চারীভাব, অনুভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-একটা

কথা বলা যেতে পারে। বিভাব হচ্ছে সেই সেই জিনিস যার সহায়তায় স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। বিভাবের দুটী শ্রেণী,—উদ্দীপন আর আলম্বন। যে সমস্ত জিনিসের সহায়তায় স্থায়ীভাব উদ্দীপিত হয়ে রসে পরিণত হয়, তাকে বলা হয়েছে উদ্দীপন বিভাব—যেমন নায়িকার বিলাস বা চন্দ্রের কিরণ রতিরূপ স্থায়ীভাবের উদ্দীপনে সহায়তা করে। আর যে জিনিসকে অবলম্বন করে স্থায়ীভাব উদ্দীপিত হয় তার নাম আলম্বন বিভাব,—যেমন ধীরোদাত্ত নায়ক। সঞ্চারী ভাব হচ্ছে নানা ছোটো ছোটো mood—যা প্রধান ভাবের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। অনুভাব বলতে বোঝায় রসের বাহ্যলক্ষণ। যেমন ইন্দুমতী স্বয়ম্বরসভায় আসা মাত্র কোনও রাজা লীলারবিন্দ নাড়তে লাগলেন। এইরকম নানা আঙ্গিকের সহায়তায়, নানা উপায়ের মধ্য দিয়ে, স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, রসের অলৌকিকত্বই তা হলে আনন্দের হেতু, কিন্তু লৌকিক থেকে অলৌকিক জন্মায় কি উপায়ে? বিভাব আমাদের স্থায়ীভাবের লৌকিকতা নষ্ট করে কি কৌশলে? বিশ্বনাথ বলচেন বিভাবের একটা ক্ষমতা আছে যার বলে সে পাঠকের মনের স্থায়ীভাব আর কাব্যের পাত্রপাত্রীদের স্থায়ীভাবকে এক করে দেয়। এই একীকরণ হলে পরে মনে হয় কাব্যের ঘটনা যেন আমাদের নিজেদেরই জীবনের ঘটনা, অথচ নিজেদের জীবনের ঘটনা নয়-ও। কিন্তু একটা অলৌকিক মায়াজগতের মধ্য দিয়ে না হলে এই একীকরণ সম্ভব হয় না।

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।

বিভাবাদির সাধারণীকরণ নামে একটা ব্যাপার আছে। প্রত্যেকের জীবনের ঘটনা সাধারণ হয়ে ওঠে, 'রামাদিরত্যাদ্যুদ্বোধকারণৈঃ সামাজিকরত্যাদ্যুদ্বোধঃ'—রাম প্রভৃতির রতির উদ্বোধ হতে সামাজিক রতির উদ্বোধ হয়। তখন,

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥ ৩।১২

এই অলৌকিক আনন্দের স্তরে কাব্যের পাত্রপাত্রী ও পাঠক-দর্শকেরা মিলিত হন বলেই তাঁদের সত্ত্বোদ্রেক হয়, কষ্টেও সুখ জন্মায়। এই অলৌকিক আনন্দ সকল হৃদয়ে সম-বাদী, প্রত্যেকের মনেই তা সমানভাবে বেজে ওঠে। তার কারণ এ ব্যক্তিবিশেষের কথা হয়েও ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়, লৌকিকের মধ্য থেকেও লৌকিকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে অলৌকিকত্বের সীমায় পৌঁছল। এইখানেই রসসৃষ্টির কৌশলের মূল কথা—এইকারণেই কাব্য সার্থক হয়ে ওঠে, তার মধ্যে আমাদের দুঃখ-কষ্টও একটি মনোজ্ঞ সুষমায় ভূষিত হয়ে আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যদর্পণ রচিত হবার অনেক পরে যখন রসগঙ্গাধর রচিত হল তখন দেখা গেল উভয় লেখকই রসের প্রাধান্য স্থাপনা করতে উৎসুক হলেও দুয়ের থিওরি বা দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। জগন্নাথের মতে কাব্য রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক শব্দ। রমণীয়তার অর্থ হচ্ছে লোকোত্তর-আহ্লাদজনক-জ্ঞানগোচরতা, যে জ্ঞান থেকে লোকোত্তর আহ্লাদ জন্মায় সেই জ্ঞান পাওয়া। লোকোত্তর কথাটি, পূর্বের মতো, তার বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তবুও সাহিত্যদর্পণের যে মত বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, সে মত ইনি গ্রাহ্য করেন নি। "বস্ত্বলংকার-প্রধানানাং কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তেঃ।" অর্থাৎ কাব্যকে যদি শুধুই রসাত্মক বাক্য বলে স্বীকার করতে হয়, তা হলে বস্তুপ্রধান এবং অলংকারপ্রধান কাব্য অকাব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মহাকবিদের কাব্যেও এরকম বস্তুপ্রধান অংশ আছে যার কাব্যত্ব অস্বীকার করা চলে না। সেইজন্য কাব্য হতে এগুলিকে বাদ দিলে মহাকবিরাও আকুল হয়ে উঠবেন, "ন চেষ্টাপত্তিঃ, মহাকবিসম্প্রদায়স্যাকুলীভাব-প্রসঙ্গাৎ।" যাঁরা কাব্য রসাত্মক বাক্য এই মত পোষণ করেন তাঁরা হয়তো বলতে চাইবেন কাব্যের মধ্যে বস্তু বা অলংকার আলাদা স্বীকার করার দরকার নেই, কেননা এদের পরিণাম সার্থকতা রসসৃষ্টির সহায়তায়। একটু কঠিন কথায় বলতে হলে বলতে হয় বস্তুধ্বনি,

অলংকারধ্বনির পর্যবসান রসধ্বনিতেই। কিন্তু জগন্নাথের মতে এ উত্তর অচল, কেননা 'তথা চ জলপ্রবাহবেগনিপতনোৎপতনভ্রমণানি কবিভির্বর্ণিতানি। ন চ তত্রাপি যথাকথঞ্চিৎপরম্পরয় রস-স্পর্শোঽস্ত্যেবেতি বাচ্যম্",—মহাকবিরা জলপ্রবাহ, বেগ, নিপতন, উৎপতন, ভ্রমণ ইত্যাদি অনেক জিনিস বর্ণনা করেন যার সঙ্গে রসের কোনই সংস্পর্শ নেই, অথচ তার কাব্যত্বও অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং কাব্য সার্থক হয় শুধু রসাত্মক বাক্যের জোরে নয়, কেননা তাতে রসধ্বনি ছাড়াও আরও নানা জিনিস থাকে এবং অপরিহার্য-ভাবেই থাকে। সেইজন্যে কাব্য হচ্ছে রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক শব্দ যার থেকে লোকোত্তর আনন্দ জন্মায় এবং তার হেতু হচ্ছে কবিপ্রতিভা। "তস্য চ কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা। সা চ কাব্যঘটনানুকূল-শব্দার্থোপস্থিতিঃ। তদ্গতং চ প্রতিভাত্বং কাব্যকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধো জাতিবিশেষ উপাধিরূপং বাখণ্ডম্। তস্যাশ্চ হেতুঃ ক্বচিদ্দেবতা-মহাপুরুষপ্রসাদাদিজন্যমদৃষ্টম্। ক্বচিচ্চ বিলক্ষণব্যুৎপত্তিকাব্যকরণা-ভ্যাসৌ। ন তু ত্রয়মেব।" সেই কবিপ্রতিভা কাব্যঘটনার অনুকূল শব্দার্থকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে—এই প্রতিভার একটি অখণ্ডরূপ আছে। অদৃষ্ট বা অভ্যাস বা ব্যুৎপত্তি এ ছাড়া এ প্রতিভা পাওয়া যায় না।

প্রতিভার অখণ্ডত্বের উপর এই যে ঝোঁক দেওয়া হল তার ফলে এখানে একটু নতুনত্ব দেখা দিল। পূর্বের আলংকারিকদের ধারণা ছিলো কাব্য ভালো হতে হলে একেবারে নির্দোষ হওয়া দরকার, তাতে একটুও খুঁত থাকবে না। মম্মট কাব্যপ্রকাশে বলেছিলেন কাব্য হচ্ছে অদোষ, শব্দার্থসমন্বিত, সগুণ, তাতে অলংকার থাকলেও চলে না থাকলেও চলে। কিন্তু কাব্যকে যদি নির্দোষ হতে হয় তা হলে সেরকম শাস্ত্রসম্মত কাব্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, খুঁজবার দরকারও নেই। বাস্তবিকপক্ষে একটি শ্লোকের একাংশে দোষ থাকলে সেটি অকাব্য এবং অপর অংশগুলি কাব্য—এরকম বিভাগ করা চলে না।

একটি শ্লোক কাব্যাংশ বা কাব্য পড়ে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় সে একটি অখণ্ড ভাব—তার মূলে আছে দোষগুণ জড়িয়ে সমগ্র কাব্যটিই। দোষগুণ মিলিয়ে সমগ্রভাবে কাব্য যদি সহৃদয়দের মনে একটি লোকোত্তর আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে তা হলেই কাব্য সার্থক হলো। সেইজন্য জগন্নাথ কাব্যতত্ত্বকে যেদিকে মোড় ফেরালেন তার ফলে কাব্যবিচার সম্ভবতঃ কঠিনতর হয়ে উঠল। কেন না, তাঁর মতে একদিকে আছে কবিপ্রতিভা আর অন্যদিকে আছে সহৃদয়-হৃদয়। বলা বাহুল্য, দণ্ডী প্রভৃতিরা যে সব বাঁধা ধরা লক্ষণ বলে-ছিলেন তাতে আমাদের কাব্যবিচার সহজ হতো, কিন্তু এই মত অনুসারে সমালোচক বাস্তবিক সহৃদয় কিনা এবং কবির প্রতিভা আছে কিনা সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা চলে না, সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্, যাঁরা কাব্যরসিক তাঁদের অনুভবই সেখানে একমাত্র প্রমাণ। কাব্যত্বের প্রমাণ বস্তুগত হতে ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। এইটিই এখানে বিচার্য বিষয়।

৩

কাব্যবিচারে এই বস্তুগত প্রমাণ ছেড়ে ব্যক্তিগত প্রমাণের উপর ঝোঁক পড়ার একটা সামাজিক কারণ থাকে। শুধু কাব্যবিচারে নয়, জীবনের অন্যান্য দিকেও দেখা গেছে সমাজে দুটি আদর্শ সাধারণতঃ আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে। কোনও সময় ব্যষ্টির উপর সমষ্টির প্রাধান্য, কখনও সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির বিদ্রোহ। অবশ্য কথাটা মূলতঃ এই হলেও বাস্তবিক এত সহজ নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ব্যষ্টির উপর সমষ্টির প্রাধান্য আর সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির বিদ্রোহ, কথাটা ঠিক এ ভাবে বলা চলে না। কারণ এ ভাবে বললে মনে হয় ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে সবসময় একটি দ্বন্দ্ব চলেছে, যখন যেটি প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। মানুষ পরস্পর একটি সামাজিক সত্তায় মিলিত তার অন্ততঃ একটি অনস্বীকার্য প্রমাণ তারা যে

ভাষায় কথা বলে সে ভাষা পশুদের মত ইঙ্গিতের ভাষা নয়, তার একটি অর্থ আছে এবং সে অর্থ অপরকে বোঝাবার জন্যই বলা হয়। সেজন্য সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির নিরন্তর সংঘর্ষ কল্পনা করলে ব্যষ্টির স্বরূপকে অতিরঞ্জিত করা হয়। সমষ্টিসত্তা সব সময়েই আছে, কিন্তু কোনও সময়ে সেই সত্তার সঙ্গে ব্যষ্টির অন্বয়, কোনও সময়ে সংঘর্ষ। মানুষের পক্ষে একটি সামাজিক সত্তায় পরস্পর মিলিত হওয়াই যদি স্বাভাবিক হয় তা হলে স্বীকার করতেই হয় ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির অন্বয়মুখীন সম্বন্ধটাই স্বাভাবিক, বিরোধ ঘটলে বুঝতে হবে কোথাও গোল বেধেছে।

মানবসভ্যতার আদিম যুগে দেখা গেছে সে যুগে মানুষ সাধারণতঃ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত। সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার পর মানুষের একটা স্বাভাবিক বোধ জন্মায় প্রকৃতির রুদ্রলীলা থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে পরস্পর মিলিত হওয়া দরকার। সেইজন্য হিংস্রতার যুগ বা যাযাবর যুগ কাটবার পর কৃষিসভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি সমাজসংহতি গড়ে ওঠে—বাইরের আঘাত হতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি স্থগিত থাকে। সে যুগে অভাববোধ কম, দাবী অল্প, পরস্পরবিরোধী স্বার্থ প্রবল হয়ে ওঠে নি, বাইরের আঘাত প্রবল। সেইজন্য একটি সমাজসংহতি দেখা যায় যদিও এই সংহতির মধ্যে সচেতনতা নেই, অনেকটা বাইরের চাপে অনেকটা সহজ সংস্কারের ফলে এই সংহতি বজায় থাকে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একধারে যেমন জ্ঞানোন্মেষ হতে থাকে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক স্বার্থও গড়ে উঠতে থাকে। তখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানা স্তরবিভাগ হয়, শ্রেণীভেদ হয়, গোষ্ঠীস্বার্থে বা দলগতস্বার্থে সমাজসংহতি নষ্ট হতে থাকে। সেইজন্যে প্রথম যুগে কাব্য অনেকসময় গান, collective emotion, কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার সেই সংহতিবদ্ধ রূপও নষ্ট হয়। এই সংহতি নষ্টের সেকালের একটি চরম উদাহরণ দাস সমাজ। মুষ্টিমেয় প্রভুদের কাছে দাসেরা বিক্রীত, তাদের স্বতন্ত্র কোনো অধিকার নেই। দাস সমাজের পর যখন সামন্ততন্ত্র দেখা দিলো তখন সামন্তেরা

প্রভু হলেও দাসদের জীবনমরণের অধিকার তাদের রইলো না, বরং এর শেষের যুগে দেখা যায় বাণিজ্যগোষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, যারা সামন্ততন্ত্রেরই অঙ্গ হলেও সামন্তসম্প্রদায় হতে বিভিন্ন। এইরকম স্তরবিভাগ চরমে পৌঁছল ধনতান্ত্রিক সমাজে। সামন্ততন্ত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে উঠলেও তার মধ্যে একটি সংহতি ছিল, কেননা তখন অর্থনৈতিক স্বার্থেই ব্যক্তিপ্রাধান্য প্রচার করা চলতো না, গোষ্ঠী ছাড়া ব্যক্তির শোষণ ক্ষমতা তখনও অতো বড়ো হয়ে ওঠে নি। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিবিশেষের লোভ ও ক্ষমতা দুইই বেড়ে গেল। সেইজন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার হতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অত্যাচারিতদের মুক্তি দিলে স্বাধীন চুক্তির নামে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই স্বাধীন চুক্তিও আর এক অত্যাচারের ছদ্মবেশে পরিণত হলো। সেইজন্যই এ যুগের সমাজদর্শন হচ্ছে ব্যষ্টির প্রাধান্য, বক্তব্য ছিলো, ব্যষ্টির প্রাধান্য স্বীকার করলেই সামাজিক প্রগতি সম্ভব। এই সমাজদর্শনের ফলে জগৎ যেখানে পৌঁছেছে সেখান হতে তাকে উদ্ধার করে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্থাপনা করার জন্যই সাম্যবাদের জন্ম। সমষ্টির মধ্যেই ব্যক্তিবিশেষ তার সাফল্য লাভ করে, তাতেই সামাজিক ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভব, তা না হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে মুষ্টিমেয় ক'জন বহুর উপর অত্যাচার করবেই।

সমাজের অগ্রগতি সাধারণতঃ এই পথে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন যুগে সমষ্টি ও সংহতির উপর যে ঝোঁক পড়েছে সেগুলির চেহারা কিন্তু এক নয়, কারণ সমাজের অগ্রগতি সে হিসেবে কম্বুরেখায় চলে। বর্তমানে যে নতুন সংহতি গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে তার মানে নয় আমরা মানবসভ্যতার আদিম অবিজ্ঞানে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি। দুই-এ অনেক তফাৎ; প্রথমটী আত্মসচেতন ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়টি অত্যন্ত আত্মসচেতন—প্রথমটিতে সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টির নির্ভর আত্মসমালোচনা ও

যুক্তিতর্কের উপর। সেকালের কাব্যকলা আলোচনা করতে হলে সেইজন্য হঠাৎ এ যুগের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, অন্ততঃ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নয়, যদিও তাদের মধ্যে অনেক আপাত-সাদৃশ্য থাকে। সেযুগের কাব্যকলার সামাজিক পটভূমিকা বুঝতে হলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লেখকদের মধ্যে কি পরিবর্তন এলো এবং সেইসময় অন্যদেশের কাব্যরসিকেরা কি দৃষ্টিভঙ্গীতে কাব্যালোচনা করতেন, সেই কথাগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা যে যুগের কাব্যশাস্ত্রের কথা আলোচনা করছি সে যুগের ইতিহাস সমাজের বিস্তৃতি ও স্তরবিভাগ গড়ে ওঠার ইতিহাস। সে সময় জীবনযাত্রার আদিম ভাব আর নেই, রাষ্ট্র আছে, রাজা আছেন, ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্তরবিভাগ গড়ে উঠেছে। আর সে সময়েও সেকালের মতো একটি ধনতন্ত্র (একে 'ধনতন্ত্র' বলা চলে কিনা সন্দেহ, কারণ ধনসঞ্চয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ থাকলেও সামাজিক গতির যে পর্যায়ে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব এবং সামাজিক গতিকে ধনতন্ত্র যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তা এসময়ে ছিল কিনা সন্দেহ) গড়ে উঠছিল, যার ফলে একদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। সংস্কৃত আলংকারিকরা সাধারণতঃ এই যুগের মানুষ; শেষের যুগের যে আলংকারিকদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের মানস ঐতিহ্যও এই। সে কারণে, যদি সামাজিক স্তরবিভাগ গড়ে ওঠার ইতিহাসই সেকালের ইতিহাস হয় তা হলে আলংকারিকদের মধ্যে ক্রমশঃ বস্তুগত প্রমাণ হতে ব্যক্তিগত প্রমাণের উপর ঝোঁক পড়াও স্বাভাবিক, কেননা স্তরবিভেদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিপ্রাধান্যের কথা ওঠা সামাজিকভাবে স্বাভাবিক। সেইজন্য বিশ্বনাথ বা জগন্নাথ ব্যক্তিগত প্রমাণের উপর ঝোঁক দিলেন তা নিতান্ত আকস্মিক নয়। এর পিছনে আছে সমাজের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। এঁদের আগের ও পরের যুগের লেখকদের রচনার সঙ্গে তুলনা করলেই সে ইতিহাসের সন্ধান মেলে।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায় সাহিত্যদর্পণের অন্ততঃ আটশো বছর আগে দণ্ডী যখন তাঁর কাব্যাদর্শ রচনা করেছিলেন তখন কাব্যতত্ত্ব ছিল নেহাতই ঢিলে ব্যাপার, তার মধ্যে বেশী বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেইজন্যে তাঁর বই-এর নাম কাব্যাদর্শ, কাব্যসূত্র নয়—কেননা আলংকারিকরা কেবল আদর্শের কথাই বলবেন, তাঁদের সূত্রমতো কাব্যরচনা করতে হলে প্রতিভার অপমৃত্যু অনিবার্য। তা ছাড়া আরও লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি এক কথায় কাব্যের কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নি, কেননা তাতে বিপদ হবেই। ভালো কাব্যে কি কি থাকা দরকার কাব্যাদর্শের প্রথমে তারই বর্ণনা দেবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। তিনি কল্পনা করেছেন, কাব্যের শরীর হচ্ছে ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন-পদাবলী, তার আবার কতকগুলি অলংকার আছে। এ ছাড়া দরকার, ভাষার সৌন্দর্য এবং বলার ভঙ্গী (রীতি)। সেইসঙ্গে প্রয়োজন মাধুর্যের, যা কাব্যে রসরূপে থাকে। এ নিয়ে কূটতর্ক না তুললেও সহজবুদ্ধিতেই বোঝা যায় কাব্যের মধ্যে যে যে উপকরণ আমরা খুঁজি সেগুলির তালিকা এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনও অদ্বৈত সূত্রে তাদের ব্যাখ্যা করার চেস্টা হয়নি। সেইজন্য দণ্ডীর মতে পাঠক কাব্য হতে রস পান সম্ভবতঃ কোনও অলৌকিকত্বের জন্য নয়, ঐসব গুণ থাকার জন্য। বলা বাহুল্য, এ প্রথম যুগের কথা।

কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখা গেল উপরি উক্ত গুণগুলি সব সমান দরের নয়। অলংকারের চেয়ে বলার ভঙ্গীটাই হয়তো কাব্যের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়। এইরকম নানা মতবাদের মধ্য দিয়ে আমরা যখন আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে এসে পৌঁছলাম, তখন দেখা গেল কাব্যতত্ত্ব আর একটি মোড় ফিরেছে, আর এক ধাপ এগিয়েছে। আনন্দবর্ধনও কাব্যের ঠিক কোনো সংজ্ঞা দেন নি, কিন্তু তিনি বললেন কাব্যের মধ্যে ধ্বনিই হচ্ছে প্রধান। অর্থাৎ যখন উপরকার অর্থ ছাড়িয়ে আর একটি নিগূঢ় অর্থ ফুটে ওঠে, সেইখানেই কাব্যত্ব।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যক্ত কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

ধ্বন্যালোক, ১।১৩

যেখানে কাব্যের শব্দ বা তার অর্থ নিজেদের প্রাধান্য ত্যাগ করে আর একটি অর্থকে সূচিত করে সেইখানেই ধ্বনি হয়। অর্থাৎ বাচ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ ছাড়া আর একটি অর্থ ব্যঞ্জিত হলে সেই ব্যঙ্গার্থই ধ্বনি। এবং তাই কাব্যের মূল কথা। লক্ষ্য করতে হবে, প্রথম জটিলতার আবির্ভাব এইখানে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সহজবুদ্ধি লোপ পায়, তখন তার ভাষা, শব্দ, বক্তব্য আদিম ঋজুতা ত্যাগ করে নানা কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি সামাজিক জটিলতারই ফল, এইভাবে সামাজিক জটিলতা যখন অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তখন কাব্যও অত্যন্ত ব্যক্তিগত উপকরণে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দণ্ডীর মধ্যে এরকম কোনও তির্যক্ ভঙ্গী নেই—কিন্তু এর প্রথম সূত্রপাত আনন্দবর্ধনে। ঠিক এই কারণেই আনন্দবর্ধনই প্রথম আভাস দিলেন, কাব্যের সৌন্দর্য একটা অবর্ণনীয় জিনিস যা অনুভব করা যায় কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥

ধ্বন্যালোক, ১।৪

মুক্তাফলে যেমন একটি ছায়া টলমল করে তেমনি অঙ্গনাদের অঙ্গে অবয়ব ছাড়া একটি লাবণ্য থাকে। মহাকবিদের বাণীতেও তেমনি অবয়ব-অতিরিক্ত একটি বস্তু আছে। কাব্যের লাবণ্য অবর্ণনীয় হলে তার কোন বাঁধাধরা লক্ষণ করা চলে না, সুতরাং বেদ্যতে স হি কাব্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্ (ধ্বন্যালোক, ১।৭)। সমাজের প্রথম যুগে যখন শ্রেণীভেদ হয় না সে সময় কাব্যের একটি সার্বজনীনতা থাকে, সমাজ আর পাঠকসমাজ সেখানে নামান্তর মাত্র। কিন্তু জটিলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সকল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মানসিক উপকরণ তফাত

হতে বাধ্য। সে সময় কবিও সামাজিক সার্বজনীনতার উপাসক থাকেন না, ফলে তাঁর পাঠকসমাজও শ্রেণীবদ্ধ। সেইজন্য এযুগের জীবনদর্শনে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমাজপ্রাধান্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা। এই চেষ্টা শেষের যুগে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেও প্রথম যুগে পরোক্ষ,—নানা মিস্‌টিক্ মতবাদ, দৈবী অনুশাসন আবিষ্কারের চেষ্টা সে সময় দেখা যায়। ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের প্রাচীন যুগের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কড্‌ওয়েল বলেছেন, What in fact is this emotional complex of tribal poetry? It is a social reality. ... A new form of religion begins when the mytholigising era ends. Religion becomes 'true' religion. How has this come about? Only because society has separated itself from itself; because the matrix of religion has become only a part of society, standing in antagonism to the rest of society. 'True' religion marks the emergence of economic classes in society ... This division of the undifferentiated tribe into a class of supervisors who exercise thought, and a class of workers who only work, is reflected by a similar dichotomy in religion and art. দণ্ডীর তুলনায় আনন্দবর্ধনের মধ্যে এই differentiation এর পরিচয় যথেষ্ট।

এর পরের যুগে কাব্যশাস্ত্র যে রূপ ধারণ করেছে সে-ও সমাজ-বিবর্তনের প্রচলিত তত্ত্বের বাইরে নয়। আনন্দবর্ধনের মধ্যে সমাজ-অস্বীকৃতির প্রথম আভাস থাকলেও সেটি তখনও প্রবল নয়। আনন্দবর্ধন স্বীকার করেছিলেন, যে ধ্বনি কাব্যের আত্মা সে ধ্বনি তিন রকম,—বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি আর রসধ্বনি। অর্থাৎ কাব্যে প্রথম অর্থ ছাড়িয়ে আর একটি নিগূঢ় অর্থে পৌছন তিনভাবে সম্ভব হতে পারে। যে জিনিষটি ব্যঞ্জিত হল সেটি একটি বস্তু

হতে পারে। বস্তুধ্বনি বোঝাতে গিয়ে আনন্দবর্ধন একটি শ্লোক তুলেছেন—

> ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
> গোদানদীকচ্ছকুঞ্জনিবাসিনা দৃপ্তসিংহেন। ধ্বন্যালোক, ১।৪

এর আপাততঃ অর্থ মনে হয় "হে ধার্মিক, তুমি এবার নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াও; গোদাবরী নদীর কুঞ্জে যে দৃপ্ত সিংহটি বাস করে সেই সিংহ কুকুরটিকে আজ মেরে ফেলেছে।" কিন্তু এর প্রকৃত বক্তব্য এ নয়। এর আসল ইঙ্গিত হচ্ছে নিশ্চিন্তে বেড়ানো ঠিক নয়, কেননা কুকুরের বদলে সিংহ দেখা দিয়েছে। এখানে বাচ্য অর্থ ছেড়ে আর একটি ব্যঙ্গ অর্থ অভিলষিত হওয়ায় ধ্বনি হয়েছে, সে ধ্বনি বিধিরূপে প্রতিষেধরূপ, কিন্তু যে জিনিসটি ধ্বনিত হয়েছে সেটি একটি খবর, বস্তু,—কোনও অলংকার বা ভাব নয়। সুতরাং এখানে ধ্বনি হয়েছে এবং সে ধ্বনি বস্তুধ্বনি।

কিন্তু যতো দিন কাটতে লাগলো কাব্যে বস্তু ও অলংকারকে স্বীকার করতে ততোই আপত্তি প্রবল হতে লাগল। এমন কি আনন্দ-বর্ধনের টীকাকারই কটাক্ষ করলেন, ঐ কথাটা কেবল মাত্র প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, সে হিসাবে ওটি হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা নয় (যস্তু ব্যাচষ্টে ব্যঙ্গ্যানাং বস্ত্বলংকাররসানাং মুখেন ইতি স এবং প্রষ্টব্য এতৎ তাবৎ ত্রিভেদত্বং ন কারিকাকারেন কৃতং বৃত্তিকারেন তু দর্শিতম্—অভিনবগুপ্ত)। সেইজন্যে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি আলাদা করে স্বীকার করার কোন দরকার নেই, কেননা রসধ্বনিতে পর্যবসান হলেই তাদের সার্থকতা। ধ্বন্যালোকের টীকাতেই অভিনব-গুপ্ত এই মোচড় দেবার চেষ্টা করেছেন—তার পরের যুগের লেখকদের মধ্যে এই মতবাদ আরও স্পষ্ট, মম্মটের কাব্যপ্রকাশে খোলাখুলি ভাবেই বলা হল রীতি, অলঙ্কার বা ধ্বনির অর্থই থাকে না যদি তাতে রস না থাকে। কারণ, ও সবগুলির সম্বন্ধ ও সার্থকতা রসে।

৪

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দণ্ডী হতে জগন্নাথ পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বছরে কাব্যতত্ব যে পথে এগিয়েছিল সে হচ্ছে জটিলতার পথ, সমাজের শ্রেণীভেদের ফল। প্রথম যুগের বস্তু, ধ্বনি, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি ক্রমশঃ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হলো; শেষের দিকে বলা হলো এ রস আবার সাধারণ রস নয়, এ অলৌকিক রস, ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর, এর সাধারণ মানবিকতা ঘুচে গিয়ে একটা রহস্যময় এবং অদ্বৈত তত্ত্ব গড়ে ওঠবার চেষ্টা হলো, যা এক হিসেবে সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্ন। অবশ্য এখানে খুব বড়ো একটা আপত্তি ওঠে, কাব্যে রস থাকবে এই কথা বলা যদি অবক্ষয়ের চিহ্ন হয় তাহলে কি রসহীন কাব্যই প্রগতির লক্ষণ? তা অবশ্য কখনই নয়, কারণ আদিম যুগ হতে কাব্যের অর্থই হচ্ছে রসবোধ সৃষ্টি করা, সে হিসেবে রসহীন কাব্য কাব্যই নয় (আমি রস সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছি) তা প্রগতির লক্ষণ হওয়া দূরের কথা। কিন্তু দেখা গেছে যে যুগ ক্ষয়িষ্ণু নয় সে যুগের রস একটা বড়ো পাঠক সমাজের মনে সাড়া জাগাতে পারে, তার একটা বৃহৎ সামাজিকতা ও মানবিকতা আছে। তার ফলে বহু পাঠকের চিত্তই কবির গানে স্পন্দিত হয়ে ওঠে, তাদের সুখদুঃখের কথা সেই গানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, সভ্যতার আদি যুগে কবি তাঁর এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন ছিলেন না। বর্ত্তমানে যে আত্ম-সচেতন সমাজসংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে তার মধ্যে কবির ধর্মও সচেতনভাবে প্রতিপালিত। কিন্তু অবক্ষয়ের চিহ্ন তখনই দেখা দেবে যখন কবি এই অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত রসতত্ত্বের দোহাই দিয়ে পাঠক সমাজকে অস্বীকার করবেন, বলবেন কাব্য রচিত হয় ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভার গুণে, সেখানে অদলবদলের উপায় নেই—রস হচ্ছে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর, সে কেবল সহৃদয়েরাই উপভোগ করতে পারেন। এর ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, যাঁরা কবির কাব্য বোঝেন না

তাঁরা অসহৃদয়। অর্থাৎ শুধু কাব্য রচনা নয়, কাব্যাস্বাদের জন্যও দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই স্বৈরাচারে কবিধর্মের ক্ষতি ও কবিকর্মের অবনতি। কালিদাসের ধারণা ছিল বিদ্বানদের তুষ্টি না হলে কাব্যরচনা সার্থক হল না, কিন্তু পরের যুগের কবিরা স্বচ্ছন্দে 'কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী' বলে পাঠকসমাজকে অস্বীকার করতে পারলেন। এই রকম অবস্থা তখনই সম্ভব যখন শ্রেণীভেদ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, কবির পাঠকসমাজ সংকীর্ণতর হতে হতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে সময় কবি পাঠকসমাজের সঙ্গে মিলতেই পারছেন না, আহত আত্মাভিমানে, অসুস্থ মনে কেবল আত্মকেন্দ্রিক হতে চলেছেন। প্রত্যেক সাহিত্যেই কোন না কোন সময়ে এই লক্ষণগুলি দেখা যায়, কারণ সমাজ যদি এই স্তরে এসে পৌঁছয় তা হলে সাহিত্যেও এই লক্ষণগুলি দেখা দেবেই। এই অবস্থাটি বর্ণনা করতে গিয়ে কড্‌ওয়েল বলেছেন :

The next phase of bourgeois poetry is therefore that of "commodity-fetishism"—or "art for arts' sake"—this meant a movement which would completely separate the world of art from the world of reality and, in doing so separate it from the source of art itself so that the work would burst like a bubble just when it seemed most self-secure···if an art work is valued *for its own sake* in defiant and rebellious opposition to the sake of a society which now has no use for skill, it is in fact valued *for the artist's sake.* One cannot simply construct random poems. If their associations are not social they are personal, and the more the art work is opposed to society, the more are personal associations

defiantly selected which are exclusive of social—bizarre, strange, phantastic ··· poetry exhibits a rapid movement from the social world of art to the personal world of private phantasy. (*Illusion and Reality*, pp. 109-118) বলা বাহুল্য, ইতিহাসের কম্বুরেখায় কড্‌ওয়েলের বুর্জোয়াসমাজের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য ও তার সমাজের কিছু সাদৃশ্য যদি বা থাকে একাত্মতা নিশ্চয়ই নেই, থাকবার প্রয়োজনও সম্ভবতঃ নেই। কিন্তু তবুও সেকালে যে এইরকম একটি অবস্থার ক্রমিক উদ্ভব হচ্ছিল, কাব্যতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনেই তার প্রমাণ মেলে।

সেকালের কাব্যতত্ত্ব থেকে সেকালের সামাজিক আবহাওয়া অনুমান করা এবং দুয়ের সম্বন্ধ নির্দেশ করা অবৈজ্ঞানিক না হলেও অবিসম্বাদিত সম্ভবত নয়। কিন্তু সেকালের রচনায় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে যা হতে সে যুগের সামাজিক হাওয়াবদল স্পষ্টই অনুভব করা যায়। সে যুগে কাব্যতত্ত্বে সুরবদলের সঙ্গে সঙ্গে (বা পূর্বে) সামাজিক হাওয়াবদল হয়েছিল তা আরও জোর করে বলার অধিকার আমাদের আছে, কেননা প্রথমতঃ কাব্যতত্ত্বের যে যুগের কথাটি আলোচনা করেছি তার আগের ও পরের যুগের কথা আলোচনা করলে আমার বক্তব্যের আরও প্রমাণ মেলে; দ্বিতীয়ত এই রকম সুরবদল যখন শুধু কাব্যতত্ত্বে নয়, অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায় তখন একথা বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় যে সেকালে শুধু কাব্যতত্ত্বই মোড় ঘোরে নি, সেকালের মানুষের সমস্ত মনটাই মোড় ঘুরেছে, গোটা দৃষ্টিভঙ্গীটাই পরিবর্তিত। এরকম সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া হয় না। এই দুটি প্রমাণ ক্রমশ আলোচনা করা যাক।

দণ্ডী যে সময় কাব্যাদর্শ লিখেছিলেন, তার পূর্বে, ডাঃ সুশীল কুমার দে'র মতে, শুধু কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন বই ছিল না। কিন্তু তার আগে ছিল ভরতের নাট্যশাস্ত্র, তার একাংশে কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। অর্থাৎ তখনও কাব্য একটি আলাদা

শাস্ত্র হয়ে ওঠে নি, সে নাট্যের অঙ্গীভূত। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি অর্থবহ। নাট্য হচ্ছে জীবনের প্রতিরূপ, তার মধ্যে জীবনের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া আছে। কাব্যের একমুখীনতার চেয়ে তার সর্বাঙ্গীণতা বেশি। যে যুগে নাট্যের উপর ঝোঁক পড়ে সে যুগে সমাজ-সংহতিও বেশি, কারণ সমাজের সঙ্গে কবির যদি মিল না থাকে তা হলে কবি এমন কিছু রচনা করেন না যা অভিনয় করতে হলে মিলিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই, এবং যা অভিনয় করতে হলে প্রযোক্তাদের সঙ্গে দর্শকদের একটা প্রত্যক্ষ দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। সেইজন্য যে যুগে সমাজের সঙ্গে কবির অমিল সে যুগে কবি কেবল নিজের অন্তর নিয়েই ব্যস্ত, তখন সন্ধান পড়ে শুধু অন্তরদেবতার, তখন কবি পাঠকসমাজকে সমাজের চিত্ররূপ উপহার দেন না বরং তার পরিবর্তে উপহার দেন ব্যক্তিগত কাব্য। This is helped by the swing over of art from forms visibly dependent on men in association—the dance, the song, music, the spontaneous drama and commedia dell' arte—to crystallised records of the art process not therefore visibly dependent on society—the written poem, the musical score, the written play, the picture or sculpture. আর একটি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেও দেখা যায় আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব নাট্যশাস্ত্রেরই অন্তর্গত, কাব্য নাট্যেরই অঙ্গ। ভরত সেইজন্য নাট্যরস ছাড়া কাব্যরস বলে পৃথক কিছু আলোচনা করেন নি।

আশ্চর্যের কথা, কাব্যশাস্ত্রে রসতত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে বহুদিন লাগলেও নাট্যে সে প্রাধান্য বহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছিল। ভরতের মতে রস আটটি, সেগুলি বিভাব প্রভৃতির সহায়তায় ঠিক ঐ ভাবেই আনন্দ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন

স্থায়িভাবগুলির অভিনির্বৃতি রসে, না রসের অভিনির্বৃতি ভাবে। কারও মতে এ দুয়ের পরস্পরের সম্বন্ধতেই অভিনির্বৃতি। কিন্তু ভরত এ মত অস্বীকার করে রসের প্রাধান্য স্থাপনা করেছেন, বলেছেন দৃশ্যতে হি ভাবেভ্যো রসানামভিনির্বৃতিরিতি ন তু রসেভ্যো ভাবনামভিনির্বৃতিরিতি (৬।৩২)। বাস্তবিক, আরিস্টটলের সঙ্গে এই মতবাদ এবং এ যুগের মতবাদের তুলনা করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় নানা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে দুটি পৃথক্ সামাজিক পরিবেশে মতবাদগুলির পৃথক্ চেহারা হয়ে দাঁড়ালো। ভরতের সঙ্গে আরিস্টটলের সাদৃশ্য ঐ সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গীতে, কিন্তু পার্থক্য সেইখানে, যখন আরিস্টটল রসকে অত প্রাধান্য দেন না— তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ছন্দ, রীতি, বস্তু, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরের যুগের মতবাদের সঙ্গে, বিশেষ করে দণ্ডীর সঙ্গে, আরিস্টটলের বহুবিষয়ে সাদৃশ্য আছে। দণ্ডী যেমন অলংকার, রীতি, গুণ, রস—সব কটি উপাদানকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, তেমনি আরিস্টটলেরও বিশ্বাস ট্রাজেডির জন্য প্রয়োজন ছ'টি উপকরণের,—প্লট, চরিত্রচিত্রণ, উপযুক্ত বচন বিন্যাস, প্রসাদগুণ, গান, দৃশ্যাবলী। কিন্তু বিরোধ হচ্ছে আসল কাব্যতত্ত্বে— কি উপায়ে কাব্য আনন্দসৃষ্টি করে। পূর্বে এঁদের অলৌকিক আনন্দের যে থিওরির কথা উল্লেখ করেছি তার গোড়ার কথাটা হচ্ছে কাব্যের আনন্দ অলৌকিক, সেই অলৌকিক মায়ার মধ্যেই কবি ও পাঠকের একীকরণ হয় বলেই লৌকিক ভাব অলৌকিক আনন্দে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত দুঃখও সাধারণীকৃতির ফলে সুখের কারণ হয়। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, কাব্যতত্ত্ব নিছক সামাজিক হতে হতেও হলো না। কবি ও পাঠকের এক হওয়া তখনই সম্ভব যখন কবি পাঠকসমাজের একজন হয়ে কাব্য-রচনা করেন, অন্ততঃ তাঁর কাব্যের একটা সামাজিক দিক্ আছে, সে কেবল ব্যক্তিগত উপকরণে ভারাক্রান্ত নয়। সে হিসেবে যদি তাঁরা

বলতেন, কাব্য আনন্দসৃষ্টি করে আমাদের সুখদুঃখের বেদনাকে বাণীমূর্তি দিয়ে, সে সুখের কারণ কেননা তার মধ্যে আমাদের সেই সামাজিক সত্তার প্রকাশ যেখানে পরস্পরের সুখদুঃখে আমরা পরস্পর মিলিত, তা হলে আমরা কাব্যের একটি লৌকিক তত্ত্ব পেতাম। আরিস্টটলের মতে কাব্য আনন্দ দেয় আমাদের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিয়ে। তাঁর প্রথম কথা, ট্রাজেডি হচ্ছে an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. অর্থাৎ তার বিভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ট্রাজেডির জন্য আরও প্রয়োজন language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play. অলংকার আর গুণের কথা সংস্কৃত সাহিত্যেও নতুন নয়। তা ছাড়া ট্রাজেডি হবে action, narrative নয়। ভরতের মতে নাট্য তাই-ই। কিন্তু আসল কথা হল, আরিস্টটলের মতে ট্রাজেডির কাজ হচ্ছে through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions (VI. 2-3) এই ক্যাথারসিস তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি তাঁর Politics-এ বলেছেন, যে আবেগ আমাদের কষ্ট দেয় সেই আবেগ হতে মুক্তি দেয় বলেই কাব্যে আমরা আনন্দ পাই। সেগুলি হচ্ছে a means of freeing the 'o'er frought heart' from an excessive accumulation of emotion (Newman's Ed. Vol. I p. 367). অর্থাৎ ব্যক্তির কষ্ট এইভাবে সমষ্টির মধ্যে সুখে পরিণত হচ্ছে। এর জন্য কোনও অলৌকিকত্বের দরকার নেই। যখন কষ্টের সাধারণীকরণ করা হলো তখনই সে আর কষ্ট রইলো না, সমষ্টির মধ্যেই তার সার্থকতা। এই থিওরির মধ্যে এমন কোনও কথা নেই যাতে সন্দেহ করা যায় একালের মনোবিকলনবাদীদের মতো তাঁরা সুখদুঃখের সাধারণীকরণকে কেবল আত্মরতির উপলক্ষ্য হিসেবেই ধরেছিলেন, আবার এ থিওরিতে এমন কিছুও নেই যাতে বলা হয়েছে অলৌকিকত্ব

ছাড়া কাব্যের আনন্দ সম্ভব হয় না। যখন সমাজই ব্যষ্টিকে ধারণ করে, সমষ্টিতেই ব্যষ্টির সার্থকতা, এ মত হলো সেই যুগের কথা, কেননা এতে সামাজিকীকরণেই কাব্যের সার্থকতা, কোনো অলৌকিকী-করণে নয়। এ সম্ভব হয়েছিল কারণ গ্রীক সভ্যতায় সমাজের স্থান অত্যন্ত বড়ো এবং আরিস্টটলই সবপ্রথম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সুর তুললেও তখনও সমাজ-প্রাধান্য নষ্ট হয় নি; সে হিসেবে দণ্ডী হতে জগন্নাথ পর্যন্তই শুধু যে একটি সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির ইতিহাস পাওয়া যায় তাই নয়, তার আগের যুগে এমন একটি সর্বাঙ্গীণতার পরিচয় মেলে যা আদিম যুগের সূচক। কিন্তু গ্রীক কাব্যতত্ত্বের তুলনায় আমাদের ঐ আদিম যুগও স্তরবিভেদে অনেকটা অগ্রসর—এদেশের পরের যুগের তুলনায় না হলেও অন্যদেশের তুলনায় কাব্যশাস্ত্র তখন অপেক্ষাকৃত অসামাজিক। এই অসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে এসে জগন্নাথে এমন রূপ ধারণ করলো যেখানে পাঠকদের কোনও সমালোচনারই অধিকার প্রায় নেই, কারণ তাঁর মতে কাব্য হচ্ছে প্রতিভা-প্রসূত, আর কাব্য যিনি না বুঝবেন তিনিই অসহৃদয়! কবি যা লিখবেন পাঠকদের তাই গ্রহণ করতে হবে, দুয়ের সুস্থ যোগাযোগেই যে সার্থক কাব্যের উৎপত্তি সে কথা এ যুগে লুপ্তপ্রায়। Commodity-fetishism এর চূড়ান্ত উদাহরণ!

কিন্তু এরও পরের যুগে যে মতবাদ দেখা দিলো সামাজিক কারণে সেটি অপ্রত্যাশিত না হলেও তা এতই অসামাজিক হয়ে দাঁড়ালো যে সাধারণ পাঠকসমাজের স্থান সেখানে একেবারেই নেই। পূর্বে যে যে থিওরির কথা উল্লেখ করেছি তাতে রস অলৌকিক হলেও তার কারণটি লৌকিক। শেষের যুগের আলংকারিকরা অবশ্য এ মতকে এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে বিভাব প্রভৃতি যদি কারণ হয় আর রসই যদি কার্য হয় তা হলে রসের প্রতীতি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাব প্রভৃতি কারণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কেননা কার্যজ্ঞান ও কারণজ্ঞান একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।

সেইজন্য তাঁরা বলতে চেয়েছেন, বিভাব প্রভৃতি রসের কারণ নয়, বিভাবাদি সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয় মাত্র। কিন্তু এই নিছক রসবাদীদের কথা ছেড়ে দিলে মনে হয় যদি অলংকার, ধ্বনি, রীতি, রস প্রভৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়েই সার্থক কাব্যের উৎপত্তি তা হলে পাঠকদের কাছে যে রস প্রতিভাত' হয় তার উদ্রেকে বুদ্ধিরও কিছু আভাস আছে, বিশুদ্ধ ভাবালুতাই নেই। মনে হয় যেন মননবৃত্তিতে ভর করে রস চিত্তলোকে পোঁছল, তার পরিণতি মেঘলোকে লুপ্ত হলেও তার প্রভব মর্ত্যলোক হতে। কিন্তু বৈষ্ণব রসগ্রন্থে রসের যে আদর্শ বর্ণিত হল তার মধ্যে গোড়ার কথাটাই স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা রসের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও এ কথা স্বীকার করলেন না কোনও লালার রসবর্ণনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে। এ রস অপ্রাকৃত, অর্থাৎ সব বিষয়ে লৌকিকের মতো দেখতে হলেও লৌকিক নয়, গোড়া থেকেই অলৌকিক। সুতরাং এ রস সৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুভূতিরও বাইরে। কি কবি, কি পাঠক, কারুরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুভূতি হতে এ রস সৃষ্ট হয় না, সেইজন্যই এর গতি লৌকিক হতে অলৌকিকে নয়, মূল হতেই অলৌকিক। সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি শেষের যুগের আলংকারিকেরা বলতে আরম্ভ করেছিলেন লৌকিক কাব্য হতে দৈবী লীলার একটু বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সেই কথাটাই এখন চরমে উঠল। ফলে কাব্যের সঙ্গে সমাজের যোগ একেবারে তিরোহিত হলো, কেননা দৈনন্দিন জীবনকে অস্বীকার করেই এই তত্ত্ব আরম্ভ। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের বেদনাকে আনন্দে পরিণত করার কোনো চেষ্টাই নেই, বরং সে চেষ্টা পাপ, কারণ এ রসের মূল সমাজে নেই আছে অপ্রাকৃততত্ত্বে।

কাব্যতত্ত্বে এই যে বিভিন্ন সুরবদলের কথা উল্লেখ করলুম এ যে শুধু আকস্মিক নয়, এর পিছনে যে একটি সামাজিক হাওয়াবদল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সুরবদলের ধারাবাহিকতায়।

সামাজিক ইতিহাসের মূলতত্ত্ব অনুসারে যে কালক্রম আসা উচিত এবং ফলে কাব্যতত্ত্বের ক্রমে ক্রমে যে রূপ ধারণ করা উচিত এখানে তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু কাব্যতত্ত্বে এই সুরবদলের সঙ্গে সেকালের অন্যান্য শাস্ত্রেও যে অনুরূপ সুরবদল হয়েছিল, সে কথাটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ কাব্যশাস্ত্রে ধ্বনি এবং তারপর রসের প্রাধান্য এবং শেষের যুগে অলৌকিক রসের কথা—এর পিছনে সেকালের একটি মস্ত মানস ইতিহাস আছে যা উপেক্ষার নয়। সেকালের ন্যায়শাস্ত্রে কয়েকটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটি বড়ো প্রমাণ। এই প্রত্যক্ষের মধ্যে আবার একটি ভাগ অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ধ্বনি অলৌকিক প্রত্যক্ষ, না অনুমান দ্বারা গ্রাহ্য সে সম্বন্ধে যাই তর্ক হোক্ সে তবু প্রমাণগ্রাহ্য; সে সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক চলে। কিন্তু রস যদি একেবারেই ব্রহ্ম হয় তাহলে সে অদ্বৈততত্ত্ব অনুসারে প্রমাণের বাইরে, প্রমেয় নয়। সুতরাং কাব্যতত্ত্বকে যদি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিচার করা চলে তাহলে পণ্ডিতসমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও এই দর্শনগুলিরও এদিক দিয়ে একটা পুনর্বিচার সম্ভব কি?

৫

তত্ত্বের কথা ছেড়ে এবার তথ্যের কথায় আসা যাক্।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যতত্ত্বের আলোচনা হতে যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান পাওয়া যায়, সংস্কৃত কাব্যেও সেই পরিপ্রেক্ষিতের স্বাক্ষর আছে কি? যদি সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তাহলে তার প্রমাণ তো কাব্যশাস্ত্র হতে কাব্যেই বেশী পরিমাণে পাওয়া উচিত। সে প্রমাণ যে সংস্কৃত কাব্যে আছে শকুন্তলা এবং উত্তররামচরিত এই দুটি নাটকের আলোচনা করলেই তা বোঝা যায়।

শকুন্তলা আর উত্তররামচরিতের গল্পাংশের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই এমন নয়, বরং অনেক জায়গায় শকুন্তলার ছায়া উত্তররামে পড়েছে এমন কথাও বলা চলে। প্রথম পর্যায়ে বিচ্ছেদ, তারপর বিরহ। একটিতে নায়কের স্মৃতিলোপ, অন্যটিতে নায়িকার মনে সন্দেহ। দুটিতেই তিরস্করিণীর ফলে সংশয়চ্ছেদ। তারপরে তপোবনে নায়কনায়িকার পুনর্মিলন। এই পুনর্মিলনে একদিকে একজন ঋষি, অন্যদিকে সন্তানের যাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এরকম ঘটনাগত ও ভাবগত—এমন কি কোনও কোনও জায়গায় ভাষাগত —সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট অনুভব হয় দুটী নাটকের মানসিক আবহাওয়া এক নয়, ও দুটীর সামাজিক পারিপার্শ্বিকও এক নয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়লে কেমন একটা ধারণা জন্মায় এ যেন ইংরেজী সাহিত্যের রেনাঁশাঁস যুগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—দুয়ে তফাত অনেক, কিন্তু সৌসাদৃশ্যও আছে। এ ধারণার মূলে অন্য কোনও কারণ থাক্ বা নাই থাক্ একটি কারণ নিশ্চয়ই আছে। শেক্স্পীয়রের নাটকে ব্যক্তির জয়গান ধ্বনিত হয়ে উঠলেও মধ্যযুগীয় সমাজবোধ তখনও লুপ্ত হয় নি। বরং সামাজিক কারণে যে সময় সেই সমাজবোধে সংকট দেখা দিয়েছিল, সে সময়ই সাম্রাজ্যবিস্তার শুরু হবার ফলে সে সমাজবোধ ভেঙে পড়ে নি, সে সংকটের মধ্য দিয়ে বরং একটি নতুন বৃহত্তর পরিবারবোধ গড়ে উঠেছিল। তেমনই শকুন্তলায় দেখা যায় একটি বৃহত্তর সমাজবোধ আছে, সমাজ একটি বৃহৎ পরিবার এবং রাজা সেই পরিবারের কর্তা। তবুও ব্যক্তি ও সমাজে সংঘর্ষ বেধেছে, কিন্তু সে সংঘর্ষ প্রবল হয় নি। সমষ্টিতেই যে মানুষের স্থিতি ও ধৃতি এ বোধ তখনও স্পষ্ট। তাই শকুন্তলা ট্র্যাজেডি হতে হতেও ট্র্যাজেডি হলো না। কিন্তু এই বৃহত্তর সমাজবোধ নেই বলেই উত্তররামে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংঘর্ষ এতো প্রবল, কাব্যের নিয়মে সে মিলনান্তক নাটক হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা গভীরতম ট্র্যাজেডি ও চরমতম বিদ্রোহ।

এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার পরিচয় পদে পদে। নন্দিকেশ্বর, ভরত এবং অন্যান্য নাট্যাচার্যেরা বারবার বলেছেন নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত নির্যাস নয়, প্রয়োগেই তার সার্থকতা। অর্থাৎ নাটক প্রত্যক্ষতঃ সামাজিক, সেইজন্যে দর্শকসভানায়ক হবেন "প্রকৃতিহিতসদাচারশীলঃ" (নন্দিকেশ্বর, ১৭)। কালিদাস যখন তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে বলেন "অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্" এবং আরও বলেন "আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্" তখন স্পষ্টই বোঝা যায় কালিদাসের নাটক তাঁর দর্শকমণ্ডলীর জন্যে, সে নাটক দৃশ্য, পঠ্য নয়। কালিদাস পুরস্কার আশা করেন তাঁর দর্শকদের কাছ হতে, কিন্তু ভবভূতির সেখানে দারুণ বিরোধ। তিনি কাব্যরচনা করছেন এক দূরভবিষ্যৎ কালের জন্য, যে সময় পাঠকেরা তিনি যা লিখলেন তাই গ্রহণ করবে। আবার সেই commodity-fetishism-এর লক্ষণ! এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই কারণ শকুন্তলা যিনি রচনা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন কবি (বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ—মালবিকাগ্নিমিত্রম্) আর ভবভূতি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ (যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্ বশ্যেবানুবর্ততে)। কবিদলভুক্ত হলে তাঁর আভিজাত্যে ঘা লাগে। এই আভিজাত্যগর্ব, যা শ্রেণীবিভাগের ফল, তাঁকে সার্বজনীন কবিধর্ম হতে বিচ্যুত করেছে, ফলে তাঁকে পাঠক সন্ধান করতে হয়েছে সুদূর কালে—কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশপাতাল পার্থক্য হয়ে গেলো। কালিদাস তাঁর নাটক সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করতে দ্বিধা করেন নি বরং গৌরববোধ করেছেন, কিন্তু ভবভূতির পাঠকশ্রেণী এতই সংকীর্ণ যে সমসাময়িক কালে তা খুঁজেই পাওয়া গেলো না।

তার ফলে দুটি নাটকের মধ্যে বিভিন্ন সুর বেজেছে। প্রস্তাবনার পর কালিদাস তাঁর সূত্রধারের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন ঐ রাজা দুষ্যন্ত আসছেন। যেন তাৎকালিক ঘটনা। কিন্তু ভবভূতির পক্ষে তা

সম্ভব হলো না। সেইজন্যে তাঁর সূত্রধার তাঁর পিতৃপুরুষের পরিচয় দেবার পর হঠাৎ বলে উঠলো "এষোঽস্মি কার্যবশাদ্ আযোধ্যকস্তদানীন্তনশ্চ সংবৃত্তঃ", "এই আমি কার্যবশে সেকালের অযোধ্যার লোক হয়ে পড়লুম"। কিন্তু কি এই কার্য যার বশে অতীত কাল হতে নাটকের গল্পসংগ্রহ করতে হলো, নিজেদের অতীতে টেনে নিয়ে যেতে হলো বর্তমানের সমস্ত ছোঁওয়া ছাড়িয়ে, কালিদাসের ধরণে প্রাচীন কাহিনীকেও সমসাময়িক মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হলো না? এই পলায়নী মনোবৃত্তির মূল কবির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধে। ভবভূতি তাঁর সমসাময়িকদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে চান, তাঁর কাহিনী অতীতের, তাঁর পাঠকবর্গ ভবিষ্যতের। ঠিক এই কারণেই দুষ্মন্তের চরিত্র আর রামের চরিত্র অলংকারের কড়া নিয়ম সত্বেও সামাজিক দিক্ দিয়ে এক নয়। দুজনেই রাজা অর্থাৎ সমাজপ্রধান, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে একজনই সামাজিক, অপরজন সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে অবসন্ন। কালিদাসের চরিত্রচিত্রণে এই সামাজিকতার চমৎকার পরিচয় আছে। দুষ্মন্ত যখন প্রথম অঙ্কে তপোবনে প্রবেশ করছেন তখনও তিনি নানাভাবে শুনছেন সেখানেও তিনি সাধারণ মানুষ ন'ন, তাঁর একটি সামাজিক দায়িত্ব আছে। সেখানে তিনি অনুভব করছেন তাঁর মৌর্বীকিণাঙ্ক ভুজ কতদূর রক্ষা করছে, তপোধনদের ক্রিয়ার বিঘ্ন প্রতিহত করছে (রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য। জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি॥ ১।১২ *)। ঠিক এই কারণেই রাজার প্রেম উদ্দাম হয়ে

* এখানে ভুজ শব্দটি একবচন। একবচন কেন, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাঘবভট্ট বলেছেন "ভুজঃ কিয়দ্রক্ষতি ইতি অন্যসহায়ানপেক্ষত্বম্। একবচনেন তস্মিন্নপি পরানপেক্ষত্বং ধ্বনিতম্।" ভুজ রক্ষা করছে বলার অর্থ, অন্য সহায় দরকার করে না। আর একবচন বলার অর্থ হচ্ছে একটি ভুজই যথেষ্ট, সেখানেও অন্য কোন সহায়ের দরকার নেই। এ হচ্ছে সমাজবোধের অপর দিকটি, নায়ক বলশালী, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা

উঠতে পারছে না, প্রথম দর্শনেই তিনি ভবভূতির রামের মতো নায়িকার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারছেন না, তিনি ভাবছেন—অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ, আমার আর্য (আর্য কথাটির উপর জোর লক্ষ্য করার জিনিস) মন যখন এতে অভিলাষী তখন এ নিশ্চয়ই ক্ষত্রের বিবাহের উপযুক্ত। রাজা যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন তখনও তাঁর মন ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক ছেড়ে কল্পনার আকাশে নিরঙ্কুশ বিচরণ করতে পারছে না,—

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ১।২১

আবার লক্ষ্য করতে হয় পৌরব কথাটির ব্যবহার। তিনি পুরুর সন্তান। অর্থাৎ তাঁর রাজ্যশাসন এবং তপোধনদের ক্রিয়ারক্ষা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, এ তাঁর পিতৃপিতামহক্রমে কার্য, এ তাঁর বংশগত ঐতিহ্য। সমাজে তখনও বংশপরম্পরা সমাজপ্রাধান্যের যুগ অবসান হয় নি—সেকথা সমাজও স্বীকার করতো সমাজপ্রধানেরাও বিস্মৃত হতেন না। মধ্যযুগীয় সমাজবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনই রাজা যখন শকুন্তলাকে প্রেম নিবেদন করছেন, তাঁর সখীদের অভয় দিচ্ছেন, তখন তিনি বলছেন,—

পরিগ্রহবহুত্বেপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ৩।১৭

"আমার বহু বিবাহ হলেও আমার কুলের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দুটি ; সে হচ্ছে সমুদ্রবসনা পৃথিবী, আর তোমাদের এই সখী।" আমাদের যুগের আদর্শে এ প্রেমনিবেদন অদ্ভুত। আমরা আশা করি যে সময় প্রেমিক তার প্রেম জানায় তখন সে শুধু প্রেমিকই, সে রাজা কি ভিক্ষুক সে কথা অবান্তর। যেমন ভবভূতি বলেছেন প্রেম হচ্ছে এক অপূর্ব জিনিস,

আছে,—আর তা আছে বলেই তার সমাজনেতৃত্ব। পরের যুগে এই বজ্র সমাজের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, এ যুগে তা সমাজ ধারণে প্রযুক্ত।

সে অদ্বৈত, সে সুখদুঃখে সমান, সে এতই তীব্র যে সুখ না দুঃখ, বিষের জ্বালা না মোহ কিছুই বোঝা যায় না, সে সময় আত্মস্থ থাকাই কঠিন, নিজের সামাজিক সত্তা কে মনে রাখবে? কিন্তু শকুন্তলায় অন্য ব্যাপার। সেখানে কুলের প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রেমের অন্য কোনও সার্থকতা নেই, সমুদ্রবসনা পৃথ্বীর চেয়ে শকুন্তলার অধিকার একটুও বড়ো নয় (দুটি 'চ' শব্দ ব্যবহারে অধিকারসাম্য প্রতীত হচ্ছে)। আর পরিগ্রহবহুত্বের কথা স্বীকার করতেও রাজার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, কেননা সেই তো সে যুগের সমাজপ্রধানের লক্ষণ। তাই রাজা এ কথা বলা মাত্র অনসূয়া প্রিয়ম্বদা বলে উঠলেন "নিব্বুদ ম্হ", 'নিশ্চিন্ত হলাম'। পরে কণ্বও এই ধরনের কথা বলেছেন, বলেছেন যা হয়েছে ঠিক হয়েছে, তার পরের কথা আর বধূর বন্ধুরা বলতে পারে না, তা ভাগ্যায়ত্ত—
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ।

এই সমাজবোধ শুধু রাজার চরিত্রে নয়, ও নাটকের সব জায়গায়। রাজার যিনি সহধর্মিণী হবেন তিনি শুধু নায়িকা বা প্রিয়া ন'ন, তাঁরও সামাজিক দায়িত্ব আছে। সেইজন্যে মহর্ষি কণ্ব যখন তাঁকে পতিগৃহযাত্রার সময় আশীর্বাদ করছেন তখন তিনি অন্য কোনও কথা না বলে বলছেন তুমি পুরুর মতো, অর্থাৎ বংশোচিত, পুত্র লাভ করো।

> যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।
> সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥ ৪ । ৬

এই শ্লোকটির মধ্যে যে গভীর ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কণ্বের প্রথম আশীর্বাদ, শকুন্তলা শর্মিষ্ঠার মতো প্রিয় হয়ে উঠুন। এই শর্মিষ্ঠার নামোল্লেখেরও একটা অর্থ আছে। শর্মিষ্ঠা হচ্ছেন যযাতির স্বাধীন এবং সম্ভবতঃ নিয়মবহির্ভূত প্রেমের বিবাহ, শকুন্তলার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল। কণ্বের মনে ভয় ছিলো সমাজপ্রধান হিসেবে রাজা বলিষ্ঠ (এবং সে হিসেবে স্বেচ্ছাচারী) হলেও অসামাজিক হবার সাহস তাঁর থাকবে কি না। শর্মিষ্ঠার কাহিনীর ইঙ্গিতই হলো রাজা যেন তাঁর বলিষ্ঠ বিদ্রোহ হতে পশ্চাৎপদ না হন। কিন্তু সেইসঙ্গেই

কণ্ব বলছেন বংশের উপযুক্ত সন্তান লাভ করো—অর্থাৎ রাজাদের উপর সমাজের যে দাবী আছে সেই দাবী পালনে তুমি রাজাকে সহায়তা করো। এই ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরোধ—এইখানেই ট্রাজেডির মূল; আর এই দুয়ের সমন্বয়—সেখানেই নাটকের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন সেই কথাটিকেই একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, এই বন্ধন ও অবন্ধনেই শকুন্তলার সৌন্দর্য্য। বাস্তবিক, সে যুগে এই পুত্রলাভের আশীর্বাদের একটি সামাজিক অর্থ আছে, কারণ পুত্র একালের মতো ব্যক্তিক নিরঙ্কুশ প্রেমের বাধা নয়, সে সমাজরীতির ও ঐতিহ্যের বাহক। বিশেষতঃ যদি রাজপুত্র হয়। সেইজন্যই তপোবনে ঢুকে দুষ্যন্ত প্রথম যে আশীর্বাদ পেলেন সেও পুত্রলাভের আশীর্বাদ, "পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি"। কণ্ব বা গৌতমীর আশীর্বচন-গুলিতেও এরকম আভাস পদে পদে। শকুন্তলা বহুদিন চতুরন্তমহীসপত্নী হয়ে বাস করুন, এরকম সপত্নী হওয়ায় লজ্জা নেই বরং গৌরব, যে রাজা পত্নীপ্রেমে রাজধর্ম বিস্মৃত হন তাঁর সহধর্মিণী হওয়ায় কোনও সার্থকতাই নেই।

এই হলো শকুন্তলার এক দিক, কিন্তু একমাত্র দিক নয়। শুধু সমাজবোধই যদি এ নাটকের প্রতিপাদ্য হতো তা হলে এই-ই যথেষ্ট হতো। কিন্তু এরকম অসচেতন সমাজবোধ আদিমতার পরিচায়ক। আর সমাজের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যও সেই আদিমতারই সূচক। শকুন্তলার পরিবেশ এ আদিম কালে নয়, তখন জীবনে স্তরভেদ হয়েছে কিন্তু সে স্তরভেদ তখনও নাটকের দানা বাঁধার কাজে সহায়তাই করে, সংহতিধ্বংসে উন্মত্ত হয়ে ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি দিক আলোচনা না করলে কি অপূর্ব কৌশলে কালিদাস দুয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা বোঝা যায় না, কালিদাসের কবিকর্মের শ্রেষ্ঠত্বও অনুভব করা সম্ভব হয় না। শকুন্তলায়, সে কারণে, যেমন একটি সুস্থ অথচ সার্বভৌম সমাজবোধ আছে তেমনি তার চাপে ব্যষ্টিকে নিষ্পিষ্ট করা হয় নি, তার ব্যষ্টিসত্তা ও ব্যক্তিত্ব কোথাও খর্ব বা ব্যাহত নয়। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির

সম্বন্ধ তখনও অন্বয়মুখীন, বিরোধমূলক নয়—তাই সংহতির মধ্যেই ব্যষ্টির বিকাশ। যেখানে তার বিপরীত আচরণ সেইখানেই ট্রাজেডি।

শেক্‌স্‌পীরীয় ট্রাজেডির নায়কদের যে দুটি লক্ষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত সে হচ্ছে নায়কদের অসাধারণত্ব এবং তাদের অনুভূতির তীব্রতা। ব্র্যাডলির কথায় they are exceptional এবং desire, passion or will attains in them a terrible force. Othello, Lear, Macbeth, Coriolanus are built on the grand scale. কিন্তু এর ফলে ট্রাজেডি সহজতর, in the circumstances where we see the hero placed, his tragic trait, which is also his greatness, is fatal to him. শকুন্তলা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। রাজা দুষ্মন্তের এমন একটি মহনীয়তা ও তেজস্বিতার কথা ইঙ্গিত হয়েছে যে আমাদের সর্বদাই আশঙ্কা হয় বলিষ্ঠ অনাচার এর দ্বারা সম্ভব। রাজা যখন তপোবনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন তখন অনসূয়া প্রিয়ম্বদা স্তব্ধ হয়ে ভাবছেন কে এই মহাপুরুষ যাঁর "মহুর গম্ভীরাকিদী চউরং পিয়ং আলবন্তো পহাবন্দো বিঅ লক্‌খীয়দি"—যাঁর মধুর গম্ভীর আকৃতি আর চতুর প্রিয় আলাপ প্রভাববান্ বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে সেনাপতি রাজাকে দেখে ভাবছেন ইনি "গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি" গিরিচর হস্তীর মতো কেবল প্রাণসারটি ধারণ করছেন। ঋষিকুমারেরাও বলছেন ইনি যে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল পৃথিবীকে নগরপরিঘের মত সবল বাহু দ্বারা রক্ষা করবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, "নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্। একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি॥" কিন্তু এই মহাবল রাজার দুদিক দিয়ে দুর্বলতা আছে। প্রথমতঃ তাঁর উদ্দাম প্রবৃত্তি। সামাজিক বন্ধনে সে বাঁধা, না হলে সে উদ্দামতর হয়ে উঠত। কিন্তু সেই উদ্দামতাকে দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ করার পরে প্রকৃত মিলন ঘটলো, প্রথম অঙ্কের দুষ্মন্তের সঙ্গে সপ্তম অঙ্কের দুষ্মন্তের তফাত অনেক।

এই যে দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে প্রেমের পরিণতি এর মধ্যে একটি রহস্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হংসপদিকার গানের মধ্যে রাজার যে পাপের সন্ধান পাওয়া যায় তারই জন্যে এই দুঃখদহনের প্রয়োজন। কিন্তু এই "পাপ" শুধু রাজার স্বভাবের মধ্যে নয়, এ সে যুগের সমাজের মধ্যে। পরিগ্রহবহুত্ব এবং মধুকরবৃত্তি সেকালের ধর্ম। কিন্তু কবি তাতে সায় দিতে পারেন নি, সেকালের সামাজিক রীতির কাছে শকুন্তলার মতো একটি সুকুমার বালিকাকে বলি দিতে তাঁর মন ওঠে নি। সেইজন্য শকুন্তলার উপর একদিকে যেমন সামাজিক দাবী আছে তেমনি শকুন্তলা অন্যদিকে বড়ো কোমল, বড়ো মৃদু, বারে বারে কিশলয়, পুষ্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। সেইজন্য রাজার দুঃখ বিরহ শুধু যে রাজার স্বভাবেরই ফল তাই নয় তার মধ্যে সেকালের সামাজিক রীতিরও সমালোচনা আছে। একদিকে রাজা হচ্ছেন সমাজের প্রতিভূ, অন্যদিকে শকুন্তলা ব্যক্তিক প্রেমের নিদর্শন—এ দুয়ের সংঘাতই হলো শকুন্তলানাটকের মূল সংঘর্ষ। এই সংঘাতের চারপাশেই নাটক দানা বেঁধেছে। তাই প্রথম দিকে যেমন রাজার সামাজিক দিকটাই চোখে পড়ে, তাঁর বিদূষক, সেনাপতি, মৃগয়া শোভাযাত্রার মিছিলের এক অংশে তাঁর প্রেমের কাহিনী বলা হয়েছে তেমনই নাটকের ষষ্ঠ সপ্তম অঙ্কে আমরা দেখি রাজার মনের ভিতরের কথা। সেখানে তাঁর এই কঞ্চুকী, প্রতিহারী, সেনাপতির ভিড় নেই, সেখানে তাঁর হৃদয়কে খুলে দেখানো আছে। এই হলো শকুন্তলার মূল সমস্যা। কালিদাস এই সমস্যার সমাধান করেছেন দুই দিক দিয়ে। একদিকে যেমন রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো, অন্যদিকে তেমনি এই সমস্ত ব্যাপারটি দৈব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের কারণ সেইজন্য নিছক খেয়াল নয়, দুর্বাসার শাপেই দুষ্যন্তের স্মৃতিভ্রংশ। এই দৈবের আবরণে ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষ তীব্র হতে পারে নি ; ফলে শেষকালে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠেছে যেখানে দুষ্যন্ত আর শকুন্তলা দুজনেই দুঃখাগ্নিতে বিশুদ্ধকৃত এবং কারও মনে কোনও গ্লানি নেই কেননা সমস্ত

ব্যাপারটাই অলৌকিক। তাই যখন শেষকালে ভরতবাক্য উচ্চারিত হলো তার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমাজবোধের কথাই আছে, তার প্রথম কথাই হলো "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ", রাজা যেন এই অভিজ্ঞতার ফলে প্রজাহিতে পরাঙ্মুখ না হন, তিনি যেন অসামাজিক না হন। সেই সুষ্ঠু সমাজবোধ, যার মধ্যে ব্যষ্টি তার বিকাশ খুঁজে পায় অথচ উদ্দাম হয়ে ওঠে না, যার মধ্যে সমষ্টিবোধ থাকে কিন্তু শুধু সমষ্টিবোধই থাকে না, যে সময় ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ সুস্থ ও অন্বয়মুখীন—সেই সুস্থ সমাজবোধই শকুন্তলার শেষ কথা।

সাহিত্যের যে বিভিন্ন রূপায়ন আছে, পূর্বেই বলেছি তার মধ্যে এই সার্বকালিক ও সাময়িকের সম্বন্ধ এক নয়। সেইজন্য সাহিত্যের অন্যান্য রূপায়ন সবসময়েই সাময়িক ঘটনার চাপে নিয়ন্ত্রিত বা উদ্বুদ্ধ হলেও সেই সাময়িকতা কোথায়ও অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, কোথায়ও বা কিছু পরোক্ষ। কিন্তু নাটকে এর সুষ্ঠু সংমিশ্রণ না হলে সে নাটক সার্থক হয়ে ওঠে না। এখানেও, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বন্ধন ও অবন্ধন —এই দুয়ের সংগমস্থলেই নাটক সার্থক। কিন্তু এই সংমিশ্রণও সম্ভব নয় যদি না ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সমাজ মানসের একটি সুস্থ সম্বন্ধ বজায় থাকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এলিজাবেথীয় নাটকের সার্থকতার রহস্য নির্দেশ করতে গিয়ে কডওয়েল বলেছেন Elizabethan poetry tells a story. The story always deals with men's individualities as realised in economic functions—it sees them from the outside as "characters" or "types." But in the era of primitive accumulation, bourgeois economy has not differentiated to an extent where social "types" or "norms" have been stabilised. Bourgeois man believes himself to be establishing an economic role by simply realising his character. The

instinctive and the economic seem to him naturally one. সেকালের সামাজিক অবস্থা ঐতিহাসিক অর্থে বুর্জোয়া সমাজের অনুরূপ ছিল কিনা জানি না (যদিও থাকে, তা হলেও সে এযুগের বুর্জোয়াসমাজ নিশ্চয়ই নয়, একটা আপাতসাদৃশ্যই ছিল—যেরকম সাদৃশ্য ইতিহাসের কম্বুরেখায় বারবার দেখা যায়), সেইজন্য এ মন্তব্য শকুন্তলা সম্বন্ধে নিঃসংকোচে প্রয়োগ করা চলে না। তবে এ কথা ঠিক যে শকুন্তলার নাটক হিসেবে সার্থকতার মূল কারণ কবির নাটকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজবোধ।

উত্তররামে দেখি ঠিক বিপরীত ব্যাপার। প্রস্তাবনার পর যখন নাটক আরম্ভ হলো সে সময় রামচন্দ্রকে সামাজিক জীব বলে চিত্রিত করা হয় নি। তিনি দুষ্মন্তের মতো সমাজ-সচেতন ন'ন, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর অতীত তিক্ত। তাই নাটকের আরম্ভেই দেখি নতুন প্রেমের আনন্দ (উচ্ছ্বাস বলছি না) নেই, আছে সীতার মন খারাপ হওয়ার কথা। রাম রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে সীতার মন ভালো করবার চেষ্টায় নিযুক্ত, কিন্তু সেখানেও বনবাসের ও সীতাহারানোর স্মৃতি তাঁকে অসামাজিক করে তুলেছে। নাটকের প্রথমেই আমরা জনসাধারণ সম্বন্ধে একটি কটূক্তি পাই—তারা দুর্জন (যথা স্ত্রাণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। অতি দুর্জন এব বক্তব্যম্। ১।৮)। রামচন্দ্র বলছেন, "এতে হি হৃদয়মর্মচ্ছিদঃ সংসারভাবাঃ", সংসারের রীতিনীতি মর্ম ছেদন করে। রামচন্দ্রের প্রেমের মধ্যে সেকারণে সমাজসচেতনতার চিহ্ন মাত্র নেই, সে প্রেম কৈশোরক উদ্দামতায় উচ্ছ্বসিত। আপাতসাদৃশ্যের জোরে শকুন্তলাকে যদি ইংরেজী সাহিত্যের রেনাশাঁস যুগের সঙ্গে তুলনা করা যায় (এরকম তুলনা কখনই সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না) তা হলে উত্তররাম রোমান্টিক যুগের কাব্য। রামচন্দ্রের প্রেমে তীব্রতা আছে, আত্মবিস্মৃতি আছে, সমাজ তাঁর হৃদয়ে ব্রণের মতো কষ্টদায়ক। রামচন্দ্র বর্তমান ছেড়ে অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সমসাময়িক সমাজ তাঁর অপ্রিয়। প্রথম অঙ্কেই তাই অতীত স্মৃতির চর্বণ।

সময়ঃ স বর্ত্ত ইবৈষ যত্র মাং
সমনন্দয়ৎ সুমুখি গৌতমার্পিতঃ।
অয়মাগৃহীত-কমনীয়কঙ্কণ-
স্তব মূর্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ॥ ১।১৮

"এ যেন ঠিক সেই মুহূর্ত আবার ফিরে এলো যে মুহূর্তে মূর্তিমান উৎসবের মতো তোমার কাঁকনপরা হাতটি গৌতম আমার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।" সেদিন চলে গেছে, "তে হি নো দিবসা গতাঃ," অতীতের জন্য তাই আক্ষেপ। বাধা পেয়ে তাই প্রেম দুর্বার হয়ে ওঠে, বোঝা যায় না তা সুখ না দুঃখ, মনে হয় all ecstasy is death.

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতিবা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ॥ ১।৩৮

রামচন্দ্রের এই কৈশোরক প্রেম সম্ভবতঃ কৈশোরক বলেই ক্রম-পরিণতিহীন, প্রথম অঙ্কেও যেমন সপ্তম অঙ্কেও তেমন। তৃতীয় অঙ্কে রাম দণ্ডকারণ্যে পুনরাগমন করেছেন, সীতাও অদৃশ্য ভাবে এসেছেন। পুরোনো স্মৃতির পীড়নে রামের ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু, ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা। সীতাকে এই দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজন ছিলো, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া সীতার সংশয় ঘুচতো না। সেই দৃশ্য দেখার পর সীতা বলছেন "অহং এব্ব এদস্স হিঅঅং জানামি, মহ এসো", আমি এঁর হৃদয় জানি, ইনিও আমার হৃদয় জানেন। কিন্তু লোকারাধনার জন্য জানকীকেও ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নই, রামচন্দ্রের এরকম মৌখিক ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও রাম বা সীতা কেউ-ই এই নির্বাসন ব্যাপারটিকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারছেন না, এমন কি সে যদি সামাজিক প্রয়োজনে হয় তা হলেও নয়। উত্তররামের শেষের দিকে লব কুশের সঙ্গে চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের কাহিনী আছে। লবকুশ রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে রাজী নয়, ব্যক্তিবিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ব্যাপারটা চূড়ান্ত নাটকীয়। চন্দ্রকেতু লক্ষণের পুত্র, রাজবংশের একমাত্র বংশধর। প্রচলিত ঐতিহ্য রক্ষার ভার তার উপর। লবকুশ হচ্ছে নির্বাসিতা সীতার সন্তান, ব্যক্তিবিদ্রোহের প্রতীক, সমাজকে অস্বীকার করাতেই তাদের উৎসাহ। তারা রাজার সন্তান, কিন্তু তারা ছদ্মবেশী—অন্যপক্ষে যোগ দিয়েছে। প্রত্যেক বিপ্লবের আগেই দেখতে পাওয়া যায় প্রচলিত রীতিতে যাঁরা সমাজপ্রধান তাঁদেরই এক অংশ স্বশ্রেণী ত্যাগ করে অন্য শ্রেণীতে যোগ দেয়, ফলে বিপ্লব জোর হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অবসানকালে নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের অন্ততঃ কয়েকটি সভ্যও সামন্ততন্ত্র থেকে খসে আসে, শ্রমিকবিপ্লবের গোড়ায় নেতৃত্ব সম্ভবতঃ স্থূল মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুল-খোয়ানো সভ্যদের হাতে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভবভূতির টেকনিকও স্বতন্ত্র। শকুন্তলা আর উত্তররাম একসঙ্গে পড়লে যে তফাতটা সবচেয়ে চোখে পড়ে সে হচ্ছে উত্তররামে পরিহাস ও চটুলতার অভাব। পরিহাস তখনই সম্ভব যে সময় কবির বীণায় সপ্তস্বর বাজে—এই সপ্তস্বরের কোনটা বা মূল স্বর, কোনোটা বা চিকারী। কিন্তু যখন একটিই সুর বাজে এবং সে সুর অত্যন্তই চড়া তখন আর চিকারী লাগে না, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম। ভবভূতি (এবং রোমান্টিক কবিরা প্রায় অধিকাংশই) তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে এতো বেশী সীরিয়াস যে পরিহাস সেখানে অসম্ভব। সেইজন্যে উত্তর-রামের ভাষা গম্ভীর, কঠিন, সমাসবহুল। শব্দযোজনার বেলাও একই ব্যাপার। যে যুগে সুস্থ সমাজবোধ বজায় থাকে সে যুগে সাধারণতঃ সজীব vital শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক পড়ে, কেননা তাতেই সেকালের ভাবের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু বর্তমান যখন কবির পক্ষে অপ্রীতিকর তখন vital শব্দের পরিবর্তে ঝোঁক পড়ে abstraction-এর দিকে, শব্দগুলিকে তার পারিপার্শ্বিকের ছোঁওয়া হতে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা। শব্দ জিনিসটা সামাজিক; কিন্তু কাব্য যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত নির্যাস তখন শব্দকেও অসামাজিক করার চেষ্টা

দেখা দেয়। তাই প্রত্যেক শব্দের তাৎকালিক আবরণের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম সার্বকালিক অবস্থা আছে তারই উপর জোর পড়ে। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে যখন বিচ্ছেদের পর প্রথম শকুন্তলা রাজার সামনে আসছেন, তখন এই শ্লোকটি আছে—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥ ৭।২১

"তিনি পরিধূসর বসন পরে আছেন, নিয়মপালনের ফলে তাঁর মুখ শুকনো। মাথায় একটি বেণী। আমি অত্যন্ত নির্দয়, কিন্তু তিনি শুদ্ধশীলা, আমার দীর্ঘ বিরহকে ব্রতের মতো ধারণ করেছেন।"

অনুরূপ অবস্থায় উত্তররামে একটি শ্লোক আছে—

পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং দধতি বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরিব বা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥ ৩।৪ *

"জানকী বনে আসছেন, ঠিক যেন করুণের মূর্তি, বা শরীরিণী বিরহব্যথা। তাঁর মুখ বিলোলকবরী; পাণ্ডু ও দুর্বল কপোলটিতে তাঁর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।" দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির ছায়া সুস্পষ্ট, কিন্তু তফাতও সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে 'শুদ্ধশীলা' শব্দটিতে এমন একটি ইঙ্গিত আছে যাতে মনে হয় শকুন্তলার মনে বিরহ ততো গভীর ক্ষত জন্মায়নি, অন্ততঃ সীতার যেমন, শকুন্তলার অভিযোগ ততো গভীর নয়, কারণ নির্বাসন ব্যাপারটায় রাজার খেয়ালই একমাত্র দায়ী নয়—যেন শীলশুদ্ধির প্রকাশই হচ্ছে বিরহব্রত ধারণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এরকম কোনো ইঙ্গিতই দ্বিতীয় শ্লোকটিতে নেই, উপরন্তু আছে 'করুণ' শব্দটিকে এমন abstract ভাবে ব্যবহার যা প্রথম শ্লোকটির কোথায়-ও খুঁজে

* "বিলোলকবরীকমাননম্" এতে যে দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে তাতেও স্খলিত কল্পনার পরিচয় মেলে। সীতা এগিয়ে আসছেন, এ অবস্থায় আনন চোখে পড়লে পিছনের বিলোল কবরী স্বতঃই চোখে পড়ে না। সেকারণে 'আননের' বিশেষণ হিসেবে 'বিলোল-কবরী' কথাটী কল্পনাকে ব্যাহতই করে। কালিদাস এরকম ভুল করেন নি।

পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের কথা, যেখানেই ভবভূতির কোনো রসের দৃশ্য বর্ণনা করবার দরকার হয়েছে তিনি স্পষ্টতঃ সেই রসের নাম উল্লেখ না করে পারেন নি। আকারে ইঙ্গিতে রস গড়ে তুলে তিনি তৃপ্ত ন'ন, স্পষ্ট abstract রসটির নাম না করলে তাঁর তৃপ্তি হয় না—

১। অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ ৩।১

২। বীরাণাং সময়ো হি দারুণরসঃ স্নেহক্রমং বাধতে॥ ৫।১৯

৩। কথং বাভ্যনুজ্ঞানাতু সাহসৈকরসাং ক্রিয়াম্॥ ৫।২১

৪। বীরো রসঃ কিময়মেত্যুত দর্প এব॥ ৬।১৯

বলা বাহুল্য এরকম অকাব্য শকুন্তলার ত্রিসীমানায় নেই। দুয়ে তফাত অনেক। এ তফাত শুধু প্রতিভার তফাত নয়, দৃষ্টিভঙ্গীরও তফাত। কাব্যের সুরবদলের সঙ্গে সামাজিক হাওয়াবদলেরও লক্ষণ মেলে। কালিদাস শুধু যে বড়ো কবি তাই নন, তাঁর উপযুক্ত পাঠকসমাজও ছিল। তবু শ্রেণীবিভাগ হয়েছিলো এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধের একটু একটু সূচনা দেখা যাচ্ছিলো তার প্রমাণ শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ব্যাপারটিতে কবিকে লৌকিক সমাজ ছেড়ে দৈবে আশ্রয় নিতে হলো। অবশ্য সেখানেও বিচার্য, শেক্স্পীয়রের অলৌকিক যেমন সত্যিই অলৌকিক কিনা, তেমনি সেকালের সামাজিক পরিবেশে ও সেকালের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের পটভূমিকায় ঐ দৈব নিছক দৈব, না সামাজিক আশা আকাঙ্খা বা বিরোধ প্রকাশ করবার একটা সহজ কৌশল মাত্র। কিন্তু সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও কালিদাসের মহিমা কমে না। ভবভূতির মধ্যে এর কোনো চিহ্নই নেই, সে সময় ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন অত্যন্ত পরিস্ফুট, পাঠকের সঙ্গে কবির কোনও সুস্থ সম্বন্ধ, এমন কি কোন সম্বন্ধই, প্রায় নেই, যদি বা কিছু থাকে তাও প্রচণ্ড সংঘর্ষমূলক। দুই কবির সমাজ এক নয়।

আরও পরের যুগের কাব্যগুলির এই পদ্ধতিতে আলোচনা করলে এই ক্ষয়িষ্ণুতার ক্রমশঃ বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবভূতির মধ্যে

ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন থাকলেও যে অসাধারণ তীব্রতা ও আস্ফালন আছে তা হতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় তাঁর অন্ততঃ কিছু বলবার ছিল যদিও সে কথাটা তাঁকে বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়েছে। সেহিসেবে তাঁর কবিধর্ম অন্ততঃ খানিকটা ছিল, তার স্বরূপ যাই হোক্ তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারবি হতে মাঘ, মাঘ হতে নৈষধে এবং অন্যান্য কাব্যে যে স্রোতটি প্রবাহিত হলো সেটি ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে—অনেকক্ষেত্রে তাতে শুধুই কারুকাজের অক্ষম চেষ্টা আছে কিন্তু বলবার কথা কিছুই নেই। সে বিস্তৃত আলোচনা করার অবসর এখানে নেই, কিন্তু সেকালের সমাজবিবর্তনও যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে হয়েছিল সে কথা কাব্যের প্রমাণ হতেও স্বীকার করতে হবে।

৬

আবার আমাদের গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক্। আমাদের বিচার্য বিষয় ছিলো সংস্কৃত সাহিত্য শুধুই কি একটি বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকশিত, না তারও একটা মূল আছে এবং সে মূল সে যুগের মাটিতে প্রবিষ্ট। এই প্রশ্নের বিচার করতে হলে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন উঠে পড়ে, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি। এর বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করেছি। এখনও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠলেই একটা উদাস হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির অলস রোমন্থন ছাড়া আর অন্য কোনও সার্থকতা আছে বলে আমরা প্রায় মনে করি না। এতে সংস্কৃত সাহিত্যের মহৎ অপমান। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে সাহিত্যে কি কি হাওয়াবদল হলো এটি ভালো ভাবে না বুঝলে তার প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যের এ আলোচনায় এইটুকুই বলবার চেষ্টা করেছি বর্তমানে আমরা যে সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাস করি সংস্কৃত সাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়-ই, বরং

চমৎকার উদাহরণ। জগতের নানা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে এতো দীর্ঘ জীবন এবং এতো সুরবদল আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ, অর্থাৎ একটা সাহিত্য এতোকাল সার্থক ছিল কিনা সন্দেহ। শুধু যে কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব হতেই এই কথা প্রমাণিত হয় তাই নয়, আমার বিশ্বাস সেকালের মানুষের অন্যান্য ভাবব্যঞ্জনা ও মানস রূপায়নের ক্ষেত্র-গুলিতেও এইরকম সুরবদল ও হাওয়াবদলের পরিচয় আছে। অন্ততঃ ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, অদ্বৈতবাদ এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মধ্যে প্রমাণ সম্বন্ধে যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়েছে তার মধ্যে একটা সামাজিক হাওয়াবদলের আভাস মেলে বলে মনে হয়। সে কথা পণ্ডিতদের বিচার্য।

কিন্তু এ যুগের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার যে সুবিধে আছে প্রাচীন সাহিত্যের তা নেই। সেখানে সামাজিক ইতিহাস কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব হতে অনুমিত, তার স্বকীয় বিবরণ জানা নেই। সেইজন্য ঐতিহাসিক দিক্ দিয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে, ব্যক্তিগত মতের চাপে সাহিত্যের খেয়ালমাফিক ব্যাখ্যা করে মনগড়া ইতিহাস রচনাও চলে। এ বিষয়ে সকল সত্যসন্ধ সমালোচকের সাবধান হওয়া দরকার। তবে আমার কৈফিয়ত এই যে, সংস্কৃত সাহিত্যে যে রীতিতে বিবর্তন হয়েছে বলে আমার ধারণা তা অন্যজায়গাতেও হয়েছে, বরং সেইটেই সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক ভঙ্গী। দ্বিতীয়তঃ কাব্যের প্রমাণ যে ইতিহাসেও গ্রাহ্য, এমন কি যখন অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না সে সময়ও গ্রাহ্য, এ কথা বড়ো বড়ো ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। There is nothing new or startling in the proposition that every civilization creates an individual artistic style of its own; and, if we are attempting to ascertain the limits of any given civilization in any dimension, either spatial or temporal, we find, as a matter of fact,

that the aesthetic test is the surest as well the subtlest···Art [in some cases] speaks in clea accents then either Politics or Economics.—এ টয়েনবীর মত। (Toynbee : *Study of History*, Vol. . p. 378)